প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
আবুল বারক আলভী
ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

ভূমিকা

"মনীষা-মঞ্জুষা" নূতন পুস্তক নহে। ইহা আমার কতিপয় মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রবন্ধের সমাহার। যে-কয়েকটি অমুদ্রিত প্রবন্ধ ইহাতে সঙ্কলিত হইল, তাহার কোন বিশেষ মূল্য থাকুক বা না থাকুক, তৎপ্রতি নূতনত্বের একটা আকর্ষণ থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আর, যে-সমস্ত মুদ্রিত প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়া এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইল, সেইগুলিও যে সম্পূর্ণ অসংস্কৃত আকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, এমন নহে। বিষয়বস্তু ও ভাষা,—উভয়ই স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ পরিমার্জিত ও সংশোধিত হইয়াছে। ইহাতে প্রবন্ধগুলির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, না হ্রাস হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। আমার অবলুপ্তপ্রায় অনিশ্চিত সংখ্যক প্রবন্ধের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ সমাহৃত হইয়া এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে পুনঃপ্রকাশিত হইল,—ইহাই আমার একমাত্র সন্তুষ্টি। ইহাতে যদি কাহারও কোন উপকার হয়, তাহা হইবে আমার উপরি-পাওনা। অতঃপর, এই সঙ্কলনের অন্যান্য খণ্ড প্রকাশের বাসনা রহিল।

মুদ্রিত প্রবন্ধ-সংগ্রহের ব্যাপারে আমার প্রধান সহায়ক ছিল, আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক আবদুল গফুর, এম. এ.। তাহার নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সে আমাকে নানা পত্র-পত্রিকা হইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রবন্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। তাহার এই শ্রদ্ধার দান আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়া লইয়া আশীর্বাদ করিতেছি, আজীবন জ্ঞান-চর্চায় তাহার আগ্রহ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই পুস্তক প্রকাশে দেখাশুনা করার ভার ন্যস্ত ছিল, আমার তৃতীয়া কন্যা মুসাম্মাৎ উম্মু মুসলিমা, এম. এ., বি. এড্-এর হাতে। প্রবন্ধগুলির সঙ্কলনের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রুফ দেখার কাজ পর্যন্ত নানা বিষয়ে সে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। খোদা তাহার মঙ্গল বিধান করুন।

ঢাকার "মুক্তধারা"—প্রকাশনী স্বেচ্ছায় ও স্বব্যয়ে মুদ্রাযন্ত্রের কুক্ষি হইতে যথাশীঘ্র সম্ভব পুস্তকটির এই খণ্ডকে মুক্তি দিয়াছে। তজ্জন্য "মুক্তধারা"-র কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

নিবেদক,
মুহম্মদ এনামুল হক

ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা,
সড়ক সংখ্যা—২
গৃহ সংখ্যা—১১৯-বি
ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য ১
প্রাচীন ও মধ্যযুগের দিগ্‌দর্শন ১৭
আধুনিক যুগের দিগ্‌দর্শন ২৩
রাবীন্দ্রিক যুগের দিগ্‌দর্শন ৩০
যুদ্ধোত্তর যুগের দিগ্‌দর্শন ৩৭
বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব ৪৩
লোক-সাহিত্য ৫৬
সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী-সংস্কৃতির উৎস নিরূপণ ৮৪
শাহ্ মুহম্মদ সগীর ১০৯
নবাবী আমলের জনৈক মুসলমান কবি ১৩০
মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের মুসলিম মহিলা-কবি ১৩৯
  পরিশিষ্ট ১৫৭
  দোরদানা-বিলাপ ১৬২
  টীকা-টিপ্পনী ১৬৬
ফজলল হক সেলবর্সী ১৭৪
নজরুলের কাব্যে তারুণ্য ১৮১
নজরুলের কবি-প্রতিভা ১৯৭
বাউল-গান পরিচিতির মূলসূত্র ২০৬
নবনূর ২১৬
নবীন প্রতিভার রূপ ২২৩
সামাজিক পটভূমিকায় প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা-সাহিত্য ২৩২
নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা ২৪২

মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভাল,---আমাদের বর্তমান আলোচনায় নতুন ক'রে মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়; তার কোন বিশেষ আবশ্যকতাও আছে বলে মনে করি না। কারণ, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য বল্‌তে আমরা মোটামুটি যে-সাহিত্য বুঝি, এখানকার সমস্ত পাঠক তার সাথে অল্প-বিস্তর পরিচিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাই এ-যুগের সাহিত্যের প্রধান পাঠক-পাঠিকা ব'লে এ-সাহিত্যের পঠন ও পাঠন ব্যাপারকে অবলম্বন ক'রে যে-সমস্ত সমস্যা প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে, তার দু' একটি সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

এ-সাহিত্যের যুগ-নির্ণয় সমস্যাটাই এর পঠন ও পাঠন ব্যাপারে একটা জটিল সমস্যা। খ্রীষ্টীয় ১২০০ থেকে ১৮০০ অব্দের মধ্যে বাংলা-ভাষায় যে-সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার ভিতর থেকে কালের করাল গ্রাসের হাত পেরিয়ে যে-অংশটুকু আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আজ আমরা তাকেই নামাঙ্কিত করেছি 'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য'। এদিক থেকে আমাদের সাহিত্যের কালগত ধারণা সুদৃঢ় না হ'লেও, খুব অস্পষ্ট নয়। এই সুদীর্ঘ ৬০০ বছরের মধ্যে বাংলা-ভাষা তার স্বাভাবিক বিবর্তন-ধারার অনুসরণে বিকশিত হয়েছে বিস্তর,---সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও মোড় ফিরেছে কয়েকবার। এই বাস্তব সত্যটুকু স্বীকার না ক'রে ৬০০ বছরের সবটুকুকে পাইকারীভাবে একটা যুগ ব'লে ধ'রে নিলে এ-সময়কার বাংলা-সাহিত্যের সত্যিকার পরিচয় কঠিন হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, তার জন্যে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা এ-যুগ-বিভাগ ঠিক মতো মেনে নিতে পারেন নি। বাধ্য হ'য়ে কোন-কোন ব্যাপারে তাঁদেরকে গোঁজামিল দিতে হয়েছে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে।

এ-সময়কার বাংলা সাহিত্যকে গোড়ায় যাঁরা মধ্যযুগের সাহিত্য ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন, ইউরোপীয় ইতিহাসের Middle Ages -এর কালগত ধারণা ছিল তাঁদের মাথায়। এর স্থিতিকাল হ'ল ১০০০ হাজার থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। এর পরে ইউরোপের 'চিৎপ্রকর্ষের যুগ', যাকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা 'রেনেসাঁ' নামে অভিহিত করেছেন। মুসলিম তুর্কীজাতি কর্তৃক কন্‌স্টাণ্টিনোপল-বিজয়ের পরেই ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটে ও 'চিৎপ্রকর্ষ' শুরু হয়। আর আমাদের দেশে তুর্কী-বিজয়ের পর থেকে মধ্যযুগের আরম্ভ ও ইংরেজ আমলে এসে 'চিৎপ্রকর্ষ-যুগের' সূচনা। ব্যাপারটা কি অদ্ভুত নয়? এটা আরও অদ্ভুত ঠেকে, যখন ভাবি,---মধ্যযুগ হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ, বর্বরতার যুগ ও কুসংস্কারের যুগ, আর 'চিৎপ্রকর্ষের যুগ' হচ্ছে আলোর যুগ, জ্ঞানের যুগ, জাগৃতির যুগ। তবে, আমরা কি আমাদের সাহিত্যের মধ্যযুগে বর্বরতার যুগেই বাস করছিলাম?

এ-প্রশ্নের সাথে সাহিত্যের যুগ-বিভাগের মৌলিক ধারণার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আমাদের ভেবে দেখতে হয়,---কাল 'চিৎপ্রকর্ষ'কে চিহ্নিত করে, না 'চিৎপ্রকর্ষ' কালকে চিহ্নিত করে? সাহিত্যের ইতিহাস চিৎপ্রকর্ষের ইতিহাস,---এই ইতিহাসে চিৎপ্রকর্ষ দিয়েই কালকে চিহ্নিত করতে হবে। চিৎপ্রকর্ষ কালের মুখাপেক্ষী নয়, বরং কাল চিৎপ্রকর্ষের মুখাপেক্ষী। তাই, সব দেশের চিৎপ্রকর্ষ এক সময়ে আসেনি,---আসেও না। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সময়টুকুকে মধ্যযুগ বলা হচ্ছে, তা চিৎপ্রকর্ষ-ভিত্তিক নয়,---বরং কালভিত্তিক। এটাই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য। ফলে, আমাদের কালনির্ণয়ের গুঁতোগুঁতিতে কালও যেমন তলিয়ে গেছে, সাহিত্যও তেমন খেই হারিয়েছে। আমরা কালনির্ণয়ে যত শক্তি ক্ষয় করেছি, যত পাণ্ডিত্য দেখিয়েছি, কাব্যপাঠে তত মনীষা দেখাতে পারিনি। আমাদের তথাকথিত মধ্যযুগের পঠন-পাঠনে এটিও খুব ছোট কথা নয়।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' ব'লে কোন যুগ আমি স্বীকার করি না। আমার বিবেচনায়, ইউরোপীয় ইতিহাসের কালভিত্তিক-ধারণা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযোজ্য নয়। আমাদের এই যুগের সাহিত্য

আছে, তার তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ ক্যাটালগ বা ফিরিস্তিও আছে, তবে চিৎপ্রকর্ষ-সূচক যুগ-চিহ্নিত কোন সাহিত্যের ইতিহাস নেই। একমাত্র দীনেশ বাবুর "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য"ই তার প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা। এখনকার ইতিহাসগুলো যতই সমালোচনামূলক হোক না কেন, এগুলো একদিকে যেমন অতীতের প্রতি আধুনিক মনের প্রক্ষেপ, অন্যদিকে তেমন মুস্‌লিম বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা-বর্জিত একতরফা রচনা। এ-ইতিহাসের পূর্ণ সার্থকতা নেই। তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য শুধু হিন্দুর সাহিত্য নয়, এমন কি শুধু মুসলমানদের সাহিত্যও নয়; এ-সাহিত্য হিন্দু-মুস্‌লিম-নির্বিশেষে সম্মিলিত বাঙালীর সাহিত্য। প্রচলিত বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠে এ-ধারণা পোষণ করার কোন উপায় নেই। এ-অবস্থায়, নতুন করে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার প্রয়োজন তীব্র-ভাবে অনুভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রয়োজন আমরা বহুদিন থেকে তীব্রভাবে অনুভব করছি।

একটু আগেই বলেছি, সাহিত্যের ইতিহাস 'চিৎপ্রকর্ষের' বিচিত্র-কাহিনী। সে-কারণেই এর যুগ-বিভাগও চিৎপ্রকর্ষের বিবেচনায় বর্ণিত হওয়া জরুরী। জানি, মানুষের চিৎপ্রকর্ষের অভিব্যক্তি এক নয়,---বহু। তবে, দেশলাইয়ের একটি কাঠি-সংযোগে বিরাট বারুদ-স্তূপের বিস্ফোরণের মতো সামান্য একটি ঘটনার সংঘাতেই জাতীয় চিৎপ্রকর্ষ বিস্ফুরিত হ'তে দেখা যায়। আমাদের দেশেও তাই হয়েছে: শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি,---সব ক্ষেত্রেই তার ভূরিভূরি নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু দেখ্‌বার চোখ নেই। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির দেবভাষায় বর্ণিত কথা ও কাহিনী বাংলা-ভাষায় শুনলেই কথক, শ্রোতা ও বক্তা সকলের জন্যই যাঁরা 'রৌরব'-নরকের ব্যবস্থা করেছিলেন, মুসলিম তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের কিছুকাল পরেই তাঁদের বংশধরেরা যখন সব কিছু নতুন ক'রে বাংলা-ভাষায় লিখতে শুরু করলেন, তখন বুঝতে হয়, তাঁদের মনে চিন্তার বিপ্লব ঘটেছে, অর্থাৎ তাঁদের মনে 'রেনেসাঁ' এসেছে—'চিৎপ্রকর্ষ' সাধিত হয়েছে। ইউরোপে তুর্কী-বিজয় ও বাংলায় তুর্কী-বিজয় এক সময়ে ঘটে নি। এতৎসত্ত্বেও, দুই যাত্রায় দুই দেশে একই ফল ফলেছে। ব্যাপারটা কি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়? অথচ, সমগ্র মুসলিম শাসনকালটাই

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' নামে চিহ্নিত হ'য়ে সে-সময়কার বর্বরতা ও কুসংস্কারের কাফনে ঢেকে আছে; আর আমরা তাকে নিয়ে খুশিতে মাতামাতি করছি।

এখন প্রশ্ন হ'ল, জাতির চিৎপ্রকর্ষের অভিব্যক্তি যখন বহু, তখন চিৎপ্রকর্ষের বিবেচনায় সাহিত্যের যুগ-বিভাগকে কি ক'রে চিহ্নিত করা যেতে পারে? আমরা বলেছি, কোন বিশেষ ঘটনার সংঘাতেই 'চিৎপ্রকর্ষের' বিস্ফোরণ ঘটে। মূল ব্যাপারটি যখন এরূপ, তখন যুগ-বিভাগ ও তার নামকরণে বিশেষ বেগ পাবার কোন সংগত কারণ নেই। যে-ঘটনার সংঘাতে একবার চিৎপ্রকর্ষের বিস্ফোরণ হ'ল, তার সময় থেকে পরবর্তী ঘটনার সংঘাতে চিৎপ্রকর্ষের পুনর্বিস্ফোরণ-কাল পর্যন্ত সময়টুকুকে একটা যুগ সহজেই বলা যায়। এই যুগের সাহিত্যে এই সময়কার যাবতীয় চিৎ-প্রাকর্ষিক অভিব্যক্তির সন্ধান করতে হ'বে। নইলে সে-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনের কোন বিশেষ সার্থকতা নেই। এ ক'টা কথা মনে রেখে বাংলা-সাহিত্যের তথাকথিত 'মধ্যযুগকে' আমরা সুস্পষ্টভাবে তিনটি বিশেষ যুগে ভাগ করতে পারি।

(ক) তুর্কী-যুগ (১২০০—১৩৫০)

তার প্রথমটি হ'ল তুর্কী-যুগ। এর স্থিতিকাল ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাক্-তুর্কী-যুগে বাঙালীর চিৎপ্রকর্ষ স্তিমিত ও মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন রাজারা 'তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল' নিয়ে যে শুধু মেতে রইলেন, কিংবা দেশে অবারিত স্রোতে সংস্কৃত চালিয়ে যে ক্ষান্ত হলেন, এমন নয়। তদুপরি, তাঁরা অবহট্ট বা অপভ্রংশের খোলস থেকে মুক্তি-সচেষ্ট বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের আদ্য-শ্রাদ্ধ শুরু করলেন এর নিজের দেশেই, এবং যাঁরা এই ভাষা সাহিত্যের চর্চা করতেন, তাঁদেরকে নেপালের পর্বত-কন্দরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। তাই, প্রাচীনতম বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মিলল নেপালে,—বাংলাদেশে নয়।

সেনদের কাছ থেকে মুসিলিম তুর্কীরা বাংলা-দেশ দখল করলেন, কূটনীতি, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-গরিমার শ্রেষ্ঠত্বে। তখনকার দিনের নৈতিক

ও রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে তাঁরা কোন অপরাধ করেন নি। ফলে, নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ মানুষের প্রাপ্য ইসলামী-মর্যাদা পেল; সংস্কৃতের দৈব-আসন টলে গেল; ফারসী এসে তার স্থান দখল করল; আর বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য তার আপন ভূমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রায় আট'শ বছর পরে এসে এখনকার জাতীয়তাবাদীর চোখে তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় এক মহা-অপরাধ ব'লে গণ্য হয় হোক; তাতে কিছু আসত-যেত না। তাঁরা যখন এ-বিজয়কে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা ব'লে চিহ্নিত করেন তখন, আর চুপ ক'বে থাকা যায় না। এর ফলে, আজ বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ অবধি বিস্তৃত তুর্কী-যুগকে 'অন্ধকার-যুগ' ব'লে অভিহিত করা হচ্ছে; আব বলা হচ্ছে, এই বাংলা-সাহিত্য-বর্জিত যুগের জন্য তুর্কী-বিজয় ও তার ধ্বংস-লীলাই দায়ী। যুক্তিটা মন্দ নয়; কেননা এব ভিতর একটা বিশ্বাসযোগ্য তার আপাত-ভাব রয়েছে ব'লে চট্ ক'রে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখার অবকাশ কম।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়,---এই সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত বই লেখা হয়েছে, তার পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' মতো প্রাকৃত বই সংকলিত হয়েছে; তার একাধিক পাণ্ডুলিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে; এই সেদিন রাহুল সাংকৃত্যায়নও এ-সময়কার কতকগুলি 'চর্যাপদ' সংগ্রহ ও প্রকাশ করলেন।—'শূন্যপুরাণ' ও তার 'কলিমা-জলাল' বা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'র কথা নাই বা বল্লাম; ডাক বা খনার বচনের কথা নাই বা ভাবলাম; এমন কি 'শেক-শুভোদয়ায়, বিধৃত পীব-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা 'আর্যা'র অথবা 'ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে' নির্দেশক বাংলা গানের বা মন্ত্রের কথা নাইবা তুল্লাম। তুর্কী বিজয়ের ধ্বংস-লীলা বেছে বেছে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শনগুলোই বিনষ্ট ক'রে দিল,--এ কেমনতরো কথা? তাই বা যদি হয়, তবে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' নামক রাধাকৃষ্ণের নাটগীতিই বা পাওয়া যায় কি ক'রে? এ-সময় বাংলার মানুষ নিজের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিজের ভাষায় লেখেনি, কিংবা নিজের বিরহ-মিলনের গান নিজের কথায় রচনা করেনি,-- এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা ভাব্তেও পারা যায় না। তবে, তা যে প্রচুর পরিমাণে আমাদের হাতে আসেনি, অথবা

আসছে না,---এও তো একটা প্রত্যক্ষ সত্য। তা হ'লে সেগুলো গেল কোথায়? এর দুষ্প্রাপ্যতা, বা স্বল্পপ্রাপ্যতার জন্য বাংলার তুর্কী বিজয়কে যখন আমরা দায়ী করি, তখন আমরা স্রেফ ভুলে যাই, এদেশের লোকের চিরন্তন জীবনযাপন-ব্যবস্থার কথা: এমন কি আবহাওয়া, দুর্ঘটনা, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির কথাও। এটিই আশ্চর্য।

বলা বাহুল্য, বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের এমন একতরফা দৃষ্টি ও মনোবৃত্তি প্রশংসার যোগ্য নয়। সত্যানুসন্ধিৎসাপ্রবুদ্ধ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক মনীষা নিয়ে না এগুলে, এ-যুগের সাহিত্যিক নিদর্শনের অভাব চিরকাল থেকেই যাবে।

আসল ব্যাপার হ'ল,---খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা-ভাষা অপভ্রংশ অবস্থা থেকে বাংলার আঞ্চলিক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশিত হচ্ছিল। তখনও তার রূপ স্থিতিস্থাপক,---কখনও অপভ্রংশ-ঘেঁষা কখনও পরবর্তী যুগের বাংলা-ঘেঁষা। রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত নতুন চর্যাপদ ও কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সময়কার বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, বাংলা-সাহিত্যের তুর্কী-যুগ প্রধানতঃ ভাষা-গঠনের যুগ। বাঙালীর মন এ-সময় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে,---নদীর ধারার মতো এঁকেবেঁকে নিজের পথ নিজের ভাষার খাতে কেটে চলেছে; 'চিৎপ্রকর্ষ' শুরু হয়েছে। তাই, এই তুর্কী-যুগের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে ভাষার বেড়াজাল ভেদ করাই প্রধান লক্ষ্য এবং চিৎপ্রকর্ষ-সন্ধানের ব্যাপারটি গৌণ।

(খ) সুলতানী-যুগ (১৩৫১--১৫৭৫)

তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়কে 'সুলতানী-যুগ' বলা যায়। এই যুগের স্থিতিকাল ১৩৫১ থেকে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ। তুর্কী-যুগের শেষে দেশে যে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটল, তার ফলে বাংলা-দেশ মুসলিম সুলতানদের নেতৃত্বে স্বাধীন হ'ল। এ-দেশ শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, কারুকার্য ও জ্ঞান-গরিমায় ভ'রে উঠল। এ-সময়কার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-সমস্ত নিদর্শন এখনও কালের চোখে ধূলো দিয়ে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তার

প্রত্যেকটিই মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বাধীনতা শুধু বাংলার মানুষকে রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করেনি, মানসিক দাসত্ব থেকেও অব্যাহতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতার সংস্পর্শে বাঙালীর 'চিৎপ্রকর্ষ' দ্বিতীয় বার বিস্ফোরিত হ'ল।

এ-সময়কার বাংলা-সাহিত্যেও বাঙালীর বিচিত্র 'চিৎপ্রকর্ষ' বিধৃত। এখন বাংলা-ভাষার আর 'চলি-চলি-পা-পা' অবস্থা নয়; সে আপন পায়ে দাঁড়িয়ে মাথা উচুঁ ক'রে স্বাধীনতার সমারোহে যোগ দিতে সমর্থ। এখন সে শুধু হিন্দু আর মুসলমানের মুখে বুলি জুগিয়ে খুশী নয়, তাদের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল, প্রাণে সৃষ্টির উন্মাদনা ও কণ্ঠে গানের উচ্ছ্বাস তুল্‌তেও ব্যস্ত। এ-সময়কার বাংলা-সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশই তার একমাত্র প্রমাণ। আমরা বাংলা-ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ যেমন হিন্দুদের কাছ থেকে পেলাম, মুসলমানদের কাছ থেকেও তেমন নসীহৎনামা, সায়াৎনামা, আদ্য পরিচয় (১৪৯৮) প্রভৃতির মতো কিছু কিছু ধর্মীয় বা ধর্মসম্পৃক্ত গ্রন্থ লাভ করলাম। হিন্দুরা যেমন মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, সারদা-মঙ্গল প্রভৃতিতে নানা দেব-দেবীর অলৌকিক কাহিনী রচনা করলেন, মুসলমানরাও ঠিক তেমনই রসূল-বিজয় ও গাজী-বিজয় প্রভৃতি আজগুবী উপাখ্যান লিখ্‌লেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর ও গোরক্ষনাথের কাহিনী, ব্রতকথা-শ্রেণীর খাঁটি বঙ্গীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নতুন সৃষ্টি সত্যপীরের কথা এবং সংগীতের মধ্যে সুফীয়ানা বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সৃষ্টি করলেন। আর, একমাত্র মুসলমানেরাই বাংলা-সাহিত্যে একটা নেহাত দুঃসাহসিক অজ্ঞাত-রীতির আমদানী করলেন,—ফোক্-ইটিমোলজি বা লোকনিরুক্তিতে যার নাম দেওয়া চলে, "রমন্তিক-কাহিনী-কাব্য"। ফলে, ইউসুফ-জলিখা, হানিফা ও কয়রাপরী, লায়লী-মজনু, মনোহর-মধুমালতী লিখিত হ'ল। খাঁটি কাব্য-সাহিত্য হিসাবে এ-যুগের বাংলা-সাহিত্যে এগুলোর তুলনা নেই।

এই সুলতানী-যুগের বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য কতখানি শক্তিশালী ও বিস্তৃত, আমার এ-আলোচনা থেকে তার একটা আঁচ পাওয়া যাবে। এর থেকে এ-সময়কার বাঙালীর 'চিৎপ্রকর্ষের' একটা আন্দাজও করা যেতে পারে। একমাত্র ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনই বাঙালীর 'চিৎপ্রকর্ষের' বিবেচনায়, এ

সময়কার বাংলা-সাহিত্যের যুগটিকে 'গৌড়ীয়-যুগ' নামে অভিহিত করেছেন, তাঁর খ্যাতনামা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে। এজন্য তিনি নিন্দিতও হয়েছেন তাঁর জাত-ভাইদের কাছ থেকে। এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, এ-যুগের এই নাম যাবতীয় যুগ-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক নয়। বাংলার চিৎপ্রকর্ষের দ্বিতীয় বিস্ফোরণের নির্দেশও এতে বিশেষ নেই। তিনি পষ্ট ক'রেই ব'লে দিয়েছেন, গৌড়ীয় সুলতানদের বাংলা-সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষকতাই এ-যুগে আমাদের সাহিত্যের সৌভাগ্যের কারণ ব'লে তিনি যুগটির এ-নামকরণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও, এ-যুগে বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ হয় আরও নানা কারণে। তন্মধ্যে বাংলায় ইসলাম-ধর্মের বিস্তৃতি, ইসলামের সাথে বাঙালীর ঘনিষ্ঠতর সংস্রবে হিন্দু-মানসের মুক্তি, হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তন, বৈষ্ণব-মতবাদের প্রবর্তন, বিশেষ করে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে উন্নত ফারসী-সাহিত্যের গভীরতর যোগাযোগ,—এর কোনটিকেই তো বাংলা-সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির পক্ষে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে দুর্বলতর কারণ ব'লে মনে হয় না? এ-গুলো নিয়েই এ-যুগে বাঙালীর 'চিৎপ্রকর্ষ' সাধিত হয়েছিল। এগুলোকে বাদ দিলে, এ-যুগের বাংলা-সাহিত্য ছিন্নমূল হ'য়ে শূন্যে ঝুলতে থাকবে। ফলে, তা আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই, এ-যুগের সাহিত্য-রচনায় হিন্দু-মুসলমান কে কার অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন, সে-সম্বন্ধে আজও কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। হিন্দুর বাংলা-সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম-প্রভাব দেখতে পাই, মুসলিম বাংলা-সাহিত্যেও তেমনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিন্দু-প্রভাব লক্ষ্য করি। এর মানে এ নয় যে, হিন্দুরা মুসলমান অথবা মুসলমানেরা হিন্দু হ'য়ে গিয়েছিল। মুসলমানের সংস্কৃত-চর্চা এবং হিন্দুর ফারসী-চর্চাও এর আর একটা কারণ। এ-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে এ-মৌলিক সত্যগুলোকে উপেক্ষা করলে, এ-সময়কার সাহিত্যালোচনা ভুয়ো ও মূল্যহীন হ'য়ে পড়তে বাধ্য।

মোগলাই যুগ (১৫৭৬—১৭৫৭)

বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগের তৃতীয় পর্যায় হ'ল 'মোগলাই যুগ'। এর স্থিতিকাল ১৫৭৬ থেকে ১৭৫৭ অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে একশ' আশী বছর।

বাংলার স্বাধীনতার অবসান ও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি বাঙালীর পক্ষে এমন একটা অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, এতে বাংলার চিৎপ্রকর্ষ তৃতীয়বার বিস্ফুরিত হ'ল। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'মোগলাই যুগের' প্রথম পঞ্চাশ বছর 'সুলতানী যুগে'র জের চলেছে। অতঃপর, উত্তর ভারতীয় মোগলাই বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে বাংলায় প্রবেশ ক'রে দেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। এতেই বাংলার 'চিৎপ্রকর্ষ' নতুন ক'রে বিস্ফুরিত হয়েছে। তাই, এযুগের বাংলা-সাহিত্যকে মোগলাই যুগের সাহিত্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রাক্-ইংরেজ যুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রতি ফিরে তাকালে দেখা যায়, মোগলাই যুগই 'বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ'। সাহিত্যের পূর্ববর্তী ধারাগুলোর পরিণতি এবং নানা নতুন ধারার প্রবর্তন ও বিকাশ থেকেই উক্তিটির সার্থকতা বুঝতে পারা যায়। চণ্ডী-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গলের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। তার সাথে ধর্ম-মঙ্গল ধারাও যোগ দিল ও প্রবল হ'ল। পূর্বেকার কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে থাক্‌ল বার বার খোলস পাল্‌টিয়ে, কিন্তু মহাভারতের ক্ষেত্রে কাশীদাস দেশকে মাত ক'রে দিলেন। পূর্ব-যুগের সত্যপীর সত্যনারায়ণ রূপে মোগলাই পোশাক প'রে আসর জাঁকিয়ে বস্‌লেন যত্রতত্র, আর তার সাথে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন গাজীমিয়া। মুসলমানদের যে-'রমন্তিক-কাহিনী-কাব্য' পূর্বযুগে নতুন ছিল, দৌলত কাজী আলাওল প্রভৃতির হাতে তার পূর্ণ সার্থকতা সাধিত হ'য়ে, লালমতী-সয়ফুল-মুলক, জেবলমুলক-শামারুখ, শাহজালাল-মধুমালা ও গুল্-ই-বকাওলী প্রভৃতিতে এসে একেবারে ফিকে হ'য়ে পড়ল। বৈষ্ণব-ইতিহাস, বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেশ ছেয়ে গেল---দেশে 'রাধা ছাড়া সাধা' এবং 'কানু ছাড়া গান' রইল না। পদাবলী যে শুধু এই যুগের বাংলা-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট সম্পৎ হ'য়ে রইল এমন নয়, আজও জাতিবর্ণনির্বিশেষে বাঙালী রসের দিক থেকে তাকে উপভোগ করে আনন্দ লাভ কর্‌ছে। হিন্দু-ব্রত-কথা ও পুরাণ-কাহিনীতে দেশ যেমন ভ'রে গেল, নবীবংশ, রসূল-বিজয় ও আমীর হামজা-জাতীয় মুস্‌লিম-কাহিনীতেও তেমন দেশ ভেসে গেল। দারা-শিকূহ-এর 'মজ্‌মা-উল্-বাহ্‌রায়্‌ন্' বা 'দ্বিসমুদ্র-সংগম্'-এর ঢেউ বাংলায় এসে পৌঁছুবার আগে থেকেই এখানে যোগের সাথে তসব্বুফ্ এবং তসব্বুফের সাথে যোগের সমুদ্র-সংগম ঘটে গেল, আর আমরা সেই তীর্থে স্নান

করে স্নাতক হলাম। আমাদের প্রাণে 'জ্ঞান-প্রদীপ' জ্বলে উঠ্‌ল, নূর-জলাল 'নূর-জমাল' রূপ হ'য়ে দেখা দিল; আর আমরা 'যোগকালন্দর' ধ্যান করে 'চারি-মকাম-ভেদ' কর্‌লাম।

এ ছাড়াও, এই যুগে আমরা সম্পূর্ণ নতুন পথে এগিয়ে কারবালা-প্রান্তরে 'মকতুল-হোসেনের' যে হৃদয়-বিদারী দৃশ্য দেখেছি, তা'র শোকে আমাদের সাথে রাধারমণ গোপের ন্যায় হিন্দু প্রতিবেশীরাও কেঁদেছেন। অধিকন্তু, এ-সময়েই আমরা 'তোহফা' 'কিফায়িতুল মুসল্লীন', 'শরীয়তনামা' প্রভৃতির সাহায্যে যেমন খাঁটি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছি, 'নূরনামা' ও 'নূর কন্দিল' প্রভৃতির সাহায্যে তেমন সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য ভেদ কর্‌তেও কসুর করিনি। এমন কি, ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগিণীর সাথে মোগলাই সংগীতের তরানাও ধরা দিয়েছে আমাদের বহু 'রাগমালা' ও 'ধ্যানমালা'-র রাগ ও ধ্যান সাধনায়।

মোটকথা, প্রাক্‌-ইংরেজ যুগের বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন যুগ নেই, যার সাথে গুণ ও গুরুত্ব—কোনটিতেই, মোগলাই যুগের বাংলা-সাহিত্য তুলিত হ'তে পারে। মোগলাই যুগ বাংলা-সাহিত্যের বিস্তৃতির চরম-যুগও বটে। এ-সময় বাংলার প্রত্যন্ত-অঞ্চলে মল্লভূমি, কোচ-বিহার, কামরূপ, আরকান,—যে-কটি স্বাধীন রাজ্য ছিল, তার সব কটিতেই বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য সম্মানের আসন লাভ করেছিল। এ-রাজ্যগুলোতে বাংলা-সাহিত্য শুধু যে তার 'সুলতানী-যুগের' ঐতিহ্য রক্ষা করেছে, এমন নয়; বরং সে তার নতুন নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত ক'রে মাতৃভূমির মুখও রক্ষা করেছে।

এ-সময়কার বাংলা-সাহিত্য 'চিৎপ্রকর্ষে' যেমন বিশিষ্ট, পোশাক-পরিচ্ছদেও তেমনি অনেকখানি অসাধারণ। ভাষায় ফারসী-জরীর বুনোনি, দেহে জড়োয়া অলংকার, গতিতে গাম্ভীর্য ও রুচিতে সৌন্দর্য-বোধ, কল্পনায় বিশালতা ও স্বভাবে বিলাস-লিপ্সা নিয়ে এ-যুগের সাহিত্য একান্তই মোগলাই। এর সব চাইতে বড় নজীর হ'ল আলাওল ও ভারতচন্দ্রের সাহিত্য।

পঠন ও পাঠন

এবার আমরা তথাকথিত মধ্যযুগের অর্থাৎ তুর্কী, সুলতানী ও মোগলাই যুগের বাংলা-সাহিত্যের আর এক দিকে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই।

যখনই ভাবি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত "বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য-সপ্তাহ" উদ্‌যাপন উপলক্ষেই বর্তমান আলোচনাটি পরিকল্পিত হয়েছে, তখনই মনে হয়, পঠন ও পাঠনের কথা বাদ দিয়ে আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারে না। এবার সে-সম্বন্ধেই দু' একটি কথা পেশ কর্‌ছি।

স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অতীত সূরীদের বর্তমান বংশধর। তাঁরা লিপির মাধ্যমে আমাদের জন্য তাঁদের যে জীবন-বেদ ও জীবনবোধের আমানত রে'খে গেছেন তার হেফাজত করার ভার বর্তিয়েছে আমাদের কাঁধে। এ-দায়িত্ব পালন করার উপায় কি? যতই ভাবি, মনে হয়, এ-দায়িত্ব-পালন শুধু কঠিন নয়—একরূপ অসাধ্যও বটে। এ পথে এগুতে গেলেই দেখা যায় বাধার অন্ত নেই—লিপিগত বাধা, ভাষাগত বাধা, ভাবগত বাধা, সংস্কারগত বাধা, সংস্কৃতিগত বাধা, শিক্ষাগত বাধা এবং এমন আরও বহু বাধা, যাকে জয় না কর্‌লে এ-যুগ-গুলোর সাহিত্যের পাঠন ও পঠনের দায়িত্ব আমরা পুরোপুরি পালন কর্‌তেই পারি না। একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়, সকল বাধার সেরা বাধা হচ্ছে কালগত বাধা, যাকে অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। যে-কালে তথাকথিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে এখন আমরা বহু দূরে,—এত দূরে যে, দূরবীন দিয়েও তার আদি প্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এর ফল আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আজ অতীত আমাদের কাছে দুর্বোধ্য;—আমরা তার লিপি চিনি না, তার ভাষা বুঝি না। তার ভাব গ্রহণ করতে পারি না, তার সংস্কারের ও সংস্কৃতির সন্ধান পাই না। এমন কি, সভ্যতার রূপটিও চোখে দেখি না। তা হ'লে উপায় কি? একমাত্র উপায় দূরবীনের ব্যবহার। এটিই আমাদের কালগত বাধা জয়ের একমাত্র সম্বল; এবং এটিই হচ্ছে কল্পনার দূরবীন। অতীত যুগের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে কল্পনার দূরবীন ব্যবহার ছাড়া অন্য উপায় নেই। এটি এমন একটা সত্য যাকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, একালের সাহিত্যের পঠন এবং পাঠনেও কল্পনা

ব্যাপক ব্যবহার-সাপেক্ষ। তবে, বর্তমান সাহিত্য-পাঠোপযোগী কল্পনা অতীত সাহিত্য-পাঠের পক্ষে সম্যক উপযোগী নয়।

অতীত সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে কল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা শুনে কারও কারও তাক্ লাগার সম্ভাবনা আছে। আমি এ-প্রসঙ্গে তাঁদেরকে বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যক্ষ সত্য নয়; এগুলো প্রত্যক্ষ-বস্তুনির্ভর কাল্পনিক সত্য। তাই চাঁদে কি আছে, আজিও তার ষোল আনা ঠিক হ'ল না; মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর মত কি না, তার হদিস পাওয়া গেল না; 'ইলিমেণ্ট' বা মৌলিক পদার্থের নিশ্চিত সংখ্যা নির্ধারিত হ'ল না; অথচ 'থিওরি' বা কল্পতত্ত্বের অন্ত নেই। এ-সমস্ত কল্পতত্ত্বের একমাত্র সম্বল তথ্যনির্ভর পৃথিবী ব'লে, বৈজ্ঞানিকদেরকে কল্পনার আশ্রয় নিতেই হয়।

অতীত যুগের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে এই কথাটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী। এ-সময়কার সাহিত্যের ছিটেফোঁটা যা পাওয়া গেছে, কোনটিই ফেলে দেবার মতো নয়। কারণ, অতীত যুগ, তার মানুষ, তার জীব-জন্তু, তার গাছ্-পালা, তার সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত একটা পূর্ণ-সত্তা; আর আমরা তার যে-অংশ আজ পেয়েছি, তা তার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই ছিটেফোঁটার প্রত্যক্ষ সত্যের উপর নির্ভর ক'রে কল্পনার সাহায্যে অদৃশ্য অতীত সত্তাটিকে একটা রূপ দিতে পারলে পরে, সত্তাটির দেখা পাওয়া যেতে পারে,—নতুবা নয়। প্রকৃতপক্ষে এ-দেখা সত্যিকার দেখা নয়,—তবে সত্যনির্ভর দেখা। তাই বল্‌তে হয়, আলোচ্য যুগত্রয়ের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে কবি-কল্পনা নিতান্তই অকেজো ও বৈজ্ঞানিক-কল্পনা অত্যধিক ফলপ্রসূ।

এ-সময়কার সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে অন্য বাধা দূরতিক্রম্য বটে,—কালগত বাধার মতো অনতিক্রম্য নয়। লিপিগত বাধা, কি ভাষাগত বাধার কথাই ধরুন না। লিপিগত বাধা অভ্যাসসাপেক্ষ এবং ভাষাগত বাধা শিক্ষা-সাপেক্ষ। কেননা, অভ্যাস করলেই লিপি পাঠ করা যায় এবং ভাষাতাত্ত্বিক শিক্ষার সাহায্যেই ভাষা অধিগত হয়। এ ছাড়া আরও একটি বাধা রয়েছে; তা হচ্ছে মানুষের সংস্কারগত বাধা। এর প্রকৃতি বিচিত্র ও উন্মেষ

জন্মগত। এ-বাধা জয় করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ,---সংস্কার ও সংস্কৃতিগত বাধা জয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক উন্নাসিকতা।

উন্নাসিকেরা মনে করেন, আমাদের অতীত সাহিত্যের পঠন ও পাঠন পণ্ডশ্রম মাত্র; কেননা এগুলো সাহিত্যই নয়, এতে না আছে শিল্প, না আছে কলা, না আছে কোন জ্ঞান। এঁরা সাহিত্য বল্‌তে কি বোঝেন, জানিনে। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের আঙ্গিকে ঢালাই করা পাশ্চাত্ত্য ভাব-প্লাবিত আধুনিক বাংলা-সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য, আর অন্য যা, কিছুই না,---এমন একটা মনোবৃত্তি এ-ধারণার জন্ম দিয়ে থাক্‌বে। এটিকেই আমি উন্নাসিক মনোবৃত্তি ব'লে মনে করি। যা-ই পাশ্চাত্ত্য, তা-ই জ্ঞানগর্ভ ও শিল্পসম্মত,---এই কথা স্বীকার করা যে-কথা, যারাই পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিবাসী, একমাত্র তারাই সভ্য, অন্য সব দেশের লোক অসভ্য,---এই কথা মেনে নেওয়াও একই কথা। জ্ঞান সব সাহিত্যেই আছে,---কেবল আহরণ কর্‌তে জান্‌লেই হয়, এবং সুসভ্য লোক অল্পবিস্তর সব দেশেই বাস করে,---কেবল পরিচয় কর্‌তে শিখলেই হয়। সে-ক্ষমতার অভাব ঘটলে, পূরণ করা সহজ নয়।

আলোচ্য যুগের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে উন্নাসিক-মনোবৃত্তির স্থান নেই। ইংরেজীতে যাকে sense of humility বলে, বাংলায় আমরা তাকে 'সম্ভ্রমসূচক মনোভাব' বলতে পারি। এই সম্ভ্রমসূচক মনোভাব নিয়েই আমাদেরকে আলোচ্য যুগের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে এগুতে হ'বে,---নইলে কোন ফল হবে না। আমরা যাকে জানব, আমরা যাকে বুঝব, আমরা যাকে আপন করব, তাকে যদি অবজ্ঞা করি ও তার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাই, সে আমাদেরকে ধরা দেবে কেন? অবজ্ঞাই বলুন, আর অশ্রদ্ধাই বলুন,---উভয়েই অজ্ঞতাপ্রসূত দোষ এবং এই অজ্ঞতার থেকেই উন্নাসিকতার জন্ম। দেখবার মতো চোখ, শোনবার মতো কান ও বুঝবার মতো মন থাকলে, সামান্যও অসামান্য হ'য়ে ওঠে ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়। মানুষের উন্নাসিকতা আলোক-লতার মতো মূল্যবিহীন চটক,---আশ্রিতের রক্ত শোষেই এর দীপ্তি। মাটির মায়ের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ নেই ব'লে এর বাঁচোয়া নির্ভর করে শূন্যে আশ্রিতের মাথায়;---মাটিতে নামলেই তার মৃত্যু নিশ্চিত।

উন্নাসিকতার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা সাহিত্য পাঠ করি কেন,—তা পুরোনোই হোক, আর নতুনই হোক? আমরা কি জ্ঞান-আহরণের জন্য সাহিত্য পাঠ করি? যদি তাই হয়, তবে এত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল থাক্‌তে জ্ঞানগর্ভ ব'লে দাবি না করা সত্ত্বেও, লোকজন সাহিত্য কর্‌তে বা পড়তে আস্‌ছে কেন? যদি সাহিত্যে শিল্পকলার সন্ধান কর্‌তে হয়, তবে সাহিত্য ছেড়ে সোজাসুজি আর্ট ইন্‌স্টিটিউটের মতো কলা-ভবনেই গেলেই তো চলে; রঙ্গমঞ্চে, কি প্রেক্ষাগৃহে গেলেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'তে পারে। অবসর-বিনোদনও সাহিত্য-পাঠের মূল অভিপ্রায় নয়। তার জন্য সাহিত্য-পাঠের চেয়েও প্রশস্ত ক্ষেত্র অন্যত্র বর্তমান রয়েছে। আর আমাদের মতো যাঁরা পেটের দায়ে সাহিত্য পড়ে বা পড়ায়, তাঁদের কথা না বল্লেও চলে।

এর কোনটিই, নতুন বা পুরোনো, কোন রকমের সাহিত্য-পাঠের উদ্দেশ্য নয়। ইংরেজীতে যাকে Lure of the unknown বলে, বাংলায় তাকে আমরা 'অজানার আকর্ষণ' ব'লে প্রকাশ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, এ অজানার আকর্ষণেই আমরা সাহিত্য পড়ে থাকি ও পড়তে প্রলুব্ধ হই। মানুষের মন পরস্পর পরস্পরের সাথে মিল্‌তে চায়, পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌তে চায়, জান্‌তেও চায়; অথচ দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে, কালের বন্ধনে আট্‌কা প'ড়ে মানুষের মনের এই মিলন অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এক কালের দুই মানুষের মধ্যেও যেমন দুস্তর ব্যবধান, দুই কালের দুই মানুষের মধ্যেও তেমন অনন্ত ব্যবধান বিরাজ কর্‌ছে। একমাত্র সাহিত্যেই, মানুষ তার মনের নক্‌সী-কাঁথা বিছিয়ে দেয় ও মনকে বন্দী ক'রে রাখে। তাই, পরস্পর-মিলনোন্মুখ মানব-মন সাহিত্যের সন্ধান করে, পাঠ করে, আলোচনা করে। যে-মনের সাথে যে-মনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়, সে-মনোবিধৃত সাহিত্যই তার ভাল লাগে, প্রিয় হয়। তাই, সাহিত্যে ভালো লাগা ও ভালো না লাগার প্রশ্ন চিরন্তন।

অতীত যুগের বাংলা-সাহিত্যের পঠন ও পাঠনে কালগত অনন্ত ব্যবধান বর্তমান থাকায়, এর জ্ঞান, প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত সীমিত। আমাদের শিক্ষায়তনগুলোর বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়া বাইরের বেশী সংখ্যক লোকের মধ্যে এ-সাহিত্যের কদরদানী বড় একটা

দেখা যায় না। এ-অবস্থার উন্নতিবিধান সম্ভব কিনা, তাও ভে'বে দেখার প্রয়োজন আছে। অতীত কালের লোকেরাও এর একটা সুরাহা করবার চেষ্টা করেছিলেন। আজকালকার দিনের পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত "ঈষৎ পরিবর্তিত" করার রীতির মতো তখনকার দিনে পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী সাহিত্যের ঈষৎ পরিবর্তন সাধন ক'রে একটা নতুন রূপ দিতেন। এতে প্রায় সর্বত্র ভাষার নবীকরণের সাথে দুর্বোধ্য ভাবেরও পরিবর্তন সাধিত হ'ত। এমন কি, মূল কাহিনীও মাঝে-মাঝে সংক্ষেপায়িত বা দীর্ঘায়িত হ'ত। ফলে, পূর্বযুগের সাহিত্য পরবর্তী যুগে বহুল পরিমাণে শ্রুত ও সমাদৃত হ'ত। কালের ব্যবধানে সাহিত্যে যে লিপি, ভাষা, ভাব ও রুচিগত ব্যবধান সাধিত হ'ত, তাঁরা সে ব্যবধান অতিক্রম করার একটা সহজ পন্থা বের করেছিলেন এমন একটা কাণ্ড করেই। এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে তা কেউ করতে রাজী হবে না নিশ্চয়, পাছে কেউ না ব'লে বসে,—'এ-যে জগাগোপালী কাণ্ড'।

তথাপি, অতীতের সাথে আমাদের যথাসাধ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। তা কি ক'রে সাধিত হ'তে পারে, সে বিষয়ে আমি অতীত যুগের সাহিত্য-সেবকদের কাছে চারটি প্রস্তাব বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্য পেশ করছি:

(ক) Textual Criticism বা পাঠসমালোচনা-শাস্ত্রে যাকে Composite Text বা সমন্বিত-পাঠ বলে, অতীত হস্তলিপির বিভিন্ন পাঠ থেকে বে'ছে এক একটা পুস্তকের সমন্বিত-পাঠ তৈরি ক'রে সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এতে জনসাধারণের সাথে তাঁদের পূর্বপুরুষের মনের পরিচয় নিকটতর হবে। অধিকন্তু, লিপিগত দূরত্বও নিকটতম হবে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, লিপিগত বাধা অতিক্রম কর্‌তে গিয়ে কেবল তৎসম শব্দের বানান শুদ্ধ করা ছাড়া, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে, অথবা দুর্বোধ্য শব্দাদিতে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়। এতে ভাষার প্রকৃতি বদ্‌লে যাবে।

(গ) তৃতীয়তঃ, আধুনিক গদ্যে পুরোনো সাহিত্যের নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে। এতে জনসাধারণের সাথে নতুন ক'রে পুরোনো সাহিত্যের পরিচয় হবে।

(ঘ) চতুর্থতঃ, সময় সময় সভা-সমিতি ডেকে পুরোনো সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের মারফত আলাপ-আলোচনার আয়োজন কর্‌তে হবে। এ আলাপ-আলোচনা উচ্ছ্বাসপ্রধান ও ভাবপ্রবণ না হ'য়ে বৈজ্ঞানিক কল্পনা-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, পুরোনো বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে এখন আমরা ভাব্‌তে আরম্ভ করেছি, আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে; এখন পুরোনো বাংলা-সাহিত্যের আলোচনাও শুরু হয়েছে। বর্তমান বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য ভুঁইফোড় নয়,—বনেদী, এ কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের দিগ্‌দর্শন

গীতিকাব্য

(ক) চর্যাপদ (দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)।

পদাবলী—চণ্ডীদাস (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ)।

বৈষ্ণব পদাবলী—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, শেখ কবীর, আলাওল, সৈয়দ মর্তুজা, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি।

(খ) **পৌরাণিক কাব্য:**

মহাভারত—কবীন্দ্র পরমেশ্বর; শ্রীকর নন্দী; কাশীরাম দাস।
রামায়ণ—কৃত্তিবাস; অদ্ভুতাচার্য, কবিচন্দ্র।
কৃষ্ণায়ন—মালাধর বসু; শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর; ভবানন্দ।
শিবায়ন—রতিদেব; কবিচন্দ্র; রামেশ্বর।

(গ) **লৌকিক কাহিনী কাব্য:**

মনসা-মঙ্গল—কানাহরি দত্ত; বিজয়গুপ্ত; বিপ্রদাস; ক্ষেমানন্দ।
চণ্ডীমঙ্গল—মাণিকদত্ত; মাধবাচার্য; মুকুন্দরাম।
ধর্ম-মঙ্গল—রামাই পণ্ডিত; ময়ূরভট্ট; খেলারাম; ঘনরাম।
গঙ্গামঙ্গল—মাধবাচার্য; দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি; দ্বিজ গৌরাঙ্গ।

(ঘ) **চরিতাখ্যান কাব্য:**

চৈতন্য-চরিত—বৃন্দাবন দাস; কৃষ্ণদাস কবিরাজ; লোচনদাস; জয়ানন্দ। অদ্বৈত চরিত—ঈশান নাগর, হরিচরণ দাস।
প্রেম-বিলাস—নিত্যানন্দ দাস।

(ঙ) **বৈদেশিক কাহিনী কাব্য:**

ইউসুফ-জোলেখা—মোহাম্মদ সগীর।
লায়লী-মজনু—বাহরাম খান।

লোর চন্দ্রানী—দৌলত কাজী।
চন্দ্রাবতী—কোরেশী মাগন।
পদ্মাবতী—আলাওল।
ছয়ফুল মুলুক—দোনাগাজী, আলাওল।

(চ) তত্ত্বকথা-কাব্য :

জ্ঞান-প্রদীপ—সৈয়দ সুলতান।
যোগ-কালন্দর—সৈয়দ মর্তুজা।
জ্ঞান-সাগর—আলী রাজা।

(ছ) পীর-মাহাত্ম্য-কাব্য :

সত্যপীর—ফয়জুল্লাহ্, দ্বিজ গিরিধর; রামেশ্বর ভট্টাচার্য; ভারতচন্দ্র রায়; শঙ্কর-আচার্য।

ত্রৈলোক্য-পীর—হরিরাম দাস, রামগঙ্গা দাস।
বড়খাঁ গাজী—কৃষ্ণরাম (রায়মঙ্গলে)।
মানিকপীর—অসংখ্য গান।

(জ) **লোক-সঙ্গীত**

পল্লীগীতিকা—পূর্ববঙ্গ গীতিকা; ময়মনসিংহ গীতিকা।
বাউল গান—হারামণি।
কবিওয়ালা—হরুঠাকুর (১৭৩৯—১৮২৫)।
রামরামবসু—(১৭৭৯—১৮৩০) আন্টুনী ফিরিঙ্গী।
গম্ভীরা, জাগ, ঝুমুর, মুর্শিদা, ভাটিয়ালি।

খ্রীস্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী তিন শত বৎসর বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম কাল। এই সময়ে বাংলাভাষা আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া মাগধী-প্রাকৃত হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে থাকে। এই সময়েই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সিদ্ধাগণ প্রাচীনতম বাংলায় চর্যাপদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাপদগুলি গান। পটমঞ্জরী, কামোদ, গুঞ্জরী, বড়ারী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর সাহায্যে এইগুলি গীত হইত।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কোন সাহিত্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তথাপি নানা কারণে মনে হয়, বাংলার খ্যাতনামা কবি চণ্ডীদাস (বড়ু চণ্ডীদাস) চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই খাঁটি বাংলা-সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্য বহু কবির ধ্যানের স্বপ্নে রঙ্গীন এবং জীবন-ব্যাপী সাধনার ফলে বর্ধিত, পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে বাংলার সাহিত্য-ধারা ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুখাতে প্রবাহিত।

গীতি-কাব্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ খাত। চর্যাপদ, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, গৌরচন্দ্রিকা, কবিগান প্রভৃতি এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। গান দিয়াই প্রাচীন ও মধ্যযুগীন বাংলা-সাহিত্যের আরম্ভ এবং গান দিয়াই ইহার অবসান ঘটিয়াছে।

পৌরণিক-কাব্য-খাতে কৃত্তিবাস রামায়ণ এবং কাশীদাস মহাভারত রচনা করিয়া কালজয়ী হইয়াছেন। রামায়ণ রচনায় কৃত্তিবাস আদি কবি এবং কীর্তিতেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, মহাভারত রচনায় কাশীদাস শ্রেষ্ঠ বটে, আদি নহেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরই বাংলায় এই বিষয়ের পথপ্রদর্শক। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস বাংলার জাতীয় কবিরূপে পরিগণিত; কারণ তাঁহাদের রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত-রামায়ণ ও মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে। তাঁহারা মূল কাব্যের অস্থি-পঞ্জরে যে রক্ত-মাংসের সংযোগ করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য দুইখানির সম্পূর্ণটি বাঙালীয়ানায় হউক বা না হউক, অন্তত দুই-তৃতীয়াংশে বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের লৌকিক-কাহিনীর খাতও বহুবিস্তৃত। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিব, শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গা প্রভৃতি অনেক আর্য ও আর্যেতর দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য যে-সমস্ত লৌকিক কাহিনী দেশে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, তাহাকে উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়া, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আমাদের কবিগণ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। এইগুলি সাধারণত "মঙ্গল-কাব্য" নামে খ্যাত। প্রধানত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য রচিত হইলেও এইগুলি বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহার ও নর-নারীর চিত্রে পরিপূর্ণ। "মনসামঙ্গল" রচয়িতাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস শুধু প্রাচীনতম নহেন, উৎকৃষ্টও বটে। মাধবাচার্য ও মুকুন্দরামের সমকক্ষ "চণ্ডীমঙ্গল"-রচয়িতা আর একটিও দেখা যায় না।

মুসলমানেরাই বাংলায় সর্বপ্রথম বৈদেশিক কাহিনী-কাব্যের প্রবর্তন করেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, ফারসী ও হিন্দী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কাব্যগুলির মূল গল্প পল্লবিত আকারে বাংলার রূপ ও রস লইয়া একে একে অনূদিত হইতে থাকে। কবি মোহাম্মদ সগীর এই ধারার প্রাচীনতম এবং কবিবর আলাওল ইহার শ্রেষ্ঠ সেবক। বাহরাম খান, কাজী দৌলত ও হায়াৎ মামুদও এই ধারার খ্যাতনামা ও শক্তিশালী কবি। ইঁহাদের কাব্যগুলি নিছক কাহিনীমূলক এবং তাহাতে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনের কোন বালাই নাই বলিয়া, কাব্যগুলি প্রকৃত কাব্য-সংজ্ঞা ও সৌন্দর্যের পূর্ণ অধিকারী।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলিম ভাবসংমিশ্রণের কাল। এই সময়ে বাংলায়ও হিন্দু-মুসলিম ভাব-সংমিশ্রণ ঘটে। ভারতীয় যোগ-সাধনার সহিত ইরানের সূফীবাদ মিলিত হইয়া বাংলায় যে ভাব-সমন্বয় ঘটে, তাহার ফলে সৈয়দ সুলতানের "জ্ঞান-প্রদীপ", সৈয়দ মর্তুজার "যোগ-কালন্দর", আলীরাজার "জ্ঞান-সাগর" প্রভৃতির ন্যায় বহু তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক রচিত হইয়াছিল। এক শ্রেণীর লোকের নিকট এই জাতীয় পুস্তকের আদর এখনও কমে নাই।

বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ভাব-সমন্বয়ের আর একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইল খ্রীস্টীয় ষোড়শ হইতে "পীর-মাহাত্ম্য-কাব্যে"র উদ্ভব। বাংলার হিন্দুরাই এই সাহিত্য সৃষ্টিতে অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনায় এই সময়ে সত্য-পীরের সৃষ্টি হয় এবং পরে সত্যপীর সত্যনারায়ণ হইয়া একটি বিশাল সাহিত্যের জন্মদান করে। তাই আজও বাংলায় সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর অভাব নাই। রামেশ্বর ভট্টাচার্যই এই বিষয়ে সর্বাধিক কৃতী কবি। ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে ত্রৈলোক্য পীর, বড় খাঁ গাজী; মানিক পীর প্রভৃতিও আসিয়া সাহিত্যে ভীড় জমাইয়াছেন।

বাংলায় লোক-সঙ্গীতেরও অন্ত নাই। যখন বাঙালীর 'গোলায় গোলায় ধান' ও 'গলায়-গলায় গান" ছিল, তখন লোক-সঙ্গীতের অভাব থাকিবেই বা কেন? বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, জাগ, জারি, সারি, পাঁচালি, তর্জা, কবি ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রভৃতি এই লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গত।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা-সাহিত্যের কয়েকটি স্থূল বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আবশ্যক। এইগুলি বাংলা-সাহিত্যের প্রগতি-ধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বৈশিষ্ট্য কয়টি এইরূপ :—

(১) বঙ্গে হিন্দুশাসন কালে (১২০০ খ্রী: পর্যন্ত) বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়। কিন্তু, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের দ্বারাই প্রাচীনতম বাংলা-সাহিত্য রচিত।

(২) বঙ্গে মুসলমান-শাসন কালে (১২০০—১৭৫৭) মুসলমান বাদশাহ এবং তাঁহাদের হিন্দু-মুসলমান শাসনকর্তা ও সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ।

(৩) বঙ্গে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবে প্রেম-ভক্তির যে অপূর্ব নিস্রাব প্রবাহিত হইল, তাহা বাংলা-সাহিত্যকে নবীন রসে নিষিক্ত, নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, অভিনব সুষমায় বিশোভিত করিয়া "পদাবলী-সাহিত্যের" সৃষ্টি করিল এবং চরিতাখ্যান রচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

(৪) পলাশীর যুদ্ধের পর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, জাতির জীবন-ধারা তখন যেন অবরুদ্ধ। তাহার মধ্য হইতে সামান্য রস উৎক্ষরিত হইয়া রামপ্রসাদী, কবি ও পাঁচালি গানের অর্থাৎ হাল্কা সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র।

(৫) প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য পদ্য সাহিত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে লিখিত কোন গদ্যই সাহিত্য-পদবাচ্য হইবার ক্ষমতা রাখে না। চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবিজে ব্যবহৃত গদ্যই এই সময়কার একমাত্র নিদর্শন।

(৬) গতানুগতিকতা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। একই বিষয়ে বহু কবি কাব্য লিখিয়াছেন। এইজন্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য অধিক নাই।

(৭) ধর্মই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র প্রেরণা। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম-প্রেরণা লইয়া লিখিত।

(৮) দেব-দেবী ব্যতীত মানুষের চরিত্র ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে একান্ত বিরল। মানুষের যে-সমস্ত চিত্র দেখা যায়, তাহা শুধু দেব-দেবীর চরিত্র ফুটাইবার জন্যই চিত্রিত হইয়াছে।

(৯) একমাত্র মুসলমান কবি ব্যতীত আর কেহ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে শুধু রস-সৃষ্টির জন্য কোন কাব্য লিখেন নাই বা মানব-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই। তাই, একমাত্র মুসলমান কবিরাই বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম মানবিক মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা ও মানব উপভোগ্য সাহিত্য-রসের আমদানি করিয়াছিলেন।

(১০) মধ্যযুগের-বাংলা-সাহিত্য প্রধানত জনসাধারণের সাহিত্য। শিক্ষিত সমাজ এই সাহিত্যের বড় একটা ধার ধারিত না। যাঁহারা কবি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও উচ্চ-শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। এই জন্য ভাব, ভাষা ও কল্পনায় এই সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপযোগী ও শালীনতা-শূন্য।

(১১) মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য এক বিরাট সাহিত্য। ইহার অতি সামান্য অংশই অদ্যাবধি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহার সকল দিক্ এখনও খুব অল্প লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই দিগ্‌দর্শন দ্বারা এই বিশাল সাহিত্যকে বুঝিবার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে।

আধুনিক যুগের দিগ্‌দর্শন

যুগ-সূত্র :—

(ক) যুগ-সন্ধি—
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—১৮৫৯)
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭—১৯০৫)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)
দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—১৮৭৩)

(খ) পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত মহাকাব্য—
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩)
নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬—১৯০৯)
(বহু অনুকারী)

(গ) গীতি-কাব্য—
বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৪—১৮৯৪)
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮—১৮৭৮)
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬)

(ঘ) স্বাজাত্যবোধ উদ্রেকাত্মক কাব্য—
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬—১৮৮৭)
বনোয়ারীলাল রায় (১৮২৫—১৮৯০)
ললিতমোহন ঘোষ (১৮৭৪)

(ঙ) অনুবাদ কাব্য—
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬—১৮৮৭)

হরিমোহন গুপ্ত (সন্ন্যাসীর উপাখ্যান)
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (পরিত্যক্ত গ্রাম)

(চ) ব্যঙ্গ কাব্য—
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯---১৯১১)
জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২---১৯০৬)
রাজকৃষ্ণ রায়

(ছ) বিবিধ-কাব্য---
আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৩৩—১৯০৫)
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৯---১৯০০)

(জ) মুসলিম কাব্য-সাধনা---
মোজাম্মেল হক (১৮৫৮---১৯৩৩)
কায়কোবাদ (১৮৫৯---১৯৫১)
মুন্সী আবদুল আলা।

বঙ্গে ইংরেজ অধিকারের সুপ্রতিষ্ঠা এবং বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের ফলে বাংলা-সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পরেই বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইলেও, ইংরেজ-অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বহুল প্রসারিত হইতে দীর্ঘ দিন আবশ্যক হইয়াছিল। প্রায় এক শতাব্দীর পরেই অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) কাছাকাছি সময়ে আসিয়া বাংলার মনোজগতে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব সূচিত হয়। এই সময়ে বাংলার কাব্য-জগৎ হইতে প্রাচীন-যুগ বিদায় লইতেছিল এবং আধুনিক অর্থাৎ নবীন-যুগ ধীরে ধীরে তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছিল। এই জন্যই এই সময়টুকুকে অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে কিঞ্চিৎ পর অবধি সময়কে "যুগ-সন্ধি" নামে অভিহিত করা যায়।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এই "যুগ-সন্ধিক্ষণে" একজন খ্যাতনামা কবি বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—১৮৫৯)। ইনি সাধারণত "গুপ্ত কবি" নামে খ্যাত। 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একখানা প্রভাবশালী পত্রিকা সম্পাদনের মধ্যদিয়া তিনি যে

একটি বিশাল লেখক ও কবি-গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই অল্পদিন পরে বাংলা-সাহিত্যে যুগান্তর আনীত হয়। তিনি খ্যাতনামা পত্রিকা-সম্পাদক হইলেও মূলত কবি ছিলেন। রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রই (১৭১১—১৭৫৯) তাঁহার আদর্শ ছিল। এই হিসাবে তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন। আবার ইংরেজী কবিতার অনুবাদ বা ভাবালম্বন করিয়া তিনি আধুনিক যুগের কবিদের পথ প্রদর্শকরূপেও বিরাজমান। এইরূপে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের "যুগ-সন্ধির" এই কবিটি প্রাচীন যুগের 'ভগ্নদূত' এবং আধুনিক যুগের 'অগ্রদূত' হইয়া একটি বিচিত্র কৌতূহল রূপে বাংলা-সাহিত্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসারিগণের মধ্যে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই (১৮৩৭—১৯০৫) সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার "সদ্ভাবশতক' বাংলার কাব্য-সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল মণি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—১৮৯৫) কাব্যগ্রন্থ 'ললিত' ও 'মানস' এবং দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯—১৮৭৩) কাব্যগ্রন্থ 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'সুরধুনী কাব্য' প্রভৃতির নাম করা যায়। এতদ্ব্যতীত, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বহুসংখ্যক কবি-শিষ্যের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮২৬—১৮৮৭) অন্যতম।

পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবই এই যুগের বাংলা কাব্য-সাধনার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পরিচয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া যেন এক নূতন ভাব-রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছিল এবং পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতির এক অচিন্ত্য ও অদ্ভুত ভাব-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে, অচিরেই বাঙালীর চিন্তা-রাজ্যে, মনোজগতে ও কল্পলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-ভাবের সমন্বয় ঘটিয়া গেল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য প্রকাশিত হইবার পর, বাঙালী স্বচক্ষে এই ভাব-সমন্বয়ের প্রথম প্রমাণ কাব্য-জগতে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। এই 'তিলোত্তমা' শুধু পৌরাণিক তিলোত্তমা নহেন, ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সরস্বতীর তিল তিল সৌন্দর্য নিংড়ানো সুষমা-সমন্বয়ের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহাতে এমন অসম্ভবও 'সম্ভব' হইয়াছে।

যাঁহাদের দীর্ঘ সাধনায় বাংলা-কাব্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন তাঁহাদেরই অগ্রদূত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যেখানে যে-সৌন্দর্যটুকু তিনি পাইলেন, তাহা তিল-তিল সংগ্রহ করিয়া "মেঘনাদ-বধ", "বীরাঙ্গনা", "ব্রজাঙ্গনা" এবং "চতুর্দশপদী কবিতা

বলী" নামক কাব্যগ্রন্থে অপূর্বভাবে, অদ্ভুতরূপে সাজাইয়া দিলেন। মাত্র চারিটি বৎসরের মধ্যে এইরূপ অসাধ্য সাধন মধুসূদনেরই প্রতিভা বলিয়াই সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার পরে পরেই ছুটিয়া আসিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬--১৯০৯)। প্রতিভায় ইঁহারা মধুসূদনের সমকক্ষ না হইলেও, তাঁহার যুগান্তকারী প্রতিভার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। মধুসূদনের সূত্র ধরিয়া ইঁহারা বাংলার কাব্য-জগতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে আরও একটু আগাইয়া দিলেন।

গীতি-কবিতা-রচনা বাংলা-কাব্যের একটি চিরন্তন ধারা। এই ধারাটি আধুনিক যুগের বাংলা-সাহিত্যের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৪—১৮৯৪) হাতে পড়িয়া এক নূতন রূপ গ্রহণ করিল। সংস্কৃত, ইংরেজী ও মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের প্রতি সমান দরদ লইয়াই তাঁহার কাব্য-সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া, বোধ হয়, তাঁহার কাব্য এতটা সুন্দর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁহার (বিহারীলালের) মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মি-মণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।" লালিত্য ও স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে তিনি নূতন সুর ও ভাব ধ্বনিত করিলেন। তাঁহার গীতিপ্রবণতায় ইংরেজী সাহিত্যের Romantic অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ-সৃষ্টির প্রভাব থাকায় ইহা তাঁহাকে নূতনতার রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া দিয়াছে। তাঁহার "বঙ্গসুন্দরী", "সারদামঙ্গল" ও "সাধের আসন" প্রভৃতি কাব্য তাঁহাকে চিরদিনই আধুনিক ভাবসম্পৎশালী গীতি-কবিতার গুরুর মর্যাদা দান করিবে। তাঁহার অনুকারীর সংখ্যা কম ছিল না ; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাবশিষ্য। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮২৮—১৮৭৮) মুখ্যত Classical অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রবণ আদর্শের কবি হইলেও, বিহারীলালের প্রভাব তাঁহার "মহিলা" (১৮৮০), "বর্ষবর্তন" (১৮৭২) প্রভৃতি কাব্যে সুস্পষ্ট। সঙ্গীত, চিত্রকলা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অধিকার থাকিলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬) একজন কবি ছিলেন ; এবং তাঁহার "স্বপ্ন-প্রয়াণ" (১৮৭৫), "যৌতুক না কৌতুক" প্রভৃতি কাব্যে বিহারীলাল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাংলা-কাব্যে ইংরেজী Romance বা রমন্যাস-জাতীয় ভাবের আমদানী করিয়াছিলেন স্বনামখ্যাত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬—১৮৮৭)।

তাঁহার এই রমন্যাস-জাতীয় কাব্যের মূল-নীতি নারী-প্রেম ছিল না। স্বজাত্য-বোধ ও স্বদেশপ্রেমে পরাধীন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপে বিবেচিত হয়। এই জন্যই রাজস্থানী গল্প লইয়া তাঁহার "পদ্মিনী-উপাখ্যান" (১৮৫৮) এবং "সুরসুন্দরী" (১৮৬৮) কাব্য রচিত। তাঁহার "কাঞ্চী-কাবেরী" (১৮৭৭---৭৯) উড়িষ্যার ইতিহাসের একটি ঘটনা লইয়া ইংরেজী ভাষার কিংবদন্তীমূলক রমন্যাসের আদর্শে লিখিত হয়। রঙ্গলালের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা এই সময়ে কাব্য-সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বনোয়ারীলাল রায় (১৮২৫---১৮৯০) ও ললিতমোহন ঘোষের (১৮৭৪) নামই উল্লেখযোগ্য। বনোয়ারীলালের 'জয়াবতী' (১৮৬৫) কাব্যে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যানের" প্রভাব সুস্পষ্ট। ললিতমোহন ঘোষের "অচলবাসিনী" (১৮৭৫) কাব্যও রঙ্গলালের ব্যর্থ অনুকরণ।

ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের অনুবাদও এই যুগে মন্দ হয় নাই। নূতন পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব ইংরেজদিগের মধ্যস্থতায় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করায় ইংরেজী-সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় এই সময়ে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিখ্যাত কবি রঙ্গলালই (১৮২৬---১৮৮৭) এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইলেন। গ্রীক মহাকবি Homer-এর নামে আরোপিত Batrakhomuomakia নামক একখানি ব্যঙ্গ-কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের অনুসরণ করিয়া তিনি "ভেক-মূষিকের যুদ্ধ''' (১৮৫৬) নামে একখানি ব্যঙ্গ-কাব্য প্রকাশ করেন। "সুখদ উদ্যানভ্রষ্ট কাব্য" (১৮৫৪) রঙ্গলালের রচনা বলিয়া মনে হয়। ইহা Milton-এর Paradise Lost কাব্যেরই অনুবাদ। হরিমোহন গুপ্ত নামক আর এক কবি ১৮৫৮ সালে Parnel এর Hermit নামক ইংরেজী কাব্যের এবং যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় "পরিত্যক্ত গ্রাম" (১৮৬২) নামে Goldsmith-এর Deserted village কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন। অতঃপর কবি হেমচন্দ্র (১৮৩৮—১৯০৩) Shakespeare- এর Tempest নামক নাটকখানি "নলিনী-বসন্ত" নামে নাট্য-কাব্যে অনুবাদ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪০–১৯১১) Shakespeare-এর Macbeth নাটক "ম্যাকবেথ" নামেই অনুবাদ করিলেন।

ব্যঙ্গ-কাব্য-রচনা এই যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নূতন যুগের পত্তন হইতে থাকিলে পুরাতনের সহিত নূতনের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া

নিতান্তই স্বাভাবিক। কেননা, উদীয়মান নূতনকে অস্তায়মান প্রাচীন কখনও ভাল চক্ষে দেখে না,—দেখিতে পারেও না। এইরূপ আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা ও রীতি-নীতির বিরোধের ফলে নবীন প্রাচীনকে এবং প্রাচীন নবীনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে থাকে। আদর্শের গরমিল অর্থাৎ অন্তর্ধর্মের বিরোধ বলিয়াই কবিতায় ব্যঙ্গ-ভাব সহজে ফুটিয়া উঠে। যাঁহারা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১) বিশেষ বিখ্যাত। "ভারত-উদ্ধার' (১৮৭৭) বাংলা-সাহিত্যের একটি খ্যাতনামা ব্যঙ্গ-কাব্য। ইহাতে সেই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের কৃত্রিমতার ব্যঙ্গচিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা Parody অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মক অনুকৃতি রচনা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে "ছুছুন্দরীবধ কাব্য" (১৮৬৮) প্রণেতা জগদ্বন্ধু ভদ্রের (১৮৪২—১৯০৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাই বাংলা-সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গ-কবিতা। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিবাদরূপে ইহা লিখিত হয়। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষকে (১৮৪৪—১৯১২) অবলম্বন করিয়া "শ্রীমান দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানদী" ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে "নটেন্দ্রলীলা-কাব্য" লিখিলেন। বিদ্যানদীর "পৌষ-পার্বণ" ও (১৮৮৩) একখানি উপাদেয় ব্যঙ্গ-কাব্য।

এই সময়ের বহু কবি বিশেষ কাব্য-প্রতিভার অধিকারী না হইয়াও কবিতা ও কাব্য-সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৩৩—১৯০৩) ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৯—১৯০০) কবি-খ্যাতি এখনও আছে। আনন্দচন্দ্রের "মিত্রকাব্য" (১৮৭৪), "হেলেনা কাব্য" (১৮৭৬), "ভারতমঙ্গল-কাব্য" (১৮৯৪), "পদ্যসার" (১৮৮৬) ও "কবিতা সার" (১৮৮৯) এবং যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলি স্কুল-পাঠ্য কবিতা চলনসই।

মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা এই যুগে কাব্য-সাধনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৫৮—১৯৩৩) এবং ঢাকা জেলার আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামের কবি কায়কোবাদ (১৮৫৯—১৯৫২) বিশেষ প্রসিদ্ধ। উভয়েই খ্যাতনামা কবি এবং উভয়েরই কাব্য সাধনায় বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইঁহারা কাব্যের ভিতর দিয়া এক দিকে মুসলিম কীর্তি-কাহিনীর প্রচার ও প্রসার এবং অন্যদিকে রস-সৃষ্টির দ্বারা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কবি মোজাম্মেল হকের "কুসুমাঞ্জলি", "অপূর্ব-দর্শন" (১৮৮৫), "জাতীয় ফোয়ারা", "হজরত মোহাম্মদ কাব্য" প্রভৃতি এবং কবি কায়কোবাদের "অশ্রুমালা" (১৮৯৫), "মহাশ্মশান" (১৯০৪), "শিব-মন্দির" প্রভৃতি কাব্য চিরদিন বাংলা কাব্য-জগতে সমাদর লাভ করিবে। এই সময়ে মুন্সী আব্দুল আলা নামক আর এক মুসলমান কবি "কবিতা-কুসুম-মালা" (১৮৮৩) নামে একখানি সুন্দর কাব্য প্রকাশ করেন।

মীর মোশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১২) প্রধানত ঔপন্যাসিক ও নাট্য-কাররূপে খ্যাতি লাভ করিলেও, কাব্য-কাননে তাঁহার প্রবেশাধিকার যে ছিল না, তাহা নহে। তিনি বহু কবিতা এবং গান রচনা করিয়া এক সময়ে কবিখ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

রাবীন্দ্রিক যুগের দিগ্‌দর্শন

(১৮৮০–১৯২৩)

যুগ-সত্র :---

(ক) রবীন্দ্রনাথ ও তৎপ্রভাবিত কাব্য-ধারা---
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)
কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)
রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০)
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮১—১৯২২)
শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২---১৯৪৬)
শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩---১৯৫৩)
গোলাম মোস্তফা (১৮৯৪—১৯৬৪)

(খ) ম্রিয়মাণ মহাকাব্য ধারা---
যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭---১৯২৭)
কায়কোবাদ (১৮৫৯—১৯৫২)
হামিদ আলী (১৮৭৪—১৯৪৮)
ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০---১৯৩২)

(গ) কাব্য-সাধনার স্বাধীন প্রচেষ্টা---
দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫—১৯২০)
বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১---১৯৪২)
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)
মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২)

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে যে-যুগের সূত্রপাত হয়, তাহার নাম "রাবীন্দ্রিক যুগ"। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) কাব্য-সাধনা {প্রথম কাব্য---'বনফুল' (১৮৮০)} লইয়াই এই যুগের আরম্ভ বা সূত্রপাত হয় এবং নজরুল ইসলামকে (জন্ম—১৮৯৯) 'বসন্ত' (১৯২৩) নাটক উৎসর্গ করিয়াই স্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টারূপে তাঁহার যুগের অবসান ঘোষণা করেন। তাঁহারই কাব্য-সাধনার ঐশ্বর্যে এই যুগ একান্তই সমৃদ্ধ বলিয়া ইহাকে

“রাবীন্দ্রিক যুগ” ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। বলা বাহুল্য বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বেলায় যেমন রবীন্দ্রনাথ একা একটি যুগ, ঠিক তেমনই কাব্য-সাহিত্যের বেলায়ও তিনি একা একটি যুগ।

রবীন্দ্রনাথ যত বড় গদ্য লেখকই হউন, তিনি মনে-প্রাণে কথায়-কাজে, চিন্তায় ও ধ্যানে—সর্ববিষয়ে একজন কবি। ‘কবি’ই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। “প্রভাত-সঙ্গীত” (১৮৮৩) প্রকাশের পর হইতে বাংলাদেশ তাঁহার এই গৌরবময় পরিচয় লাভ করে। সুতরাং ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে বাংলার কাব্য-জগতে “রাবীন্দ্রিক যুগের” আরম্ভ বলিয়া ধরিতে হয়। তবে, কবির ‘বনফুল’ (১৮৮০) ইহারও তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়।

গ্রীক কবি হোমার, জার্মান কবি গ্যাটে, ইরানী কবি ফের্‌দৌসী তুসী, ভারতীয় কবি কালিদাস যেরূপ কালজয়ী লোকোত্তর কবি, বাংলার রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমনই কালজয়ী অমর কবি। তিনি তাঁহার চিন্তাধারায় শুধু তাঁহার যুগকেই প্রভাবিত করেন নাই, দেশ-বিদেশেও তাঁহার প্রভাব মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার চিন্তাধারা ভাবীকালেও যে জগৎকে প্রভাবিত করিবে, তাহার নিদর্শন এখন হইতে পাওয়া যাইতেছে। দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যে এমন কোন বিভাগ নাই, যাহা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভায় বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে নাই। এই জন্যই বাংলায় অল্পকাল পূর্বেও এমন কোন কবি ছিলেন না, যিনি তাঁহার অপরূপ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েন নাই।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁহার সহিত তাঁহার অনুকারীদের কোন তুলনা হয় না। ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহার সংস্কার-মুক্তি ও চিন্তার বিস্তৃতি। বিগত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-জগতে যত প্রকারের সাহিত্যিক রীতি ও ভাবধারা প্রবর্তনের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় সব কিছুই আত্মস্থ করিয়া ফেলিয়া বাংলায় আমদানী করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতীয় চিন্তাশীলতা ও দর্শনের প্রাণ-রসটুকুও নিংড়াইয়া লইয়া তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার কাব্যে উপনিষদ হইতে তস্‌ববুফ্‌ পর্যন্ত প্রাচ্য সাধনার এবং মুনি-ঋষি হইতে বাউল-ফকির পর্যন্ত প্রাচ্য মর্মবাদী (mystic) সাধকদের চিন্তাধারার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নহে। আবার, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-জগতে Romantic ideal বা কল্পনাপ্রবণ আদর্শের

যত প্রকার রীতি চালু হইয়াছে কিংবা চালু হইয়া মরিয়া গিয়াছে অথবা পাশ্চাত্ত্যের Symbolic ideal বা প্রতীকপ্রবণ আদর্শের যেই রূপ স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কোনটিই রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর ও কালোত্তর সৃষ্টির মধ্যে ধরা না দিয়া পারে নাই। তাঁহার 'সোনার তরী', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের প্রতীকপ্রবণ আদর্শেরই প্রমূর্ত রূপ এবং 'গীতাঞ্জলি', 'নৈবেদ্য', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি, 'বলাকা', 'পলাতকা', 'পূরবী', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কাব্যের বহু কবিতা মর্মবাদ ও কল্পনাপ্রবণ আদর্শের নিদর্শন।

এই যুগের কাব্য-সাহিত্যের ভাষা-সৌষ্ঠব, ছন্দ-বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তু-বাহুল্য এবং ভাবপ্রবণতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কয়টি ব্যাপারেও বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা নানাভাবে বাংলাকাব্যসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার, অসংখ্য শিক্ষাপ্রদ কাহিনী এবং অলঙ্কার, রস ও কাব্য-শাস্ত্র হাতের কাছে উপস্থিত না থাকিলে, শুধু পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবে বাংলা-কাব্যের ভাষা-সৌষ্ঠব এত শীঘ্র বৃদ্ধি পাইত না। তবে আমাদের কোবিদকুল পাশ্চাত্ত্যের Classic ideal বা উৎকর্ষ-প্রবণ আদর্শের অনুসরণ না করিলে সংস্কৃত-সাহিত্যের দিকে যে দৃষ্টি দিতেন না, এই একথাও একান্তই সত্য। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে যাহা করিয়াছে, আমাদের দেশে সংস্কৃত-ভাষাও তাহাই সাধন করিয়াছে।

এই যুগের কাব্য-সাহিত্যের ছন্দ-বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তু-বাহুল্য ও ভাব-প্রবণতা পাশ্চাত্ত্য-দেশের Romantic ideal বা কল্পনাপ্রবণ আদর্শের অনুসরণেরই গৌণ ফল। বাংলার ছন্দোজগতে পাশ্চাত্ত্য-আদর্শে শুধু যে "অমিত্রাক্ষর" (Blank verse), "চতুর্দশপদী" (Sonnet) এবং "স্বরাঘাতযুক্ত" কবিতা (Accentual verse) দেখা দিয়াছিল তাহা নহে, প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত 'পয়ার', 'ত্রিপদী', 'তোটক', 'যমক' প্রভৃতি ছন্দের এবং বহুবিধ দেশী ও বিদেশী ছন্দের অনুকরণ, অনুসরণ, মিশ্রণ ও ভাঙ্গনে অহরহ নূতন নূতন ছন্দের উদ্ভব হইল। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা ছন্দোজগতের এই বিপ্লব কবিগণের ভাব-প্রবণতা ও কল্পনার সম্প্রসারণকে স্থান করিয়া দিবার জন্যই

ঘটিয়াছে। এই ছন্দোবিপ্লবের ফলে, বাংলা কবিতায় Stanza বা স্তবকেরও আমদানী হইল। ইহাও পাশ্চাত্ত্য কবিতার নিদর্শন। এই যুগের বাংলাছন্দে যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮১-১৯২২)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এমন কোন উল্লেখযোগ্য ছন্দ নাই, যাহাকে তিনি তাঁহার কাব্যে রূপ দেন নাই। এইজন্য তাঁহাকে "ছন্দের যাদুকর" বলা হইত।

আলোচ্য রাবীন্দ্রিক-যুগে কাব্য-সাহিত্যে গীতি-কবিতার প্রতি একটা অসাধারণ প্রবণতা বাড়িয়া যায়। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীই ইহার অগ্রদূত এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার শ্রেষ্ঠ সাধক। এই গীতি-কবিতাকে তাঁহার অমর প্রতিভা বলে কবি রবীন্দ্রনাথ এমন এক স্তরে উন্নীত করিলেন যে, তাঁহার পর হইতে বাংলার কবিকুল অন্য শ্রেণীর কবিতা রচনার কথা একরূপ ভুলিয়াই গেলেন। ভারতীয় প্রাচীন ঋষির দৃষ্টি-ভঙ্গীকে বৈষ্ণব কবিদের প্রেমাশ্রুতে বিধৌত করিয়া ভারতীয় Mysticism বা মর্মবাদের বাণী প্রকাশ করায়, তাঁহার অধিকাংশ গীতি-কবিতা যে অপূর্ব তত্ত্ব ও রসের সন্ধান জাতিকে দান করিয়াছে, তাহা বর্তমানে পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক-জগৎকেও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াছে। এই গীতি-কবিতা এই যুগের এক অমূল্য অবদান ও সঞ্চয়।

গীতি কবিতাগুলি স্বভাবতঃই সুরধর্মী অর্থাৎ গানপ্রবণ। এতৎসত্ত্বেও, এইগুলিকে ঠিক গান বলা যায় না। কেন না, রাগ-রাগিণীর মধ্য দিয়া গীত হইবার যে একটা বৈশিষ্ট্য ও কৌলিন্য আছে, তাহা গীতি-কবিতায় নাই। হয়ত কৌলিন্যযুক্ত গানেই গীতি-কবিতার চরম সার্থকতা নিহিত নহে। তথাপি গীতি-কবিতার ভাবপ্রবণতার সহিত, বিশেষ করিয়া, গীতি-কবিতার আবেগময়ী ভাষার সহিত কৌলীন্যযুক্ত রাগ-রাগিণীর সমন্বয় ঘটিলেই, গীতি-কবিতার চরম সার্থকতা সাধিত হইল বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বাংলা-সাহিত্যের এই যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে, রজনীকান্ত (১৮৬৫-১৯১০) ও অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) এইরূপ গানে বাঙালীকে মাতাইয়া দিয়াছেন।

বাংলা কাব্য-জগতের আধুনিক যুগ প্রধানতঃ মহাকাব্য-স্থষ্টির যুগ হইলেও, আলোচ্য 'রাবীন্দ্রিক-যুগ' গীতি-কবিতারই যুগ। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য স্থষ্টির

যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও 'মহাকাব্য' রচনা করিতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এইভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন :

"আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।"

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করিতে পারিলেন না; কারণ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি, সুখ-দুঃখ রূপ-রস তাঁহার কাব্য-প্রতিভাকে গীতি-প্রবণ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাই জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিকে সমগ্র জীবনের চেয়ে অধিক মাত্রায় সুন্দর করিয়া দেখিয়াছেন। জীবনের ক্ষুদ্র অংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া, ইহাদের সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র জীবনকে সুষম ও সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিবার প্রচেষ্টা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বীরত্ব-কাহিনীতে অবলম্বিত হইলেই কাব্য-জগতে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই জাতীয় কাব্য-সাধনা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

এতৎসত্ত্বেও, পূর্বযুগের মধু-হেম-নবীনের মহাকাব্য সাধনার আদর্শ এই যুগের অনেকের অনুকরণের উপকরণ যোগাইয়াছিল। ফলে, ইঁহাদের অনুকরণে বাংলায় বহু মহাকাব্য রচিত হইল, কিন্তু বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের স্বাভাবিক কোমলতা ও গীতিপ্রবণতা প্রভাবে ইহাদের অনেকগুলি একালে লোপ পাইয়াছে। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথীরাজ' ও 'শিবাজী' এখনও বাঁচিয়া আছে। ইঁহারা উভয়েই মহাকাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও, প্রাঞ্জলতায়, গীতি-প্রবণতায় ও চরিত্র সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে কায়কোবাদের রচনা যোগীন বাবুর রচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

এই যুগের অসংখ্য কবির মধ্যে কেবল কয়েকজন কবিই রবীন্দ্রনাথের মোহিনী মায়ায় বিশেষভাবে প্রভাবিত নহেন ; তাঁহারা হইতেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৯৬০-১৯১৯), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এবং কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) । ইঁহাদের কাব্য-ভঙ্গী কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র বটে, এই দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহাদের কোন বিশেষ যোগ থাকুক বা না থাকুক, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার গীতি-কবিতারই সাধনা করিয়াছেন। ইঁহারা এই দিক হইতে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) অধিক মাত্রায় রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক । ইঁহার প্রতিভার সহিত রবীন্দ্রপ্রতিভার খুব বেশী যোগাযোগ নাই। স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল জাতির শিয়রে দাঁড়াইয়া একদিকে যেমন জাতিকে তাঁহার দীপক রাগিণীতে জাগাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে 'হাসির গানে' জাতির মুখে হাসিও ফুটাইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে বা পরে, আজ পর্যন্ত একমাত্র 'কান্তকবি' রজনী কান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ব্যতীত আর কেহই ব্যাপকভাবে হাস্য-রসাত্মক কবিতা লিখিয়া বাংলা-সাহিত্য পরিপুষ্ট করেন নাই। এই দিকে তাঁহার দান একক না হইলেও ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট।

শুধু দিজেন্দ্রলালের নহে, এই যুগের আরও বহু কবির বীণার তারে স্বদেশমন্ত্র উদ্দীপ্ত সুরে উদ্‌গীত হইয়াছে। দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের ফলে, আমাদের হৃদয়ের অর্গলবদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায়, প্রবহমাণ পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তা-বোধও আমাদের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে। ইহা অচিরেই স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রীতিতে রূপায়িত হইয়া উঠিল। রঙ্গলাল (১৮২৬-১৮৮৭), হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীন সেন (১৮৪৬-১৯০৯) এই বিশেষ রূপটির প্রধান শিল্পী। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'ভারত-সঙ্গীত, ও 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙালীর প্রাণে যে স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়া উঠিল, তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ পরবর্তী কবির দ্বারা জোরালো ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই যুগে আমরা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছি, তাহাতে আমাদের কি কোন নিজস্ব দান নাই ? সাহিত্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য-দেশের ভাব-শিষ্য, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে, কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা পাশ্চা

ত্ত্যের অন্ধ ভক্ত নহি। আমাদের কাব্যে আমাদের সাধনার, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের, আমাদের বৈশিষ্ট্যের, বিশেষ করিয়া আমাদের প্রাণের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। আমরা এই পরিচয় দিতে পারিয়াছি বলিয়াই, বিশ্বের দরবারে আমাদের সাহিত্য আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

সমগ্র বাংলার কাব্য-সাহিত্যে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় যুগ। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাব, কল্পনা, প্রকাশভঙ্গী, রচনা-শৈলী এবং বিষয়-বস্তুর সংমিশ্রণে এই যুগ পূর্ব-পূর্ব যুগ হইতে শুধু পৃথক্ নহে, ইহা একান্তই একক ও অতুলনীয়। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাংলা-সাহিত্যের আসন ও প্রতিষ্ঠা লাভই এই যুগের কাব্য-সাধনার চরম ও পরম ফল। অতঃপর, বাংলা-সাহিত্য অন্য এক পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে পরবর্তী পর্বে বলা হইবে।

যুদ্ধোত্তর যুগের দিগদর্শন
(১৯১৮—১৯৭০)

(ক) যুগচেতনা : বিদ্রোহ
কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম—১৮৯৯)
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল—জন্ম,—১৮৯৯)
মাহবুবুল আলম (জন্ম---১৮৯৮)

(খ) অনুসরণ ও অনুকরণ-প্রবণতা
সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭)
বেনজীর আহমদ (জন্ম—১৯০৩)
ফররোখ আহমদ (১৯১৮—১৯৭৪)
তালিম হোসেন (জন্ম—১৯১৮)

(গ) পাশ্চাত্ত্য বৈদগ্ধ্যপ্রবণতা
বিষ্ণু দে (জন্ম—১৯০৯)
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১ — ১৯৭০)
জীবনানন্দ দাস (১৯০৬—১৯৬৯)
হুমায়ুন কবীর (১৯০৬—১৯৬৯)

(ঘ) গ্রাম-বাংলার রূপায়ণ
জসীম উদ্দীন (জন্ম—১৯০২)
বন্দে আলী মিঞা (জন্ম—১৯০৭)
আল-মাহমুদ (জন্ম—১৯৩৬)

(ঙ) সমাজ সচেতনতা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ
আবুল মনসুর আহমদ (জন্ম—১৮৯৮)

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫—১৯৭৪)
আবুল ফজল (জন্ম—১৯০৪)
শওকত ওসমান (জন্ম—১৯১৬)
আলাউদ্দীন আল-আজাদ (জন্ম—১৯৩২)
সরদার জয়েন উদ্দীন (জন্ম—১৯২৬)

(চ) কাব্যে গদ্যময়তা
প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম—১৯০৪)
শামসুর রহমান (জন্ম—১৯২৩)
সিকান্দার আবু জাফর (জন্ম—১৯১৮)
হাসান হাফিজুর রহমান (জন্ম—১৯২৫)

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর হইতেই এক শ্রেণীর রচনার উদ্ভব ঘটে। বাংলা-সাহিত্যও এই মহাযুদ্ধের বিপ্লবাত্মক প্রতি ক্রিয়ার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইল। যেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাংলা পদ্য-সাহিত্যের আলোচ্য যুগকে “যুদ্ধোত্তর যুগ” বলা হইতেছে, তাহা ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আমাদের সাহিত্যে প্রকট হইয়া পড়ে, এবং যাঁহার লেখায় এই লক্ষণগুলির কয়েকটি সর্ব প্রথম সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তিনি আধুনিক বঙ্গের খ্যাতনামা কবি কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯)। এই জন্যই কাজী নজরুল ইস্‌লাম হইতে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে “যুদ্ধোত্তর যুগ” আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইল।

কবি নজরুল “বিদ্রোহী কবি” নামে বিখ্যাত। এই একটি মাত্র ছোট্ট কথায় এই যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। আধুনিক যুগের গীতি-কবিতার মৃদু-মধুর গুঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই এই কবি যখন অভূতপূর্ব জোরালো ভাব ও ভাষায় “বিদ্রোহী” কবিতাটি প্রকাশ করিলেন, তখন মহাযুদ্ধের দূরাগত কামানগর্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ শুনিয়া ভাব-বিহ্বল বঙ্গ সচকিত চিত্তে দেখিতে পাইল, সত্যই বাংলার সাহিত্যাকাশে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “বসন্ত” নামক নূতন নাটকখানি নজরুলের নামে উৎসর্গ করিয়া এই বিদ্রোহী কবিকে বাংলা-কাব্যের আসরে অভিনন্দিত করিলেন।

ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতির অন্তর্গত অন্ধ সংস্কার ও আচার-বিচারের বিরুদ্ধে এই যে "বিদ্রোহ" ঘোষিত হইল, ইহাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই বিদ্রোহ অতি দারুণ বিদ্রোহ। নজরুলের অসাধারণ অনমনীয় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার নিকটও মাথা অবনত করিল না। ভাষায়. ভাবে, ছন্দোবন্ধনে বা ছন্দোবন্ধন-মুক্তিতে—সর্ববিষয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া একটি নূতন কাব্য-যুগের ভিত্তি পত্তন করিয়া দিলেন। বনফুল নামে পরিচিত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম—১৮৯৯)। কবিতাগুলি যুদ্ধোত্তর যুগের ইঙ্গিত দিতেছে বটে, কিন্তু সেই ইঙ্গিত ইঙ্গিত মাত্র—সুস্পষ্ট নির্দেশ নহে। তথাপি তিনি বাংলার যুদ্ধোত্তর-যুগীয় কবিদের অগ্রদূতগণের অন্যতম।

নজরুলের এই বিদ্রোহ নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতির এবং জাতির সূত্রে মানবতার বন্ধন-মুক্তির বেদনায় পরিপূর্ণ। ইহাও এই যুগের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নজরুল তাঁহার "সাম্যবাদী"-তে রুশীয় আদর্শের অবতারণা করিয়া কুলি-মজুরও নির্যাতিতদের যেই জয়গান জাতিকে শুনাইয়া দিলেন, তাহাতে আধুনিকতম 'কমুনিষ্ট-সাহিত্যে'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এখন বাংলার কাব্য ও কথা-সাহিত্যে এই শ্রেণীর সাহিত্যই জোর চলিতেছে। এই ব্যাপারে কবি সুকান্ত (১৯২৬—১৯৪৭) নজরুলের সার্থক অনুসারী।

সমাজে তাহার স্থান যাহাই হউক না কেন, মানুষকে মানুষ হিসাবে মানুষেরই মর্যাদা দিতে হইবে—আধুনিকতম বাংলা-সাহিত্যের এই বাণী রুশীয় আদর্শ অনুকরণের ফল বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে ইসলামের 'ভ্রাতৃত্বে'-র কোন প্রভাব নাই—এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। আজকাল যেন আমাদের কবিরা বলিতে চাহেন, মানুষ সকল ভয় সকল সংস্কার, সকল মিথ্যা ও সকল দৌর্বল্যের হাত হইতে মুক্ত হউক। ইহাও নজরুলের "বিদ্রোহী-"র মধ্যে উদ্গীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও বহু কবিতায় এই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

কাব্য-সাহিত্যে রুশীয় আদর্শ অনুসরণের ফল সম্প্রতি আরও একরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য-জগতে রাজনীতি ও সমাজনীতির আম-

দানিতেই ইহা ধরা পড়িয়াছে। নারীদের জন্য পাশ্চাত্ত্য-ধরনের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক অধিকার আমাদের দেশের কোন প্রাচীন আদর্শ-বাদী স্বীকার করেন নাই। আমাদের নারীরাও এইরূপ কোন অধিকারের কথা এতদিন চিন্তা করিতেন না। কিন্তু আমাদের যুদ্ধোত্তর যুগের লেখক ও কবিদের অনেককেই নারীগণের পাশ্চাত্ত্য-ধরনের অধিকার দানের দাবী ও কথা সাহিত্যে ফলাও করিয়া প্রচার করিতেছেন। বোধ হইতেছে, কাজী নজরুলই প্রথমে তাঁহার "নারী" শীর্ষক কবিতায় এই কথা জোরের সহিত ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য এখানকার এই জাতীয় কবিতায় আমাদের বর্তমান সামাজিক বিবর্তনের একটি রূপ নগ্নভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

আমাদের কবিগণের মানবিক দৃষ্টিকোণ এইরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের মানব-প্রীতি অন্য এক প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। মানুষের সরল-সহজ জীবন-যাত্রা, তাহাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, চির-উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত পল্লীজীবনও এখন আর কবিদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতেছে না। গ্রামের চাষা, রাস্তার কুলি, খনির শ্রমিক, চা-বাগানের মজুর-রমণী দরিদ্র রিকশাওয়ালা প্রভৃতি কবিতা-পটে সমবেদনা ও দরদের তুলিতে চিত্রিত হইতেছে। গ্রাম্য-জীবন ও পল্লী প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে কবি জসীম উদ্দীন যেমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তেমন অদ্যাবধি আর কেহ পারেন নাই।

এই যুগের "বিদ্রোহ" বৈশিষ্ট্যের শেষ পরিণতি গদ্য-কবিতা রচনায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অবশ্য এই বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা স্পর্শে গদ্যও পদ্যের চেয়ে রসঘন ঐশ্বর্যঘন ও আনন্দঘন হইয়া উঠিয়াছে সত্য, তাহার অনুকারীরা এই বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা কালই বিচার করিবে। যুদ্ধোত্তর-যুগের বিষ্ণু দে (জন্ম—১৯০১) বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৯) এবং অন্যান্য বহু কবি গদ্য-কবিতা রচনায় বিশেষ উদ্যোগী ও খ্যাতিমান। গদ্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ ও ভাষার সহিত কবিতার আবেগপ্রবণতার যুগল-মিলন ঘটানোই এই গদ্য কবিতার প্রধান লক্ষ্য, এবং কাব্য-রচনার চিরপরিচিত ও বহুব্যবহৃত পদ্ধতির হাত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাই এই জাতীয় গদ্য কবিতা-উদ্ভবের আর একটি প্রধান কারণ।

তাজমহল, যমুনা, চন্দ্র, কোকিল, কুঞ্জ ইত্যাদির ন্যায় কবিতার অভিজাত বিষয়-বস্তুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে, এক কথায়, কবিতার কৌলীন্য-নাশ করিতে হইবে ; সুতরাং কবিত্ববিহীন বিষয়-বস্তুকে কবিতায় চালাইতে হইবে। তাই "নারানগঞ্জের ইষ্টিশানে," "ইলিশ," "গরু" ইত্যাদি জাতীয় বিষয়-বস্তু কবিতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতেছে। কোন কিছুতে রং না ফলানোই যেন আধুনিকতম কবিদের আর একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এই যুগের বাংলা-ভাষা ও বাংলা-কাব্য ব্রাহ্মণ্য-লক্ষণাক্রান্ত নহে। ভাষায় ইংরেজী ভাব ও ইংরেজী শব্দ ইচ্ছামত বিকৃত বা অবিকৃত আকারে ইংরেজী ঢঙ্গে, ইংরেজী বর্ণন-ভঙ্গীতে প্রবেশ করিতেছে, নূতন করিয়া আরবী ও ফার্সী শব্দের এবং ভাবের আমদানী করা হইতেছে। নানা ধর্মের, বিভিন্ন সমাজের, বিবিধ সাহিত্যের রীতি, ভাব, কথা ইত্যাদিও সাহিত্যে নির্দ্বিধায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে।

আবার, এক জাতীয় ইসলামী কবিতার সৃষ্টি এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম। মুসলমান কবিদের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের দৃষ্টি জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় দোষ ত্রুটির প্রতি নিবদ্ধ হওয়ায় এই শ্রেণীর কবিতার সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। মুসলমানদের ধর্ম, পর্ব, সমাজ ও সংস্কৃতিগত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিষয়াদিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রায়ই কবিতা রচিত হইতেছে। এই কবিতাগুলি মুস্লিম অনুভূতিপ্রধান এবং আরবী-ফারসী ও উর্দু শব্দে পরিপূর্ণ। এই ব্যাপারেও নজরুল পথপ্রদর্শক। তাঁহার "ফাতিয়া-দোয়াজদহম" ; "খেয়াপারের যাত্রী", "মহরম", "নতুন চাঁদ" প্রভৃতি এই শ্রেণীরই কবিতা। এখন ইহাদের অনুকারীর সংখ্যাও অনেক। ইহার কারণ যতটা সাহিত্যিক নয়, ততোধিক রাষ্ট্রিক।

এই দিক হইতে ফার্সী গজলের বাংলায় আমদানী অর্থাৎ বাংলা-গজলগানগুলি নজরুলের জীবনের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহারই প্রতিভার কল্যাণে বাঙালী আজ 'ছায়া-ঢাকা-পাখি-ডাকা' বাংলার বুকে বসিয়া পারস্যের গোলাপ-বুলবুলের অনুরাগ, সাকী-শরাবের মধুর মাদকতা এবং শরাব খানার আনন্দময় উল্লাস অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আধুনিক যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট কাব্যের রচনাও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। নজরুলই সর্বপ্রথমে, "কামাল পাশা", "আনোয়ার পাশা" প্রভৃতি কবিতায় এবং "উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" প্রভৃতি গানে রণ-সজ্জার চিত্র অঙ্কিত করিয়া এবং রণ-সঙ্গীতের তূর্য-নিনাদ শুনাইয়া বাঙালীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর বর্তমান মহাযুদ্ধের বহু চিত্র ও ঘটনা সাহিত্যে রূপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

এই যুগের গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হইল না। তজ্জন্য পৃথক্ আলোচনা আবশ্যক। বারান্তরে তাহা করিবার বাসনা রহিল। তবে, এক কথায় এইটুকু বলিলে, বোধ হয়, যথেষ্ট হয় যে, কাব্য-সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্টগুলি গদ্য-সাহিত্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। সমাজ-সচেতনতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এই সময়ের গদ্য-সাহিত্য কাব্য-সাহিত্যের তুলনায় সমৃদ্ধ।

বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব

(আদি ও মধ্যযুগ)

বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলিম প্রভাবের কথা বলিতে গেলে, খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বৎসরের কথাই প্রধানতঃ চিন্তা করিতে হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন যেই ধারা অবলম্বন করিয়া আজিকার বিশ্ববিমোহন রূপ লাভ করিয়াছে, সর্বাগ্রে তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। বলিতে কি, বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের এই ধারা যেমন বিচিত্র, ইহাতে মুসলিম প্রভাবও তেমন সুস্পষ্ট।

খ্রীস্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে 'গৌড়ীয় প্রাকৃত' নামে অভিহিত 'মাগধী প্রাকৃতের' পূর্বাঞ্চলিকরূপ হইতে বাংলা-ভাষা ধীরে ধীরে আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। বাংলা-ভাষার এই 'সৃজ্যমান যুগের' সহিত মুসলমানদের কোন সংস্রব ছিল না।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে বঙ্গে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। এই সময় হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। তখনও বাংলা-ভাষা প্রকৃত পক্ষে সূতিকাগৃহেই অবস্থান করিতেছে। এই সময় কিভাবে বাংলা-ভাষায় সর্বপ্রথম মুসলিম প্রভাব সূচিত হয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষী।

পালদের সময় বৌদ্ধযুগে বঙ্গে বাংলা-ভাষার সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত প্রাকৃত অপভ্রংশে 'চর্যাপদ' রচিত হইয়াছিল। সেনদের সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হওয়ায়, 'চর্যার' বাংলা লক্ষণাক্রান্ত ভাষা যেমন ছিল, তেমনই

থাকিয়া গেল,—আর বেশী দূর আগাইল না। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফলে, সৃজ্যমান বাংলা-ভাষার কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল, লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি কেন্দুবিল্বের বাঙালী কবি জয়দেবই তাহার প্রধান প্রমাণ। মনে ও প্রাণে, ভাবে ও ছন্দে বার আনী বাঙালীয়ানা রক্ষা করিয়া তাঁহাকেও সংস্কৃতে "রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে" প্রভৃতি পদ রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল।

সেন রাজত্বের অবসানে তুর্কী আমল প্রতিষ্ঠার সহিত বাংলায় ব্রাহ্মণদের জারিজুরি শেষ হইয়া যায়। যেই ভাবে এই দেশ হইতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের অবসান হয়, সেই ভাবেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সূচনা হয়। বাংলাদেশে তুর্কী আমলেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া একটি "ইসলামী পরিবেশ" সৃষ্টির পথ খোলসা হয়। কয়েক প্রকারেই এই পরিবেশ-সৃষ্টি সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কথা না বলিলেও চলে। তুর্কী আমল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা স্বাভাবিকভাবে খসিয়া পড়িল। ফলে, এই সংস্কৃতির মূল উৎস সংস্কৃত-চর্চা ক্রমেই শুকাইয়া আসিতেছিল; আর তৎস্থলে দেশে আরবী-ফারসী ভাষাভাষী মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। তুর্কী আমলের পূর্ব হইতে দেশে নানা আউলিয়া-দরবেশের আগমন হইতে থাকিলেও, এই আমলেই তাহাদের ব্যাপক আবির্ভাব ঘটে এবং ইহার সহিত বহু মৌলানা-মৌলবীর ধর্ম প্রচারও মিশিয়া যায়। বহিরাগত মুসলমানেরাও কেহ রাজপুরুষ, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ ভাগ্যান্বেষী, কেহ মুহাজির, আবার কেহ তাহাদের সহচররূপে, দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেশে একটি বলিষ্ঠ "ইসলামী পরিবেশ" সক্রিয় এবং ক্ষীয়মাণ 'ব্রাহ্মণ্য পরিবেশ' নিষ্ক্রীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে ক্রম-বিলীয়মান ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও ক্রম-বর্ধমান মুসলিম প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, বাংলা-ভাষা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। ফলে অচিরেই সেন রাজত্বের কোণঠাসা বাংলা-ভাষা তুর্কী আমলে আসিয়া সূতিকাগৃহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল। মুসলিম ধাত্রীরাই ইহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলেন; ধাত্রীর মাতৃসুলভ যত্নে শিশু দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাংলা-ভাষার এই শৈশবকালে রচিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণের'

অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়ে যেই কৌতুকাবহ চিত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ: উড়িষ্যা বা জাজপুরের ষোলশত বৈদিক ব্রাহ্মণ কানে পৈতা তুলিয়া দক্ষিণা মাগিতে বাহির হয়, এবং যাহারা দক্ষিণা দেয় না, তাহাদিগকে তাহারা অভিশাপ দিয়া জ্বালাইয়া দেয়। তাহাদের কারসাজিতে মালদহে কর বসে এবং তাহাদের জাল জুয়াচুরির শেষ নাই। দল বাঁধিয়া শক্তিশালী হইয়া তাহারা বৌদ্ধ সদ্ধর্মীদের সর্বনাশ করে। ইহা দেখিয়া সদ্ধর্মীদিগকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা ধর্ম-ঠাকুরকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান করিল। ধর্মদেবতা বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মায়ারূপধারণ করিলেন এবং অবশেষে---

"হইলা যবনরূপী, মাথায়ত কালটুপী,
হাতে শোভে, ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ, ত্রিভুবনে লাগে ভএ,
খোদাএ বলিয়া এক নাম।।

নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলএ দম্বদার।
যথেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেত পরিলা ইজার।।

ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর,
আদমফ হৈল্যা শূল পানি।
গণেশ হৈল্যা গাজি, কার্তিক হৈল্যা কাজি,
ফকির হইল্যা জথমুনি।।

তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইল্যা শেক,
পুরন্দর হইল্যা মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে, পদাতি হইআ সেবে,
সভে মিলি বাজাএ বাজনা।।

আপনি চণ্ডীকাদেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ, সভে হইয়া একমন,
প্রবেশ করিলা জাজপুর।।

দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধমের পাত্র, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল"॥

ইহাতে যে 'ইসলামী পরিবেশ' ও মুসলিম প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মুসলিম তুর্কীর ধর্ম, সমরনীতি ও অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া একটু আধটু আচার ব্যবহারের আভাসও পাওয়া যায়। সদ্ধর্মী ও নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্যক্ত হইত ও বিব্রত বোধ করিত। ফলে, তাহারা বঙ্গে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-শাসনের আশু নিপাত কামনা করিয়াছে; মুসলমানেরাও দেশের ভাষায় দেশীয় লোকের সহিত পরিচিত হইতে ও ভাব বিনিময় করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সংস্কৃত শিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

এমন এক ইসলামী পরিবেশ পুষ্ট মুসলিম প্রভাব বাংলা ভাষাকে সূতিকা-গৃহ ত্যাগ করিতে সাহায্য করিয়া শৈশবে লালন-পালন করিয়াছে। বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে, বাংলা-ভাষা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের চাপে যে আঁতুর ঘরেই মরিয়া যাইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গে তুর্কী-শাসন প্রতিষ্ঠার পর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যেই নূতন যুগের সূচনা হয়, তাহাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের নবীন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এই নবীন বাংলা-সাহিত্য-সম্ভাবনার সর্বশেষ ফলরূপে কেবল একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমাদের-হস্তগত হইয়াছে। ইহা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। তখন বাংলাদেশ ঔলিয়া দরবেশে, মৌলানা-মৌলবীতে ও মুসলিম আগমনে একরূপ ভরিয়া উঠিয়াছে এবং এদেশে একটি বলিষ্ঠ ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির কাজ অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে। এই 'ইসলামী পরিবেশে' যেই 'কৃষ্ণকীর্তন' রচিত হইল, তাহাতে কোন মুসলিম প্রভাব নাই, এমন ধারণা ঠিক নহে। ইহাতে 'মজুর', 'মজরিয়া', 'কামান' (ধনুক অর্থে) প্রভৃতি গোটা আটেক ফারসী শব্দের ব্যবহারই যে একমাত্র মুসলিম প্রভাবের ফল, এমন মনে করাও সমীচীন

নহে। কেন-না ভাষার শব্দ-সম্পৎ-বৃদ্ধি যেমন মুসলিম প্রভাবে স্বাভাবিক, ভাষার বা জাতির ভাব-সম্পৎ-বৃদ্ধিও তেমনি স্বাভাবিক। এই দিক হইতে কৃষ্ণকীর্তনের বিচার করিতে হইলে, নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ‘কৃষ্ণকীর্তনের’ চণ্ডীদাস ও ‘পদাবলীর’ চণ্ডীদাসকে এক কবি বলিয়া প্রমাণ করিলেও, শুধু অনুমান-নির্ভর কূটতর্কের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া আজ চণ্ডীদাস একাধিক বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, একাধিকবার একাধিক বেশে চণ্ডীদাস আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, তিনি একাধিক হইয়াও একাধিক নহেন—মাত্র একটি। তাই, গান শুনিবার জন্য কান পাতিয়া দিলে কালপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া আজও বাউলধর্মী মন-উদাসী সুর বাজিয়া উঠে :

“শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।”

এই মধুময় চিরন্তন সত্যের ঝঙ্কার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেই উতলা মন বলিয়া উঠে—কে এই কালজয়ী কবি, যিনি আজও বাংলা-ভাষীর কানে এমন বিশ্বজনীন বাণীর সুধাধারা ঢালিতেছেন? ইনি যদি সেই চণ্ডীদাস হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী (জন্ম ১১৭৫ খ্রীঃ) তাঁহার—

طریقت بجز خدمت خلق نیست‘
بتسبیح و سجاده و دلق نیست

মানুষের সেবা বিনা তরীকৎ নয়।—
আলখাল্লা, তসবি আর জা’-নমাজে নয়॥

এই বিশ্ববিখ্যাত মানবকল্যাণময়ী বাণী লইয়া বাংলার চণ্ডীদাসে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা আর যাহাই হউক, এমনটি হইত না।

এই যে আমাদের চির পরিচিত চণ্ডীদাস, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ লইয়াই তিনি যেন অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্বার্জিত সংস্কার বলে শ্রীকৃষ্ণ

কীর্তনকে তলাইয়া দেখিবার অভাব ঘটার ফলেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াইতেছে। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। পদাবলীর উপজীব্যও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই লীলা-বর্ণনা 'কৃষ্ণকীর্তনে' কাহিনী-ভিত্তিক হইলেও পদাবলীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদসর্বস্ব। এই কাব্যে উল্লেখযোগ্য পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা মাত্র তিনটি ; তাঁহারা হইতেছেন রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। প্রেমাস্পদের ভূমিকায় কৃষ্ণ, প্রেমিকার ভূমিকায় রাধা এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম ঘটাইয়া দেওয়ার সহায়করূপে বড়াই পরিকল্পিত। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা হিন্দুদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার নহে ; এমনকি ইহা তাঁহাদের কোন পৌরাণিক কাহিনীও নহে। ইহা এই বাংলদেশেরই প্রাচীন সম্পৎ। এই দিক হইতে এই কাহিনীটি মনসা, ধর্ম, শীতলা, চণ্ডী প্রভৃতি বঙ্গের প্রাচীন কাহিনীর সগোত্রীয়। অথচ 'কৃষ্ণকীর্তনে' বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার কাহিনী এমন একটা কাহিনী নহে, যাহা 'মনসা-মঙ্গল,' 'ধর্ম-মঙ্গল', 'শীতলা-মঙ্গল', কি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাহিনীর সহিত আঙ্গিক, চরিত্র-সৃষ্টি, বর্ণনা-পদ্ধতি, প্রাণ-ধর্ম প্রভৃতি কোন দিক হইতে কোন প্রকারে তুলিত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ইহা হৃদয়ধর্মী গীতিকাব্য; প্রেমই ইহার প্রধান উপজীব্য। এই দিক হইতে জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দের' সহিত ইহার স্বাজাত্য আছে বটে, কিন্তু সগোত্রতা নাই। 'গীতগোবিন্দ' কাহিনীপ্রধান গীতি-কবিতা এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার খণ্ডিত সূত্রাবলম্বী গীতিপ্রধান কাব্য। অধিকন্তু, বড়াই-চরিত্র পরিকল্পনায় চণ্ডীদাস কবি জয়দেব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া, বিশেষতঃ শেখ সাদীর বাণী চণ্ডীদাসে প্রাতধ্বনিত হইতে শুনিয়া, চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, সূফীদের গজলের মতই 'কৃষ্ণ-কীর্তন' খণ্ড খণ্ড পদের সমষ্টি, এবং তাঁহাদের 'ইশ্‌কতত্ত্বই যেন প্রেমরূপে ইহার মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইহার কৃষ্ণ যেমন সূফীদের 'আশিক'-রূপে দেখা দিয়াছে, 'রাধিকা'ও তেমন 'মাশুক'-রূপে আবির্ভূতা হইয়াছে, আবার 'বড়াই'ও তেমন সূফীতত্ত্বের 'রাবিতা' বা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার যোগসূত্র 'পীর-ই-মগাঁ' বা সিদ্ধিলব্ধ গুরুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সূফীদের ইশ্‌ক-তত্ত্বে অবস্থা ভেদে 'আশিক'-'মাশুক' যেমন আপন ভূমিকা বদল করিতে দেখা যায়, অর্থাৎ 'আশিক' 'মাশুক'

হইতে এবং 'মাশুক' 'আশিক' হইতে দেখা যায়, 'কৃষ্ণকীর্তনেও' রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ভূমিকা বদল হইতে দেখা যায় : কৃষ্ণ প্রথমে রাধিকাকে পাইতে চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় বহুকাল কাটাইয়াও পরে তাহাকে প্রেম দেন নাই ; রাধিকাও কৃষ্ণ প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে তাহা ঐকান্তিকভাবে চাহিয়াও পান নাই। প্রকৃতপক্ষে, 'কৃষ্ণকীর্তনেও কৃষ্ণ একবার রাধিকার প্রেমিক ও রাধিকা একবার কৃষ্ণের প্রেমিকা। এই ভূমিকা বদলের মধ্যেই 'কৃষ্ণকীর্তনের' শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ 'বংশী'ও 'বিরহ' খণ্ড পরিকল্পিত বলিয়া সূফীদের 'দিল-আজারী'ও 'জুদায়ী'-পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট ছবি মানস মুকুরে ভাসিয়া উঠে। তাই বংশীখণ্ডে চণ্ডীদাসের কণ্ঠে যখন শুনিতে পাই :—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা"।।

তখন আপনা হইতেই সূফী কবি মৌলানা জালালু-দ দীন রূমীর (১২০৭---১২৭৩) সুবিখ্যাত 'বাঁশরী বদন' কবিতার কথা মনে পড়ে এবং চণ্ডীদাসের ভাব, সুর ও ঢঙে কণ্ঠ ছাড়িয়া ফারসী-ভাষায় গাহিতে ইচ্ছা করে—

بشنو از نئے چون حکایت می کند
وز جدائیها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد وزن نالیده اند

শুনলো সজনি। একি সে কাহিনী শুনায় বাঁশের বাঁশী,
ফরিয়াদে তার ফাটিয়া পড়িছে বিরহ-বেদনা-রাশি।
কাঁদিয়া বেড়াই ঝাড় হ'তে মোয় যেদিন আনিল কাড়ি,
আমার বিধুর সুর-মূরছনে মুরঝায় নরনারী।

ফারসী কবির ভাব, ভাষা ও সুর-প্রবাহ 'ছায়া-ঢাকা-পাখি ডাকা' বাংলার শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রে যেই প্লাবন তুলিয়াছিল, ইহা তাঁহার ক্ষীণ

আভাস মাত্র। ইহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আরও গভীর হইতে গভীরতর সাধনায় নিমগ্ন হইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেহ কেহ আদি রসাত্মক কাব্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এই অজুহাতে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র চণ্ডীদাস ও 'পদাবলীর' চণ্ডীদাস এক নহে বলিয়াও অনুমান করা হয়। আমাদের বিবেচনায়; যেখানে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের' শেষ, সেখানেই পদাবলীর আরম্ভ। তাই, 'পদাবলী' এই কাব্যের শেষ পরিণতি। 'কৃষ্ণকীর্তন' যদি আদি রসাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়, তবে হাফিজের "আগর আঁ তুর্কে শিরাজী" জাতীয় সূফী-কবিতা বা গজলগুলি লইয়া কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়া রাখিতে হইবে। শিরাজের প্রিয়ার গালের এক তিলের জন্য সূফী কবির সমরকন্দ ও বোখারা বিলাইয়া দিবার উদগ্র বাসনার চিত্র বুকে লইয়াও যদি ফারসী 'গজলিয়াৎ' আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গৃহীত হইতে পারে, তবে চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'---

"কতনা রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।।
নিদয়া হৃদয় কাহ্নু ন গেলা বোলাইআঁ।" ।।

শ্রেণীর 'পদাবলী' লইয়া আধ্যাত্মিকতাহীন হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কতিপয় নীতিবাগীশের উন্নাসিকতার ফলে এই কাব্যকে এমন বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে মনে হয়, সূফী কবিদের 'য়ুসুফ-জলিখা', 'লাইলী-মজনু', 'শিঁরী-ফরহাদ' ও 'পদ্মাবতীর' ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-ও একটি রূপক কাব্য। রূপক ব্যবহারের দিক হইতে 'কৃষ্ণকীর্তন' সূফীদের এই কাব্যগুলির অনুরূপ হইলেও, আঙ্গিকের দিক হইতে এক নহে। এই সূফী কাব্যগুলি কাহিনী-আশ্রিত বর্ণনাত্মক রূপক এবং 'কৃষ্ণকীর্তন' ক্ষীণ ঘটনা-সূত্র অবলম্বনে রচিত গীতিপ্রধান খণ্ড কবিতার সমষ্টি।

বাংলার রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার প্রাচীন লৌকিক কাহিনী কি করিয়া এমন একটি রূপ ধারণ করিল, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমার বক্ষ্যমাণ আলোচনায় যদি কোন সত্য নিহিত থাকে, তবে বলিতে হইবে বঙ্গে প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্থায়ী ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে চণ্ডীদাসের হাতে বাংলার প্রাচীন রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার

লৌকিক কাহিনী এমনভাবে মুসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এই কাহিনীর লৌকিক ধারা পরবর্তীযুগে ‘কৃষ্ণ-মঙ্গল’ কাব্যে প্রাণধর্ম-বিরল বর্ণনাত্মক পদ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং মুসলিম সূফীতত্ত্বপ্রভাবিত প্রাণধর্মী ‘গজলিয়াৎ’-জাতীয় গীতিধারা বৈষ্ণবদের ‘পদাবলী সাহিত্যে’ স্ফূর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটু পরেই এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে বলা হইবে।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর মুসলীম শাসনাধীন বঙ্গে স্বাধীনতার যুগ। সাংস্কৃতিক দিক হইতে বাংলা দেশে ইহা এক বিশেষ যুগ। এই যুগের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের অনন্যসাধারণ বিকাশ অন্যতম। এই সময়ে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য যে মুসলিম বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের আন্তরিক উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, এখন সেই কথা আর কাহারও অবিদিত নাই। এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন। গৌড়ীয় সুলতানদের বাংলা - সাহিত্য - প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতাকে এই সাহিত্যে মুসলিম প্রভাবের গৌণ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই যুগ হইতেই বাংলার মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে বাংলা-ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) শাহ মোহম্মদ সগীর রচিত ‘ইউসুফ-জুলেখা’ কাব্য ; এই সুলতানের সহপাঠী পাণ্ডুয়ার ভারত বিখ্যাত সাধক নূরুদ্-দীন কুৎব্-ই-আলমের (মৃত্যু-১৪১৬) ‘রেখতা’ জাতীয় বাংলা গজল ; শামসুদ্দীন ইউসুফশাহের (১৪৭৪-১৪৮১) অনুগ্রহপ্রাপ্ত কবি জৈনুদ্দীনের ‘রসুল বিজয়’; সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) কর্মচারী চাঁদ কাজীর বাংলা পদ সুলতান নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩১) রাজত্বকালে আবির্ভূত শেখ কবীরের পদাবলী প্রভৃতিই এই যুগের মুসলিম সৃষ্ট বাংলা-সাহিত্য। মুসলমানদের এই নবীন সৃষ্টিতে মুসলিম প্রভাবের কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। স্বাধীনতার যুগে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইরান-তুরানের মধ্যস্থতায় ইসলামের সহিত বাংলার যেই মিলন ঘটিয়াছিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই ইহা মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে অধিক দেখা যায়।

বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যই এই যুগের সর্বাপেক্ষা অভিনব ও শক্তিশালী

সৃষ্টি। ইহা জীবনী ও পদাবলী এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে (১৪৮৫-১৫৩৩) বাংলা দেশে যে ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত’ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহারই অভিব্যক্তি। বাংলাদেশে এই সাহিত্যের প্রভাবই অতি ব্যাপক ও গভীর। ইহার ফলে দেশে “রাধা ছাড়া সাধা” এবং “কানু ছাড়া গীত” রহিল না। ‘পদাবলী সাহিত্য’ এক আধ্যাত্মিক ভাব-মহিমায় ঐশ্বর্যশালী হইয়া মানুষের প্রেমময় হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের সত্য ও কাল্পনিক জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া চরিত কাব্য লিখিত হইতে লাগিল। বাংলার ভাটিয়ালী ও মুর্শিদার পাশে বাউল, কীর্তন মনোহর-সাঁই, রেনেটি সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

আমরা অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ মুসলিম প্রভাবে ভরপুর। এই মতবাদসঞ্জাত বাংলা-সাহিত্যে কোন মুসলিম প্রভাব আছে কিনা, এখন সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রথমে বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী শাখার কথা ধরা যাইতে পারে। সূফীদের ‘গজলিয়াৎ’ এবং বৈষ্ণবদের ‘পদাবলী’ শুধু সমার্থক নহে, আধ্যাত্মিকতা, ভাবৈশ্বর্য ও আঙ্গিকের দিক হইতে অনেকখানি এক। সূফী সাহিত্যের ‘ইশ্ক’ যেমন ‘মৈয়্’ ও ‘শরাবের’ প্রতীক গ্রহণ করিয়া ‘শাকীর’ মারফতে সরাইখানার কক্ষে কক্ষে পরিবেশিত হইয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমও তেমন পিরীতির বেশে ‘মান’-অভিমানের রূপ ধরিয়া গোপিনীদের মধ্যস্থতায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সূফী সাহিত্যের ‘আশিক’ ও ‘মাশুক’, ‘বুৎ’ ও ‘বুৎগর’ অথবা ‘শমা’ ও ‘পরওয়ানা’ বৈষ্ণব-পদাবলীতে ‘রাধা’ ও কৃষ্ণের প্রতীক লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ‘রাধাকৃষ্ণ’ হিন্দুর পৌরাণিক দেবতা নহে; তাহারা ‘যুগল-প্রেমের’ প্রতীক। বলা বাহুল্য, ভক্ত বৈষ্ণবদের মতে এই ‘রাধা’ জীবাত্মার এবং এই ‘কৃষ্ণ’ পরমাত্মার প্রতীক; কৃষ্ণের ‘বাঁশরী’ জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার ডাক; এই দুইয়ের মিলনের অন্তরায় স্বরূপ ঐহিক-জীবনের ‘সংসার-ধর্ম’ মধ্যখানে ‘যমুনা-নদী’রূপে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের পরপার হইতে ‘কৃষ্ণ’রূপী পরমাত্মার বংশী-ধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া ‘রাধা’-রূপী জীবাত্মার জীবনের ঘাটে পৌঁছিয়াছে; আর মানবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য উতলা করিয়া তুলিয়াছে।

তাই মুস্‌লিম কবিও গাহিতে পারেন,—

"এপার হৈতে বাজাও বাঁশী ওপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী আমি সাঁতার নাহি জানি॥"

এই যে 'রাধা', এই যে 'কৃষ্ণ', এই যে 'যমুনা', এই যে 'বাঁশী',—ইহাদের সহিত পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ কোথায়? আরবের 'আল্লাহ্' পারস্যে 'খোদায়' পরিণত হইয়াও সূফী কবিদিগকে খুশী করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদের হাতে 'মাশুক', 'শমা', 'ইয়ার' অর্থাৎ প্রেমাস্পদে পরিণত হইয়া 'ইশক্' বা প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়াছেন। আর ভারতীয় হিন্দুর শাস্ত্রীয় 'অবতার'-রূপী 'কৃষ্ণ' বাংলার বৈষ্ণব কবির হাতে 'বঁধুয়া' বনিয়া প্রেমাস্পদ সাজিয়াছেন। সূফী কবিদের হাতে 'মানুষ' 'পরওয়ানা' বা 'আশিক' সাজিয়াছে, আর সে বৈষ্ণব-কবিদের হাতে 'রাধিকা' বা 'প্রেমিকা' বনিয়াছে। সূফী-কবিদের 'সূজ-ও-সাজ' বা প্রেমের আকুতি, 'হিজরান'-নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেমন পাঠকের নয়ন-কোণে 'আঁসু'-র আবির্ভাব ঘটাইয়াছে, বৈষ্ণব-কবিদের 'বিরহ-বেদনা' বা 'পিরীতি-আরতি', 'মাথুর'-আখ্যায় চিহ্নিত হইয়া তেমনিই সকল বাঙালীকে কাঁদাইয়াছে। সূফী-কবিদের 'বিলাস' বা মিলনের 'গজলিয়াৎ' যেমন ভাবের বন্যায় পারস্য ও তৎসূত্রে ভারতবর্ষকে ভাসাইয়া দিয়াছে, বৈষ্ণব-কবিদের 'ভাব সম্মিলনের' পদাবলীও তেমনই বাংলা-দেশ, ও তৎসূত্রে আসাম ও উড়িষ্যাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। অধিকন্তু, যমুনা বা কালিন্দী নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত কৃষ্ণের বাঁশরী-লীলা দেখাইবার জন্য বংশী-ধ্বনি অবলম্বনে বৈষ্ণব-কবির যেই বিরাট পদাবলী-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার মর্মার্থ ও প্রতীক, মৌলানা জালালু-দ্-দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩) সুবিখ্যাত 'বাঁশরী-বেদন' কবিতার মর্মার্থ ও প্রতীক অবিকল এক, দেশভেদে কেবল ভাষাভেদ ও রূপভেদ ঘটাইয়াছে,—এইটুকুই পার্থক্য।

অতঃপর, বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান-শাখার অন্যতম 'চরিতকাব্য'গুলির দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল, অদ্বৈত-প্রকাশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থ। এইগুলিকে বৈষ্ণবেরা 'মহাজন-চরিত' বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকেন। মুসলমান সুফীদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা যেমন পারস্যে 'তজকিরা-ই-আউলিয়া' এবং ভারতবর্ষে 'সুওয়ানহ্-ই-উম্রী' বা সাধক-জীবনের কাহিনী লিখিয়াছেন, বাংলার বৈষ্ণবরাও তেমনি চৈতন্য-প্রমুখ বৈষ্ণব-সাধকদের জীবন-কাহিনী লিখিয়া 'মহাজন-চরিত' নাম দিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতের সহিত যেমন প্রাচীন বিষ্ণুমতবাদী বৈষ্ণব-মতের মিলের চেয়ে গরমিল অধিক, প্রাচীন 'হর্ষ-চরিত', 'রঘু-বংশ' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের সহিতও তেমনই বৈষ্ণব-'মহাজন-চরিতের' মিলের চেয়ে গরমিলই অধিক। বৈষ্ণবদের এই 'মহাজন-চারত-গুলি 'তজকিরা-ই-আউলিয়া' বা 'সুওয়ানহ-ই-উমরী প্রভৃতি জীবন-আখ্যায়িকার ন্যায় সাধকজীবনের লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী-সম্বলিত গ্রন্থ মাত্র। এই জীবনগুলিতে ব্যবহৃত 'মহাজন' ও 'আউলিয়া' শব্দ একেবারে সামর্থবোধক এবং 'মহাজনেরা' যেই সমস্ত 'ঐশ্বর্য' প্রদর্শন করিয়াছেন বা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়াছেন, তাহাই 'আউলিয়া'-র বেলায় 'কিরামৎ' রূপে চিত্রিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'ঐশ্বর্য' এবং 'কিরামৎ' শব্দ দুইটি শুধু সমার্থবোধক নহে; একটি যেন আর একটির অনুবাদ। অধিকন্তু, ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, বঙ্গে পীর-মহাত্ম্যজ্ঞাপক পুস্তক রচনার রেওযাজ বৈষ্ণবদের বহু পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা লক্ষ্ণণ সেনের সভা-পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত 'শেকশুভদয়া'-গ্রন্থ ইহার প্রাচীনতম উদাহরণ।

স্বাধীনতার অবসানে বঙ্গে মুঘল-আমলের সূত্রপাত হয় এবং ইহা বাংলায় প্রায় দুই শতাব্দী (১৫৭৬-১৭৫৭) স্থায়ী হয়। এই মুঘল আমলের বাংলা-সাহিত্যে নূতন কিছু হয় নাই বলিলেও চলে। এই সময়ে বেশী করিয়া স্বাধীনতার যুগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ সাধিত হইয়াছে মাত্র। ফলে, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সাহিত্য-সাধনা বিশেষ নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে না পারিলেও বিশালকায় ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে দেশে ফার্সী-ভাষার চর্চা অধিকতর বাড়িয়া যাওয়ায়, বাংলা-সাহিত্যের সর্বাঙ্গে এই ভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেশে যেরূপ মোগলাই-মার্কা মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেশের সাহিত্যেও তেমন ইরানীমার্কা মুসলিম-প্রভাব স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল। শব্দ-সম্পদ-বৃদ্ধি ভাব-আমদানী, অনুবাদ ও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিসমন্বয়, এই চারি দিক হইতে বাংলা-সাহিত্য ফার্সী-সাহিত্যের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়। এই যুগের সর্বশেষ খ্যাতনামা কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে (১৭০৭-১৭৬১) সেই প্রভাবের অধিকাংশের নিদর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই সময়ের কোন হিন্দু-মুসলমান

কবি বাংলা-ভাষায় তাঁহার চেয়ে অধিক ফার্‌সীশব্দ ব্যবহার করেন নাই, অনুবাদ ছাড়া কাব্যে ফারসী-সাহিত্যের ভাব আমদানীতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিংবা 'সত্যপীর' রচনা ব্যতীত অন্য কোন রচনার মধ্যদিয়া হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বৃহত্তর নজীর স্থাপন করিতে পারেন নাই। তবে হিন্দু কবির কাব্যে ফার্‌সী সাহিত্যের ছায়া যে কত আপন ও গভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে মুসলিম প্রভাবের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও স্মর্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন।,—"এই সময় নায়ক-নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প ও ফার্‌সী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল, এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায় নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন; তাজী ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব (নায়ক) নায়িকার কথাই মনে পড়িয়াছে"। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩১৯)

মুঘল-আমলের পরেই ইংরেজ-আমল আসিল। এই আমলের বাংলা-সাহিত্যে মুস্‌লিম প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে।

{মাহেনও, ৮ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৬৩ (মার্চ ১৯৫৭) পৃঃ ৩৫—৪১}

লোক-সাহিত্য

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, 'লোক-সাহিত্য'কে আলোচনার সাহায্যে বুঝানো সম্ভবপর নহে। আমি যদি একজন পল্লীর প্রতিভাবান মানুষ হইতাম এবং একতারা, দোতারা, সারিন্দা, মন্দিরা, মুরলী, বাঁশী, শিঙ্গা, মাদল, ঢোল, ঢাক, কাড়া, খোল, করতাল, ঝাঁঝর, কাঁসর, খঞ্জনি, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া সদলবলে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তবে, 'লোক-সাহিত্যে'র যেই স্বাভাবিক পরিবেশ, তাহার কিছুটা তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইতাম। ইহার যেই অকৃত্রিম রস ও তাহার উৎসার, ইহার যেই সহজ-সরল পরিবেশ ও তাহার উপভোগ, এই সমুদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পল্লীর শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পৎ লোক-সাহিত্যের রসোপলব্ধি সহজ নহে। অন্য কথায়, ইহার রস গ্রহণ ও দান করিতে হইলে, স্বাভাবিকভাবে রসের সহিত রসনার যোগ সাধন করিতে হইবে। তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে একরূপ দুরূহ। এই জন্যই আশঙ্কা হইতেছে, আমাদের মত বেরসিক লোকের হাতে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত রসে-ভরা 'লোক-সাহিত্যে'র ভরাডুবি না হয়। তবে, একেবারে নিরাশ হইবারও কারণ নাই। লোক-সাহিত্যই বলে:

"নুনর না ডুবি যাইতে মুখত্ দি চা।" (চট্টগ্রাম)

আমিও বলি, নেহাত ভরাডুবি হইতে দেখিলে আপনারা একটু সাবধান হইবেন এবং আমার সহিত 'নুনের নায়ের নুন' মুখে দিয়া চাখিয়া লইবেন।

এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, আলোচনার সাহায্যে 'লোক-সাহিত্যে'র সত্যকার রসোপলব্ধি যতই দুরূহ হউক না কেন, ইহার সহিত শিষ্ট-সমাজের পরিচয় ঘটানো তেমন কোন কঠিন কাজ নহে। আমরা এই আলোচনায় প্রধানতঃ এই সহজ পথেই চলিবার চেষ্টা করিব।

এই কথা সত্য যে, লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। আমরা যে-সাহিত্য শিখি বা শিখাই অথবা আমরা যে-

সাহিত্য সৃষ্টি করি বা করাই, তাহার সমস্তই শিষ্ট 'সাহিত্য', ইহা নাগরিক-সৃষ্টি যদি নাও হয়, তবু ইহা নাগরিক-সাহিত্য। কেননা, ইহাতে নাগরালি থাকুক বা না থাকুক, নাগরিয়ানা বা নগুরে-ভাব যে বর্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাহিত্য ভদ্রলোকের,--দেশের বিশাল লোক-সমাজের নহে। ভদ্রলোকদের মতো এই 'শিষ্ট-সাহিত্য' যেমন নগণ্য, তাঁহাদের মতো তাঁহাদের সাহিত্যও তেমন পোশাকী। দেশজোড়া লোক-সমাজ যেই সাহিত্যের সঞ্জীবনী-সুধা পান করিয়া আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে, সেই-সাহিত্যের নাম 'লোক-সাহিত্য'। কি সৃষ্টিতে, কি প্রকাশে, কি অনুভূতিতে, কি পরিবেশে—কোন কিছুতেই ইহার সহিত 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র বিশেষ মিল নাই; ইহা সর্বপ্রকারে গ্রামীণ। ইহা কথায় যেমন গেঁয়ো, ভাবেও তেমন গেঁয়ো। এইজন্যই 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র ভব্যতা ও শালীনতা 'লোক-সাহিত্যে' আশা করা যায় না। লোক-সাহিত্যে শালীনতা ও ভব্যতা নাই বটে, কিন্তু স্বাভাবিকতা আছে, ঋজুতা আছে, সজীবতা আছে, সর্বোপরি আছে সহৃদয়তা। তাই, 'লোক-সাহিত্য' দেশের লোক-সমাজের সহজ অভিজ্ঞতা ও সরল অনুভূতির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, আর 'শিষ্ট-সাহিত্য' নগুরে-ভাবাপন্ন লোকের জটিল মনীষার বিচিত্র বিকাশ।

এই প্রসঙ্গে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র লোক-গাথার অন্তর্গত 'মহুয়া পালা'র কিয়দংশ এবং তৎসূত্রে কবি নজরুল ইসলামের একটি গান স্মরণ করা যাইতে পারে। 'মহুয়া-পালা'র মহুয়ার সহিত নদ্যার ঠাকুরের সাক্ষাৎকার ঘটার এবং প্রেম নিবেদনের ঘটনাটি স্মরণ করুন।

সন্ধ্যা সমাগত। কাকলি-মুখর পাখি কুলায় ফিরিতেছে। ক্রমেই গ্রামের পথ প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। এমন নির্জন-নদীর বিজন-ঘাটে নামিয়া উদ্‌ভিন্ন-যৌবনা মহুয়া আনমনে কলসী ভরিতেছে। অলক্ষিতে নদী-তীরে দাঁড়াইয়া পুষ্পশর-জর্জর নদ্যার ঠাকুর একাকী এই দৃশ্য দর্শনে আত্মহারা। হঠাৎ আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া সে বলিয়া ফেলিল:

"জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥
কেবা তোমার মাতা কন্যা কেবা তোমার পিতা॥"
ইত্যাদি

ইহাতে মহুয়া চমকিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই এবং সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য-নিস্তব্ধতাকে মুখর করিয়া উত্তর দিয়াছিল :

"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সোদর ভাই।
সোতের সেওলা হইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥"

মহুয়ার এমন একটি করুণ উত্তর বংশীর ধ্বনির ন্যায় নদ্যার ঠাকুরের হৃদয় মথিত করিতেই, সে নিশ্চয় নিঃসঙ্কোচে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল :

"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
তোমার মতন কন্যা পাইলে আমি করি বিয়া॥"

এমন একটা বেয়াড়া প্রস্তাব শুনিয়া মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে কলসীর কানা মারিয়াছিল কিনা, জানি না। তবে তাহার যৌবন-দীপ্ত গণ্ডদ্বয় যে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠুক বা না উঠুক, তাহার উত্তর হইতে আমরা বেশ আঁচ করিতে পারিতেছি।

মহুয়া উত্তর দিল :

"লজ্জা নাইরে নিলাজ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মর॥"

এই উপদেশ শুনিয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিবার আগেই তো নদ্যার ঠাকুর মহুয়ার প্রেম-দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিতে গিয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। সুতরাং, সে নির্ভয়ে উত্তর দিল :

"কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি॥"

আমাদের মতো সামাজিক-জীব যদি অশরীরী-অবস্থায়ও নদীর ঘাটে মহুয়া ও নদ্যার ঠাকুরের প্রশ্নোত্তর শুনিবার জন্য এই সময়ে উপস্থিত থাকিত, তবে নিশ্চয়ই এই কথা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিত। ব্যাপারটি আমাদের কাছে এমনই বিসদৃশ ঠেকিত। আমরা ভাবিতাম না যে, বিবাহের প্রস্তাব আগেও হইত, এখনও হয়। ইহাতে নতূনত্ব কি? হ্যাঁ, এখনকার প্রস্তাবে নূতনত্ব আছে। এখন এখনকার মতো সামাজিক ভব্যতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব করা হয়---ইহাই নূতন। এই নূতনত্ব রক্ষা করে নাই

বলিয়াই নদ্যার ঠাকুরের প্রস্তাব আমাদের কাছে অসামাজিক। আমরা তাহার এই প্রস্তাবকে অসামাজিক বলিয়া রায় দিলেও, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নদ্যার ঠাকুরের প্রেম-নিবেদনে সারল্য আছে, প্রাণের পরশ আছে, সংবেদনশীলতার প্রাবল্য আছে; আর মহুয়ার বাহ্যিক শ্লেষাবৃত উত্তরে যুবতী-হৃদয়ের শ্লীলতা, কোমলতা ও প্রাণের অতলস্পর্শী আকুতি আছে। এই জন্যই বলিতে হয়, ইহাদের প্রশ্নোত্তরে শুধু দুইটি মিলনোন্মুখ হৃদয়ের আত্মনিবেদন নাই, একটি গভীর অনুভূতির উলঙ্গ প্রকাশও রহিয়াছে। 'শিষ্ট-সাহিত্যে' প্রেমের এমন উলঙ্গ-প্রকাশ নাই বটে, তবে ভব্য-প্রকাশ আছে। নদ্যার ঠাকুরের প্রাণের আকুতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; আজিকার ভব্য-সাহিত্যের বিনানো কথার পরতে পরতে এই একই আকুতি কিভাবে অশরীরী অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কবি নজরুল ইসলামের গান হইতেই তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি:

"কেন কাঁদে পরাণ---
কি বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি॥
কাজল করি যারে রাখিনু আঁখিপাতে।
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু সাথে।
বুকে তায় মালা করি
রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি।
কেমনে সে উদাসীর মন মোহি॥"

ইহা হইতে দেখা যাইবে, লোক-সাহিত্যে পল্লী-কবির 'তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি' যে উৎস হইতে উদ্ভূত, 'শিষ্ট-সাহিত্যে' কবির 'কেন কাঁদে পরাণ, কি বেদনায় কারে কহি' ঠিক সেই উৎস হইতে উৎসারিত। পল্লী-কবির প্রাণ-প্রবাহ নির্ঝরিণীর স্রোতোধারার ন্যায় আপন মনে প্রবাহিত, আর শিষ্ট-সাহিত্যে কবির প্রাণ-প্রবাহ ফোয়ারার মুখ দিয়া শতধারে উৎক্ষিপ্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, নজরুলের মুন্সীয়ানা পল্লী-কবিতে নাই। এই মুন্সীয়ানার নামই শিল্প। এই খানেই শিষ্ট-সাহিত্যের সহিত

'লোক-সাহিত্যে'র প্রধান ব্যবধান। লোক-সাহিত্যে প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, অভিজ্ঞতা আছে, অনুভূতি আছে, এমন কি বৈচিত্র্যও আছে, কিন্তু শিল্প নাই। লক্ষণীয় বিষয় এই, শিষ্ট-সাহিত্যে লোক-সাহিত্যের সমস্ত কিছু থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে, কিংবা অল্প বিস্তর থাকিতে পারে, কিন্তু শিল্প বা মুন্সীয়ানা না থাকিলে শিষ্ট-সাহিত্য হয় না। প্রাণ বলুন, হৃদয় বলুন, অনুভূতি বলুন, অভিজ্ঞতা বলুন—সবই শিষ্ট-সাহিত্যে শিল্প মহিমায় মণ্ডিত হইয়া সচেতন মনের সজ্ঞান-সাধনার পরিচয় দেয়, আর লোক-সাহিত্যে তাহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতৎসত্ত্বেও লোক-সাহিত্য উচ্ছল প্রাণবন্ততায় সজীব ও বনফুলের ন্যায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মনোহারী।

এতদ্ব্যতীত, 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র সহিত পল্লী-সাহিত্যের ব্যবধান আরও কতিপয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র জন্ম বুদ্ধিজীবী ভদ্র-সমাজের মস্তিষ্কে, রূপায়ণ কলে-তৈয়ারী কাগজের পৃষ্ঠায়, লালন-পালন মুদ্রাযন্ত্রের নোংরা প্রকোষ্ঠে, আর 'লোক-সাহিত্যে'র জন্ম জন-সমাজের হৃদয়ে, রূপায়ণ লোকের মুখে মুখে এবং লালন-পালন দেশের মানুষের পবিত্র স্মৃতির পরতে পরতে। তাই 'লোক-সাহিত্যে'র ক্ষেত্র দেশ-জোড়া, 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তবে, 'লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয়'—'লোক-সাহিত্যে'র এই কথা শিষ্ট-সাহিত্যে'র জন্য যেমন খাঁটি, 'লোক-সাহিত্যে'র জন্যও তেমন সত্য। উভয় সাহিত্যের পরিবর্তন পরিবর্ধন, উদ্ভব, স্থায়িত্ব ও বিলয় আছে বটে, তবে লোক-সাহিত্যের বহু বিষয় ও ভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং ভাষা সতত পরিবর্তনশীল বলিয়া জীবন্ত ও নিত্য নূতন। আর 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র বিষয়, ভাব ও ভাষা শিল্পের লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আশু পরিবর্তন ঘটাইতে অসমর্থ বলিয়া, সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম এবং কিয়ৎকাল পরেই যাদু-ঘরের দর্শনীয়-সামগ্রীতে পরিণত হয়। এই অবস্থার হাত হইতে 'শিষ্ট-সাহিত্য'কে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।

একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের 'লোক-সাহিত্যে'র ক্ষেত্র আমাদের দেশের জন-সমাজের মতোই বিরাট ও বিশাল। আমাদের

দেশে কত রকমের লোক-সাহিত্য যে সৃষ্ট হইয়াছিল, হইয়াছে ও হইতেছে, আজ পর্যন্ত খুব অল্প লোকই তাহার সংবাদ রাখেন। তবে সুখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনে যে-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে অল্পদিন হইতে আমাদের সাংস্কৃতিক-জীবনের এই বিশাল দিকে কাহারও কাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর 'লোক-সাহিত্যে'র সকল দিক ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের নানা বৈচিত্র্যও আমাদের কাছে ধরা দিবে। আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত 'লোক-সাহিত্যে'র সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নের কয়েকটি ভাগে লোক-সাহিত্যকে ভাগ করা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্যও এই ভাগগুলির প্রয়োজন আছে।

(১) ছড়া

'লোক-সাহিত্যে'র কথা বলিতে গেলে, সর্বাগ্রে 'ছড়া'র কথাই উল্লেখ করিতে হয়। আমাদের ছড়াগুলি সমাজের প্রাচীন বালকসুলভ কল্পনাপ্রবণ অপরিণত মনের সৃষ্টি। কিন্তু, এইগুলি বালকের সৃষ্টি নহে। এই জন্য ছড়ায় ভাবের পরিণতি নাই, আছে শুধু বোবার ইঙ্গিত-ইসারার মতো নানা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ভাব, যেন কতকগুলি রেখাচিত্রের সমাবেশ। উদাহরণস্বরূপ এই ছড়াটির উল্লেখ করিতেছি:

রৈদ্ রে রৈদ্ আনি।
চাঁদার মা পুতানী॥
চাঁদারে কাডি।
হাত ঘর বাঁডি॥
সুইজ্জ উডের কন্নান্‌দি।
কদম গাছর তলদি॥
কদম গাছর নাই ফুল।
চিচিচরাইয়্যা রৈদ্ তোল॥ (চট্টগ্রাম)

শীতের দিন; ছেলে-মেয়েদের রোদ পোহাইতে হইবে, অথচ রোদ

উঠিতে দেরি আছে। সুতরাং ‘রৈদ্ রে রৈদ আনি’ বলিয়া সমবেত কণ্ঠে রোদকে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হয়। রোদকে ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ চাঁদের কথা মনে পড়ে। সে-ই যেন সূর্যকে রাতের আঁধারে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাই চাঁদকে ‘পুতানী’ বা ‘পুতখাওনী’ বলিয়া সমস্বরে গালি পাড়িতে দেখি। শুধু ‘পুতখাওনী’ বলিয়া চাঁদকে গালি পাড়িয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারা যাইতেছে না। চাঁদকে কাটিয়া সাত ঘরে বাঁটিয়া দিবার ভয়ও দেখান হইতেছে। এখন কি সূর্য না উঠিয়া আর লুকাইয়া থাকিতে পারে? না, পারে না। তবে সূর্য কোন্ স্থান দিয়া উদিত হইবে ইহাই ভাবিবার বিষয়। তাহার উদিত হইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে পত্র-পুষ্পহীন শীতকালীন কদম গাছের কথাই মনে পড়িল। কেননা, এই গাছের তলায় বসিয়াই শীতকালে রৌদ্র সেবনের উপযুক্ত স্থান। তাই, কালবিলম্ব না করিয়া চিক্ চিক্ করিয়া রৌদ্র তুলিবার জন্য সূর্য-মামার আহ্বান আবশ্যক হইয়াছে।

এই ছড়ায় কত ছবিই না ভিড় জমাইয়াছে,---শীতকাল, চন্দ্র, সূর্য, বণ্টন, পত্র-পুষ্পহীন কদম বৃক্ষ, কত কিছুই। এই সব দিক হইতে ভাবিলে মনে হয় ছড়াগুলি লোক-সাহিত্যের আদিম নিদর্শন। ভাব-পরিণতি ও চিত্রের দিক হইতে ছড়াগুলি যতই প্রাচীন হউক, ভাষার দিক হইতে এইগুলি চির পরিবর্তনশীল, এই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই নূতন। এই কারণে ছড়াগুলিকে শিশুর সহিত তুলনা করা যায়। শিশুর মত প্রাচীন ও শিশুর মত নবীন জগতে আর কিছুই নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ববর্তী আদিম মানব-শিশু জন্মের পর যেমন ছিল, আজিকার সুসভ্য মানুষের শিশুও তেমনই আছে,---তাহার সেই অসহায় অবস্থা, সেই অজ্ঞানতা, সেই উলঙ্গ মূর্তি, কিছুরই পরিবতন ঘটে নাই, অথচ কালক্রমে তাহার ভাষায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

ছড়াগুলি অবিকল তাহাই। সেই আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত শিশুগুলি যেমন জগতে এক সময়ে জন্মগ্রহণ করে নাই, ছড়াগুলিও তেমনই জগতে এক সময়ে রচিত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ সেই প্রাচীন ছড়াটির উল্লেখ করিতেছি:

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিনটি কন্যে দান।।
একটি কন্যে রাঁধেন বাড়েন একটি কন্যে খান।
আর একটি না রাগ ক'রে বাপের বাড়ি যান।।"
(পশ্চিম বঙ্গ)

এই যে ছড়া, ইহাতে বর্ষার বৃষ্টিধারা, শিবু ঠাকুরের বিবাহ, নদীতে বান ডাকার দৃশ্য, এক বিবাহে তিন কন্যার দান, তাহার একটি 'সুয়ো', আর একটির 'দুয়ো' বনিবার কথা এবং তৃতীয়টির অভিমানিনী মূর্তিতে শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ প্রভৃতি এতগুলি চিত্রের সমাবেশে কোন মহাকাব্য রচিত হইত কিনা বলা কঠিন হইলেও, একটি উপন্যাস, অন্ততঃ একটি চমৎকার গল্প যে লিখিত হইতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে আমাদের দেশের প্রাচীন রাজাদের সুয়ো-রানী ও দুয়ো-রানী রাখার প্রতি ইঙ্গিত যেমন মিলিতেছে, তেমনই বিবাহে একাধিক মেয়ের বা বোনের যৌতুক প্রাপ্তির মত আর একটি প্রাচীন রীতির সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়, খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর রাজা গোপীচন্দ্র অদুনাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভগ্নী পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। শিবু ঠাকুরও পিতার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে আরও দুই কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। এতএব, ছড়াটি যে অতি প্রাচীন, সে-কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। তবে ইহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। আর একটি ছড়ায় দেখা যায়ঃ

"আমি যাব গউড়
আনব সোনার মউর
বানাব চার কাচারি
যাব শ্বশুর বাড়ি।।"

গরীব জামাই নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়িতে আদর পায় নাই। তাই গৌড়ে গিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া চারিটি কাচারি-ঘর বাঁধিয়া বড় লোক হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ি যাইবার কথা ভাবিতেছে। এই ছড়াটি গৌড়ে মুসলমানদের রাজধানী স্থাপিত হইয়া নগরীটির ধনৈশ্বর্যের কথা

দেশে ছড়াইয়া পড়িবার আগে রচিত হয় নাই। কিংবা—

“ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥”

ছড়াটি বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বর্গীর আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার সময় রচিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছড়া যে রচিত হইয়াছিল, তাহা ছড়ার আলোচনা হইতেই বুঝিতে পা । যায়।

আরও দেখা যায়, ছড়ায় একটা ছন্দ আছে, কিন্তু রাগ-রাগিণী বা তাল-মানের বালাই নাই। প্রকৃতপক্ষে, ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দই যে বাংলার ‘শিষ্ট-সাহিত্যে’র মূল ছন্দ, এখন এই কথা আর না বলিলেও চলে। এই ছড়ার ছন্দে এক প্রকার মোহিনী-শক্তি আছে। দোলনায় শিশুকে শোয়াইয়া মা যখন ছড়া কাটিতে থাকে:

“ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমখুন উডিলে বাছা দুধ দিয়ম মুই॥
ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুম যাইলে গড়াই দিয়ম সোনার বাজু মুই॥
ঘুম যারে কৈতর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমখুন উডিলে বাছা দানা দিয়ম মুই॥” (চট্টগ্রাম)

তখন মা শিশুকে দুধ, বাজুবন্দ ও দানা দিবার যে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে, তাহার কিছুই হয় তো ছেলে বুঝে না, কিন্তু তাহাতে শিশু যে নির্বিঘ্নে দোলনায় ঘুমায় সে অভিজ্ঞতা জীবনে এখনও প্রত্যহ অর্জন করিতেছি।

এই যে আমাদের ছড়া, এইগুলির একটি চিরন্তন রসের দিক আছে। ছড়ার আলোচনায় তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সুবিখ্যাত ‘ছেলে-ভুলানো ছড়া’ নামক প্রবন্ধে ছড়ার এই আকর্ষণীয় দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যে আজ পর্যন্ত তাঁহার এই আলোচনা

একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে

তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়ই পরিবর্তনশীল, বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান; দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলা-বিচার-শাস্ত্রের বাহিরে, মেঘ বিজ্ঞান ও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়-জগতে এবং মানব-জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিত সাধনে স্বভাবতঃই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থ-বন্ধনশূন্যতা এবং চিত্র-বৈচিত্র্যবশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে, শিশু মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র ধরিয়া রচিত হয় নাই।"

(২) হেঁয়ালি

ছড়া যদি প্রাচীন সমাজের অপারণত মনের সৃষ্টি হয়, তবে 'হেঁয়ালি' সেই সমাজেরই পরিণত-মনের সৃষ্টি। বুদ্ধি-দীপ্তি, সৌন্দর্য-বোধ, রসিকতা, চিন্তার উৎকর্ষ-সাধন, মননশীলতার পারচয় দান, প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা প্রভৃতিই হেঁয়ালির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই দিক হইতে ভাবিলে স্বীকার করিতে হইবে, 'হেঁয়ালি'গুলি আদিম সমাজের সৃষ্টি হইতে পারে না; কেননা আদিম বর্বর সমাজের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মন এমন পরিণত বুদ্ধিপ্রসূত নহে। সুতরাং, হেঁয়ালিগুলি সুসভ্য ও উন্নত সমাজ-মনের পরিচায়ক হইলেও, এইগুলির প্রাচীনতার দাবী উপেক্ষণীয় নহে। বলা বাহুল্য, এখনও যে হেঁয়ালির সৃষ্টি হয় না, তাহা নহে। তাহার বেশির ভাগ আমাদের শিশু মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ।

দেশ-বিদেশের সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশের প্রাচীন সাহিত্যে 'হেঁয়ালী স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের 'স্ফিঙ্কস্' নামক রাক্ষসীর গল্প বহু বিদিত। এই রাক্ষসী লোককে প্রশ্ন করিত—

"বাল্যে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্ধক্যে ত্রিপদ—এমন জীবের নাম কি?" এই সমস্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া বহু লোক প্রাণ হারায়। পরিশেষে 'ইদীপুস' নামক এক জ্ঞানী ব্যক্তি এই জীব 'মানুষ', এই কথা বলিয়া রাক্ষসীকে হত্যা করিয়াছিল। হিন্দুদের ঋগ্‌বেদেও হেঁয়ালির উদাহরণ দেখা যায়। বাংলা-সাহিত্যেও 'হেঁয়ালি'র উদাহরণ প্রচুর। হাজার বছর পূর্বের চর্যাপদে দেখিতে পাই:

"দুলি দুহি পীঢ়া ধরন ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥"

আধুনিক বাংলায়

কচ্ছপী দুহিয়া ভাঁড়ে ধরান যায় না।
গাছের তেঁতুল (যে) কুমীরে খায়॥

শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষ-বিজয়েও এই শ্রেণীর 'হেঁয়ালি' আছে। কবি কঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গলের' শারী-শুক-সংবাদে যেই সমস্ত 'খেঁয়ালি' দেখা যায়, তাহার একটি এইরূপ:

"যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয়, পিলে নয়, ডাকে ঘন ঘন॥
চোর নয়, ডাকাত নয়, বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয়, পুত্র নয়, চুম খায় মুখে॥"

এই হেঁয়ালির উদ্দিষ্ট বস্তু 'হুকা' হইলেও, কল্পনার বাহাদুরী আছে। চব্বিশ পরগনার একটি 'হেঁয়ালি'তে সাহিত্যিক-রসও জমিয়া উঠিয়াছে, যেমন:

"বন থেকে বেরুলেন টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।"

'আনারস'কে এমন সোনার টোপর পরিহিত টিয়া বলিয়া কল্পনা করা সহজ নয়। ঠিক এই 'আনারসটি' চট্টগ্রামে বন-বিড়ালরূপে কল্পিত হইয়াছে। সেই বিড়াল আবার অদ্ভুত—অতি অদ্ভুত; যেমন—

"ঝাড়খুন নিঅলিল্ ভোজা।
পাছাত্ লাঠি মাথাত্ বোঝা।।"

‘হেঁয়ালি’গুলিকে আমরা ‘ধাঁধা’ও বলিয়া থাকি। প্রকৃত বস্তুটিকে বুদ্ধিবলে, কল্পনার খেলায়, কথার মারপ্যাঁচে ঢাকিয়া দিয়া শ্রোতার দৃষ্টিবিভ্রম, এমন কি, বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটানোই এই ‘ধাঁধা’ বা ‘হেঁয়ালি’গুলির মূল উদ্দেশ্য। গৃহের তৈজস-পত্র, প্রাকৃতিক ফল-ফুল, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি অসংখ্য বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ধাঁধার সৃষ্টি হয়। শ্রোতার স্বাধীন বিশ্লেষণের ফলে কোন ‘হেঁয়ালি’র গ্রন্থি-উন্মোচন বা সমস্যা-সমাধান চলে না। তাহা করিলে গৃহীতও হয় না। বাঁধা-ধরা উত্তরটি শ্রোতার জানা না থাকিলে কোন ধাঁধার উত্তর দেওয়া যায় না।

(৩) প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ ও প্রবচনের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। সমাজ-জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া শুক্তির বুকে মুক্তার ন্যায় সমাজের মধ্য হইতেই এইগুলির উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সকল দেশের সকল জাতির ভাষায় তাহাদের নিজ নিজ প্রবাদ ও প্রবচনগুলি স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশেও আমাদের প্রবাদের স্থান প্রাচীন কাল হইতেই হইয়াছে। চর্যাপদের "অপপন মাংসে হারণা বৈরী" শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে "আপনার মাঁসে হারণী জগতের বৈরী" এবং কবিকঙ্কণে "হরিণ জগৎবৈরী আপনার মাংসে" রূপে দেখা দিয়াছে। এইরূপ দেশের কত প্রবাদ যে আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মুক্তার মত ছড়াইয়া রহিয়াছে, আজও তাহার কোন হিসাব নিকাশ করা হয় নাই। জাতির বা সমাজ-জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রবাদগুলির মতো এমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ‘শিল্প-সাহিত্যে’র নাই বলিয়াই বোধ হয়, জাতির সাহিত্যে এইগুলি এত সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল।

‘প্রবাদ’ ও ‘প্রবচনের’ মধ্যে প্রভেদ আছে। উভয়ই সমাজ বা জাতির কিংবা ব্যক্তিবিশেষের জীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক সৃষ্টি হইলেও, আকৃতি-প্রকৃতিতে উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রবাদগুলি আকারে অত্যন্তই

ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, কোন 'প্রবাদ'ই দুই চরণের অধিক নহে। 'প্রবচন'-গুলি প্রবাদের চেয়ে দীর্ঘতর এবং মূলতঃ ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টি। 'প্রবাদে ছন্দের অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা একেবারে নাই এমন নহে, তবে ছন্দ না থাকিলে ক্ষতির কোন কারণও নাই। 'প্রবচন'গুলিতে কিন্তু ছন্দ না থাকিলে চলেই না। বিশেষতঃ প্রবচনগুলি কোন ব্যক্তি-বিশেষের সৃষ্টি এবং তাঁহার জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধ সত্যের ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। 'প্রবাদ'গুলির সহিত কখনও কোন ব্যক্তির সংস্রব থাকা অসম্ভব না হইলেও, সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ বলিয়া এইগুলি সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 'প্রবচন'গুলি বোধ হয় সভ্য সমাজের প্রথম জীবন-দর্শন এবং 'প্রবাদ'গুলি ইহার প্রথম সামাজিক নীতি। বলা-বাহুল্য, তখন এইগুলি একান্তই স্মৃতিনির্ভর হইয়া কালের সতর্ক-প্রহরীকে এড়াইয়া চলিয়াছিল। তাই আজও 'প্রবচন'গুলি হয় 'ডাক', না হয় 'খনা', না হয় 'রাবণের' নামে দেশে প্রচলিত এবং 'প্রবাদ'গুলি কোন ব্যক্তির নামে চলে না। ডাক, খনা বা রাবণ কোন অনৈতিহাসিক ব্যক্তি নহেন; তবে তাঁহাদের ইতিহাস কোন শিলালিপি, তাল বা ভূর্জপত্রে লিখিত না হইয়া সমাজভুক্ত মানুষের স্মৃতির ফলকেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় এ-পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার 'প্রবাদ' সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বাংলা-প্রবাদ' নামক গ্রন্থ (১৩৫৯ বাংলা) তাহার একমাত্র নিদর্শন। 'প্রবচন' সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রামাণিক গ্রন্থ সঙ্কলিত হয় নাই। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'প্রবাদ' ও 'প্রবচন'-গুলি অত্যন্ত কার্যকর ও উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি শ্লেষ, বক্রোক্তি ও উপদেশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। 'প্রবাদের' মর্মার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যখন বলি "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" কিংবা "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট" তখন আমরা যে 'চোর' বা 'তাঁতী' বনিবার ভয় করি তাহা নহে, বরং অতিরিক্ত কিছু ইচ্ছা হইলে, তাহা দমন করি। কিংবা যখন বলি---

"যম, জামাই, ভাগিনা,
এ তিন নয় আপনা।"

অথবা

"সাপ, শালা, জমিদার।
এ তিন নয় আপনার।।"

তখন আমরা যম, জামাই, ভাগিনেয়, সর্প, শ্যালক ও জমিদারের কৃতঘ্নতা সম্বন্ধে তাহাদের বুকে শ্লেষের বাণ বিদ্ধ করি। তখন তাহারা কাছে থাকিলে, নিশ্চয় তাহাদের কোন প্রতিনিধির নিমক-হারামির জন্য লজ্জায় তাহাদিগকে অধোমুখ হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে 'প্রবচন'গুলির কথাও বলা যাইতে পারে। 'প্রবচন'গুলির বেশির ভাগ ডাক ও খনার নামে প্রচলিত। 'রাবণের' নামে প্রচলিত প্রবচনের সংখ্যা খুব কম। সে নাকি গোয়ালা ছিল। 'ডাক' এক শ্রেণীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধার নাম। 'ডাকার্ণব' নামক গ্রন্থের পদগুলি 'ডাকদের' রচনা হওয়া বিচিত্র নয়। ডাকের বচনগুলি লোক-চরিত্র-ভিত্তিক ;

"নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউবে চায়।।
পর সম্ভাষে বাটে থেকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে।।"

'খনা'র বচন কিন্তু 'ডাকে'র বচন হইতে পৃথক। 'খনা' স্ত্রীলোক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার বচনগুলি প্রধানতঃ কৃষি ও ফলিত-জ্যোতিষ বিষয়ক উপদেশ। তাহার দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি---

(ক) দিনে রোদ রাতে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।।
কার্তিকের উন জলে।
খনা বলে দুনো ফলে।।

অথবা

(খ) শূন্য ফলসী শুক্‌নো না।
শুক্‌নো ডালে ডাকে কা।।
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।
এক পাও না বাড়াও বাপা।।
খনা বলে এরেও ঠেলি।
যদি না দেখি সমুখে তেলি।।"

বলা বাহুল্য, গঠন-রীতি ও ভঙ্গীতে 'ডাক' ও 'খনা'র বচন 'ছড়া'-জাতীয় হইলেও, এইগুলি ছড়া নহে। ছড়ায় উপদেশ নাই, চিত্র আছে,; আর 'খনা' ও 'ডাকের' বচনে চিত্র নাই, উপদেশ আছে। 'প্রবাদ-প্রবচন' ও 'ছড়া' এই দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সৃষ্টি।

(৪) মন্ত্র-তন্ত্র

মন্ত্র-তন্ত্র লোক-সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট বিভাগ। লোক সাহিত্যের এই বিভাগ গুপ্ত-জ্ঞানের অন্তর্গত ও গুরু পরম্পরায় লব্ধ বলিয়া আমাদের মতো বৈষয়িক লোকের প্রবেশাধিকার ইহাতে একরূপ নাই বলিলেও চলে। তবে দেখিতে পাই, ইন্দ্রজাল বা মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে অতি ব্যাপক ও প্রাচীন। ইংরাজিতে যাহাকে Magic বলে, ইহাও তাহাই। মুসলমানদের নিকট ইহা 'যাদু' নামে পরিচিত। ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি 'মন্ত্র-তন্ত্রের' বা 'যাদু'র প্রক্রিয়া। কবচ, মাদুলি ও তাবিজ 'মন্ত্র-তন্ত্রের' আর এক প্রকার অভিব্যক্তি। আমাদের দেশে অনেকটা অপ্রকাশ্যে এই সমস্তের ব্যবহার এখনও বহুল পরিমাণে চালু আছে। সাপের ওঝা, ভূতের ওঝা, জীনপরীর মোল্লা---এখনও 'মন্ত্র-তন্ত্র' ও 'জীনের আসর' সারাইতে ডাকা হয়। বরিশাল ও খুলনার সুন্দরবন অঞ্চলে ফকীরেরা এখনও 'বাঘ-বন্দী'র ছড়া বা মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে ব্যাঘ্র উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশ সাপের দেশ। এই দেশে প্রতি বৎসর বহুব্যক্তি সর্প-দংশনে প্রাণ হারায়। সর্পদষ্ট হইলেই লোক সাপের ওঝার খোঁজ করে। এই সাপের ওঝার একটি মন্ত্র এইরূপ:

"হস্ত সারম গলা সারম আর সারম মুখ।
পেট পিঠ চরণ সারম আর সারম বুক।।
পেট পিঠ চরণ সারি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে।।
কাঙুরের কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর।
বালর বিন্দ রাজা বলে অমুক হৈল অমর।।"

এই মন্ত্রে কামরূপের কামাক্ষী বা কামাখ্যা দেবীর বরের উল্লেখ আছে। এই দেবীই তন্ত্র-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সুন্দরবনের মুসলমান ফকীরদের 'বাঘ-বন্দীর মন্ত্র' বা ছড়া অন্যরূপ। বাঘের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহারা যে-সমস্ত মন্ত্র আওড়াইয়া থাকে তাহার একটি এইরূপ:

"আদি বন্ধম, অনাদি বন্ধম।
গাজী কালুর চেলায় বন্ধম॥
আমার গায়ে বাঘের ঘা।
মা ফাতেমার মাথা খা॥"

সুন্দরবনের বাঘ এই মন্ত্রে কাবু হয় কিনা কে বলিবে? কিন্তু, তাহারা যে দলবদ্ধ ফকীরের চীৎকার শুনিয়া পলাইয়া যায়, তাহার সংবাদ এই অঞ্চলের অনেকের কাছে পাওয়া যায়।

(৫) লোক-গাথা

ইংরেজীতে যাহাকে Ballad বলে, আমরা বাংলায় তাহাকে 'লোক-গাথা" বলি। পাক-ভারতে 'গাথা' অতি প্রাচীন 'লোক-সাহিত্য'। এইগুলি মূলতঃ কাহিনী-প্রধান সৃষ্টি, রস-প্রধান রচনা নহে। গীতিছন্দে এই গাথাগুলি রচিত। বাংলা পাঁচালী বা লাচারীর মতো গাথার সুর অনেকটা একঘেঁয়ে। গাথা উন্নত সভ্য-সমাজের সৃষ্টি বলিয়া এইগুলিতে শিল্পচাতুর্যের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে যে-সমস্ত গাথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে 'ময়মনসিংহ-ব -গীতিকা' ও 'নাথ-গীতিকা' প্রধান। 'নাথ-গীতিকা'-গুলি এক সময়ে সমগ্র পাক-ভারতে প্রচলিত ছিল। পরলোকগত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই সমস্ত 'গাথা' সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া বিশ্বের সপ্রশংস-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই 'গাথা'গুলির বিস্তৃত সাহিত্যিক আলোচনাও করিয়াছেন। নিম্নে 'নাথ-গীতিকা'য় রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তাঁহার রানী অদুনা ও পদুনার মর্মস্পর্শী বিলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগি বান্ধিলাম আমি শীতল মন্দির ঘর।।
বান্ধিলাম বাংলা-ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন ব'সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাভুরালি।।
নিন্দের স্বপনে রাজার হইবে দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হাথ নাহি প্রাণের ধন।।"

(৬) লোক-কথা

কথা ও গল্প বলার প্রবৃত্তি মানুষের একটি বিশিষ্ট প্রাচীন অভ্যাস। এই অভ্যাসবশে আমাদের দেশে যেই সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, রসবোধের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে 'ব্রতকথা', 'রূপকথা', 'উপকথা', 'পুরাকথা,' 'শ্রুতিকথা', ও 'কেচ্ছা-কাহিনী' নামে অভিহিত করা হয়। 'ব্রতকথা' কেবল হিন্দু সমাজে, 'কেচ্ছা-কাহিনী' শুধু মুসলমান সমাজে এবং 'রূপকথা', উপকথা', 'শ্রুতিকথা', 'পুরাকথা' উভয় সমাজে প্রচলিত আছে। 'লোক-কথা'র এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের দেশে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। আমরা লোক-সাহিত্যের এই বিভাগ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অবহিত। সুতরাং, এই বিভাগের কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা না করিয়া, অতি ক্ষুদ্র একটি কাহিনী বলিয়া শেষ করিতে চাই। কাহিনীটি এইরূপ:

কাক ও চড়ুই পাখী
"গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড়্‌ব
কাস্তে, খাবে গাই, দিবে দুধ, খাবে
কুকুর, হবে তাজা, মার্‌বে মোষ,
লব শিং, খুড়্‌ব মাটি, গড়্‌ব ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট,—তবে
খাব চড়ুইর বুক।"

(৭) লোক-সঙ্গীত

'লোক-সঙ্গীত' আমাদের 'লোক-সাহিত্যের' একটি অঙ্গ। ইহা অত্যন্ত

জনপ্রিয়। এই সঙ্গীতগুলিতে 'সুরও' আছে 'কথাও' আছে, কিন্তু 'কালোয়াতী' নাই। হৃদয়ই এই গানগুলির জন্মস্থান, অনুভূতিই ইহাদের জনক। এইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এককভাবেই গীত হয়। যন্ত্রের বাহুল্যও এইগুলিতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ একতারা, দোতারা, সারিন্দা, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, বাঁশী, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এককভাবে এই সমস্ত গানে ব্যবহৃত হয়। আমাদের এই 'লোক-সঙ্গীত'কে আমরা এই কয়ভাগে ভাগ করিতে পারি :

(ক) প্রেম-সঙ্গীত : ভাটিয়ালী, ভাওইয়া, বারমাসী ;
(খ) নৃত্য-সঙ্গীত : ঝুমুর, ভাঁজোই, ঘাটু, নেটো ;
(গ) সহেলা : যাবতীয় মেয়েলী-সঙ্গীত ;
(ঘ) শ্রম-সঙ্গীত : সারি, বাইচ, ছাতপেটা, কর্মপ্রেরণার হুঙ্কার ;
(ঙ) কৃষি-সঙ্গীত : জাগ, কার্তিকা, পুষালি ;
(চ) আনুষ্ঠানিক-সঙ্গীত : গম্ভীরা, গাজন, ভাদুই ;
(ছ) পটুয়া-সঙ্গীত : দেবপট, গাজীপট ;
(জ) শোক-সঙ্গীত : জারী-গান, কান্না-গান ;
(ঝ) ভক্তি-সঙ্গীত : শাক্ত সঙ্গীত, সোনাপীর, মানিকপীর, বদরপীর, মাইজ-ভাণ্ডারী ;
(ঞ) তত্ত্ব-সঙ্গীত : বাউল, মুর্শিদা, মারফতী, দেহতত্ত্ব।

লোক-সঙ্গীতের এই যে এতগুলি ভাগ, বর্তমান-আলোচনায় তাহার সম্যাক্ পরিচয় দান সম্ভবপর না হইলেও, 'লোক-সাহিত্যের' এই বিশাল অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। নতুবা 'লোক-সাহিত্যের' ধারণা সুস্পষ্ট হইতে পারে না।

(ক) প্রেম-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতের মধ্যে 'প্রেম-সঙ্গীতের' কথাটি সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। কেননা এই সঙ্গীতগুলিই লোক-সমাজে সর্বাধিক প্রিয় বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের অকুণ্ঠ আবেগউচ্ছ্বাসের প্রকাশই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। বিরহ, মিলন, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি যৌবনধর্মী অনুভূতির প্রেরণাই এই সঙ্গীত-সৃষ্টির মূলে ক্রিয়া করিয়াছে।

প্রেম-সঙ্গীতগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি যন্ত্রের সাহায্যে একক কন্ঠে গীত সঙ্গীত। এইগুলি আমাদের কাছে 'ভাটিয়ালি', 'ভাওইয়া', 'বারমাসী' প্রভৃতি নামে পরিচিত। অবসর সময়ে লোকচিত্ত-বিনোদনের জন্যই এইগুলি গীত হয়। 'ভাটিয়ালি' একান্তই পূর্ববঙ্গের, 'ভাওইয়া' খাস উত্তর-বঙ্গের এবং 'বারমাসী' সর্ব-অঞ্চলের সঙ্গীত। এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে কেবল 'ভাওইয়া' গানের সহিত আমাদের পরিচয় নিবিড় নহে বলিয়া এইরূপ একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি:

"পরথম যৈবন কালে না হৈল বিয়া।
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হৈয়া ।।
রে বিধি নিদয়া ।।
হাইলা পৈল্ মোর সোনার যৈবন মলেয়ার ঝড়ে।
মাও বাপ মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে ।।
বে বিধি নিদয়া ।।
বাপক্ না কও শরমে মুই মাওক্ না কও লাজে।
ধিকি ধিকি তুষির আগুন জ্বলেছে দেহির মাঝে ।।
বে বিধি নিদয়া ।।
পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ-শরমের ডরে।
খুলিয়া কোইলে মনেব কথা নিন্দা করে পরে ।।
রে বিধি নিদয়া ।।
এমন মন মোব কবে বিধি এমন মন মোর করে।
মনেব মতন চেংড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে ।।
রে বিধি নিদয়া ।।
কহে কবে কলঙ্কিনী হানি নাইক মোর তাতে।
মনের সাধে করিম কেলি পতি নিয়া সাথে ।।
রে বিধি নিদয়া ।।"

যৌবন অতিবাহিত প্রায় অবস্থায় থাকিয়া এই যুবতীর মনে যে প্রেমানল জ্বলিয়াছিল তাহা নিশ্চয় তাহার মাতা-পিতার মুখে কলঙ্ক লেপন না করিয়া ছাড়ে নাই। এই সামাজিক দিক উপেক্ষা করিয়া একবার তাহার হৃদয়ের দিকে তাকাইলে নিশ্চয় আমাদের করুণা না হইয়া পারে না। তখন আমরা

বেশ অনুভব করিতে পারি যে, নারী-হৃদয়ের এই ভাব অনেকটা সার্বজনীন। নতুবা আমরা কখনও পূর্ববঙ্গের নারীর মুখে এই ভাবটি এমন করিয়া শুনিতে পাইতাম না—

"ফুল যদি হৈতারে বন্ধু,
আইতা ফুলের বেশে রে।
আমি ঝাইড়া বাইন্‌তাম বেণী আমার
ছাপাই রাইখ্‌তাম কেশে রে॥
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা,
আমি উইড়া যাইতাম সোনার বন্ধুর দ্যাশে রে॥"

(খ) নৃত্য-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতে নৃত্য-সঙ্গীতের সংখ্যাও কম নয়। এই গানগুলিতে সুরের চেয়ে নাচের প্রাধান্য দেখা যায়। এইগুলিতে বাদ্যযন্ত্রের স্থানও গৌণ। নৃত্য-সঙ্গীতের মধ্যে 'ঝুমুর' 'ঘাটু' 'লেটো', 'ভাঁজোই' গানই উল্লেখযোগ্য। 'ঝুমুর', 'ভাঁজোই' ও 'লেটো' পশ্চিম-বঙ্গের গান। কবি নজরুলের সংস্রবে আসিয়া 'লেটো' এখন শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত, 'ভাঁজোই' বীরভূম অঞ্চলের মেয়েদেব নৃত্যসহ গান। 'ঝুমুর' মূলত: বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগনায় সমাদৃত। 'ঝুমুর' প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালদের বর্ষা-সঙ্গীত। নিম্নে যে খাঁটি 'ঝুমুর' গানটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে:

"এসো কা বরখা বড়ী জোর।
ভীংজয় সোরে সোর—
এসো কা বরখা বড়ী জোর॥
রোপালী হম রোপা ধান।
বদরী গরজে আসমান॥
বনমে নাচত হৈঁ মোর।
এসো কা বরখা বড়ী জোর॥
খেত চাঙ্গঢ় কিষাণ ঠাঢ়।

ভরল নদীকে দেখে বাঢ় ।।
অন্ন ধন ন হোবৈং থোর।
এসো কা বরখা বড়ী জোর ।।"

(গ) সহেলা

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে বহু প্রকারের গান করার রীতি এখনও বর্তমান। মেয়েদের এই সমবেত কণ্ঠে গীত গানকে 'সহেলা' বলে। এই গান বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খৎনা কান-ছেঁদানি প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের দ্বারা গীত হয়। মেয়েই এই গানের গায়িকা ও মেয়েই এই গানের শ্রোত্রী। তাই এই গানের নাম 'সহেলা' বা সখীদের মিলিত গান। চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত এমন একটি গান এইরূপ:

"সোনার নাপিতারে আঁআরো বাড়িত্ যাইবা।
সোনার নরৈং সোনার বাড়ি হোঁআরে করি নিবা ।।
সোনার নাপিতারে।
ভালা করি কামা নাপিত্
বাপের দুর্লভ্ পুত্‌রে।
চিয়ন্ করি কামা নাপিত
হুনর্ করি কামা নাপিত্
মায়ের দুর্লভ্ পুত্‌রে।
সোনার নাপিতারে।"

বিবাহের সময় নাপিত যখন বর কামাইতে আসে তখন এই জাতীয় গান গীত হয়। গানের তালে তালে সকলে মিলিয়া হাতে তালি বাজাইবার রীতিও কোথাও-কোথাও দেখা যায়। হাততালিই এই গানের বাদ্য।

(ঘ) শ্রম-সঙ্গীত

'লোক-সঙ্গীতে অজস্র 'শ্রম-সঙ্গীতে'র আলোচনাও উপেক্ষণীয় নহে। কাজ করিবার সময় শ্রম লাঘব করিবার জন্য কিংবা কাজে জোর ধরাইবার জন্য একজন গান ধরে এবং সকলে সমস্বরে গানের ধুয়াটি আওড়াইতে থাকে। শ্রম-সঙ্গীত এই কয় নামে পরিচিত. যথা---'সারি' বা 'সাইর'

গান 'বাইচ্যা' বা নৌকার বাইচ খেলার গান 'ছাইত্যা' বা ছাতপেটার গান। এই গানগুলির অধিকাংশই সুরুচির পরিচায়ক নয়। এমন একটি গান এরূপ:

ওরে ও রাইকিশোরী।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
ঐ কাল জলে চান করাব সই
ও সইরে ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
বেড়াই আমি তোমার লাইগ্যা
অন্নধারী হৈলাম সাথী তোমার লাইগ্যা;
ঘুরছি আমি রাত্রি দিনে
করছ কেন ছল চাতুরি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?

বলা বাহুল্য শ্রমিকদের কাজে জোর ধরাইবার জন্য যে-গান করা হয় তাহার সহিত 'সারি'. 'বাইচ্যা' বা 'ছাইত্যা' গানের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এইগুলির কথাও অল্প. সুরও দমকা। তাহার এই একটি নমুনা দেখুন:

"ওরে ও জোয়ান---
আরও জোরে---হেঁইও।
সাবাস জোয়ান---হেঁইও।
একটু আরও---হেঁইও।"

(ঙ) কৃষি-সঙ্গীত

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের 'লোক-সঙ্গীত' হইতে 'কৃষি-সঙ্গীত' বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের কৃষকেরা আজও যেমন উপেক্ষিত, তাহাদের গানও তেমন অবহেলিত। কৃষকদের কম অথবা অবসর সময়ে চাষ-আবাদকে কেন্দ্র করিয়া যেই সমস্ত গান গীত হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কিন্তু আজিও পর্যাপ্ত পরিমাণে এই গান সংগৃহীত না হওয়ায়, আমরা ইহার অধিক সংবাদ রাখি না। এই কৃষি

সঙ্গীতের মধ্যে উত্তর-বঙ্গের 'জাগ' বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত দেশ জুড়িয়া 'কার্তিকা' ও পুষালি' গানের প্রচলনও আছে। রাত্রি জাগিয়া গান করা হয় বলিয়া উত্তর বঙ্গের 'জাগ' এই নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের 'পুষালি' গান। পৌষমাসে সারা মাস ধরিয়া কৃষকেরা দিনান্তে দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া বেড়ায় এবং পৌষ-সংক্রান্তির দিন রাত জাগিয়া ভোজের উৎসব করে ও 'জাগ' গানের আসর জমায়। 'জাগ' গানে সোনাপীরের কাহিনী ও কৃষ্ণ-চৈতন্য আখ্যায়িকাও দেখা যায়।

'কার্তিকা' গান কৃষকদের কার্তিক মাসের সঙ্গীত। ধান বুনার কাজ সারিয়া তাহারা প্রত্যেক দিন মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ধানের বাড়-বাড়তি লক্ষ্য করে। তখন বুনা ধানের কোন প্রকারের ক্ষতি হইতে দেখিলে দুঃখে তাহাদের বুক ফাটিয়া যায় এই সময়ের একটি গান এইরূপ:

"আরে রে বাবুইরে,
ক্ষেতের পাকনা ধান খাইলে।
উইড়্যা উইড়্যা ধান খায়,
পইড়্যা পইড়্যা রং চায়,
সরাই নলের আগ বাসারে।
এক বাবুইরে ধলিয়া,
আর এক বাবুই কালিয়া
আর এক বাবুইর কপালে তিলক রে।
আরে রে বাবুই রে,
ক্ষেতের পাকনা ধান খাইলে।"

'পুষালি-গান' পৌষ-পার্বণের উৎসব। ইহাই উত্তর-বঙ্গে 'জাগ' গানে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন এই গান অধিক শুনা যায়। এইদিন হিন্দুদের মধ্যে পিঠা-পুলি খাওয়ার রীতিও আছে। এই সময়েই কৃষক তাহার সংবৎসরের উপার্জন মাঠের ধান বাড়ির আঙিনায় পৌঁছাইয়া দিয়া কৃষাণ-বধূর জিম্মার সোপার্দ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। কৃষাণ-বধূ সানন্দে তাহার জিম্মা বুঝিয়া লয়, বাড়ির আঙিনায়

ধান মাড়ায় ও শুকায়। এমন সময় আঙিনার বিছানো ধানে কাক বসিয়া যখন ধান খাইয়া লয়, আর কৃষক নীরবে দাওয়ায় বসিয়া আনমনে হুঁকা টানিতে থাকে, তখন কৃষাণ-বধূ গলায় ঝঙ্কার দিয়া গাহিয়া উঠে,—

ওরে, কাউয়া ধান খাইল রে।
আমার—খাওয়ার মানুষ আছেরে ভাই,
ক মানুষ নাইরে।
ওরে, কাউয়া ধান খাইল রে।"

(চ) অনুষ্ঠান-সঙ্গীত

আমাদের দেশের এক একটা অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সঙ্গীতগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'ভাদুই', 'গাজন', ও 'গম্ভীরাই' প্রধান। 'ভাদুই' ভাদ্র মাসে গীত ও 'গাজন' চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত পশ্চিম-বঙ্গের গান। 'গম্ভীরা' মালদহের গান। ইহা সারা বৈশাখ মাস ব্যাপীয়া গীত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই ইহাতে যোগদান করে। 'গম্ভীরা' প্রকৃতপক্ষে 'সাল-তামামী' গান, ভোলা (এখন, 'দাদা') বা শিবকে সুখ-দুঃখের নির্বিকার দর্শকরূপে কল্পনা করিয়া জনসাধারণের সাংবৎসরিক সুখ-দুঃখের কাহিনী লইয়া এই গানগুলি বাঁধা হয়। এমন একটি গান এইরূপ:

"ও ভোলা—
বল্‌ব কি গান বাগানে নাই আম।
গাছে গাছে বেড়িয়া দেখ্‌ছি
নতুন-পুরান সব সমান।।
মনে মনে ভাব্‌ছি বৈসা,
কাজের কোন পাইনা দিশা,
তেল ধান চাউলের দর খুব কশা,
ভুষার বেশী দাম।।
আর এক শুন কাহিনী,
ঠিক দুপুরে শিল আর পানি,
মাঠে হয় কিষাণ পেরেশানী
মরল ভোলা সব গহম।।"

(ছ) পটুয়া-সঙ্গীত

'পটুয়া' মূলতঃ পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গীত। পরে ইহা পূর্ববঙ্গেও চালু হইয়া থাকিবে। পশ্চিম-বঙ্গের পটুয়ারা এক শ্রেণীর হিন্দু চিত্রকর; ইহারা লৌকিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্র আঁকিয়া গান গাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের এই গানের নাম 'পটুয়া-সঙ্গীত'। পূর্ববঙ্গেও এক শ্রেণীর পট বা চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহার নাম 'গাজীর পট'। গাজীর পট অবলম্বনেও গান রচিত হইয়াছে।

(জ) শোক-সঙ্গীত

সুখের ন্যায় শোকও মানব-জীবনের একটি প্রধান অনুভূতি। এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়াও আমাদের দেশে বহু গান রচিত হইয়াছে, কিন্তু সংগৃহীত হয় নাই। এই শ্রেণীর গানে 'জারী' ও 'কান্না'-গানই প্রধান। আত্মীয়-বিয়োগে আমাদের দেশে মেয়েরা গলা ছাড়িয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। এইগুলি 'কান্না-গান'। পূর্ববঙ্গের 'জারী-গান' চির প্রসিদ্ধ; নৃত্যও ইহার একটি প্রধান সহচর। করুণ কারবালা-কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া জারীগান রচিত হয়। ইহার একটি এইরূপ:

"চল, চল, চল, সবে সমরখন্দে যাব।
এজিদে মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব॥
সাবাস, সাবাস, সাবাস ভাই,
জীও, জীও, জীও ভাই।
হানিফ বলে আয় মোর কোলে
জয়নাল বাছা ধন।
ওই যে না পথে গিছেরে দুই ভাই
জোড়ের ভাই ইমাম হোসেন।
সেই না পথে যাব রে আমি,
করো আমার গোর কাফন॥
চল, চল, চল, সবে সমরখন্দে যাব।
এজিদে মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব॥"

(ঋ) ভক্তি-সঙ্গীত

আমাদের দেশে ভক্তি-সঙ্গীতের সংখ্যাও কম নহে। শাক্ত-সঙ্গীত, সোনাপীর, বদরপীর প্রভৃতির গান, মানিকপীরের গান এবং ভাণ্ডারী-সঙ্গীত প্রভৃতি ভক্তি-সঙ্গীতেব অন্তর্গত। 'শাক্ত-সঙ্গীত' সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অন্যান্য 'ভক্তি-সঙ্গীত' সংগৃহীত হয় নাই। 'বদর-সঙ্গীত' মাঝি-মাল্লাব গান। অধুনা এই গান একরূপ বিলুপ্ত। ইহার একটি এইরূপ:

"ওবে---নাইরে, নাইরে, নাইরে ডর।
আল্লা, নবী, পাঁচপীর, বদর বদর।।
ওরে---ঝড় তুফানে নাইবে ভয়।
সামনে চালাইলাম রে নাও।
সাযরে চালাইলাম নাও রে---
নাইরে, নাইরে নাইরে ডর।
আল্লা, নবী পাঁচপীব, বদর বদর ।।"

'ভাণ্ডারী-গান'গুলি চট্টগ্রামের মাইজ-ভাণ্ডার গ্রামের শাহ্ আহমদুল্লার দবগাহকে কেন্দ্র কবিয়া বচিত হয। প্রতি বৎসব মাঘ মাসের দশ তারিখে এই দবগাহে মেলা বসে ও গানগুলি নাচিয়া কুঁদিয়া তালি বাজাইয়া গাওয়া হয়। ইহার একটি গান এইরূপ:

"গৌছল আজম মাইজ ভাণ্ডাব।
বাতাই দেরে রাস্তারে খোদার।
হায হায় করি যে ডাল ধরি,
সে ডাল ভাঙ্গি মাটিতে পড়ি,
ওবে ধূলত পড়ি গড়াগড়ি,
হৈল আমাব জীবন খাব।।"

(এ) তত্ত্ব-সঙ্গীত

আমাদের 'তত্ত্ব-সঙ্গীত'গুলিও লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গত। এইগুলি 'বাউল', 'মুর্শিদা', 'মারফতী', দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নামে আমাদের মধ্যে সুপরিচিত। আমাদের সমাজ-জীবনে নানা মত প্রচার ও প্রসারের ফলে যে একটা

সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই অভিব্যক্তি। লোক-সাধারণ নানা মত ও পথের ডামাডোলে বিভ্রান্ত না হইয়া যেন একটা সরল সহজ তত্ত্ব নিজেদের মতো করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। ফলে, এই গানগুলির উৎপত্তি। এই গানগুলি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই অল্পবিস্তর অবহিত বলিয়া এইস্থানে ইহাদের কোন আলোচনা একরূপ অনাবশ্যক। তবু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারি---

"মন তুমি কৃষি কার্য জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।"
কিংবা
'খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি
কেম্নে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতেম তাহার পায়।।"

এই জাতীয় বহু গান এখন আমাদিগকে একতারার সুরে উদাস করে, বিবাগী বানায়।

আমি উপসংহারে বলিতে চাই, আমাদের 'লোক-সাহিত্য' আমাদের দেশের লোকের মতই উপেক্ষিত ও অনাদৃত। এতৎসত্ত্বেও, শিক্ষিত সমাজের 'শিষ্ট-সাহিত্যের' প্রচার ও প্রসারের আক্রমণ, এমন কি তাঁহাদের ব্যক্তিগত নাক-সিট্কানি উপেক্ষা করিয়া আজ পর্যন্ত আমাদের 'লোক-সাহিত্য' জীবন্মৃত অবস্থায় হইলেও বাঁচিয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে, এই অবস্থায় আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি আজ তাহাদের 'লোক-সাহিত্য' উদ্ধারের চেষ্টায় 'টেপ-রেকর্ডিং' হইতে আরম্ভ করিয়া যে-সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে তাহার কথা না ভাবিয়াও বলিতে পারি, আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের 'লোক-সাহিত্য' সংগ্রহে নামিয়া যাওয়া আবশ্যক। নতুবা, আমরা অচিরেই দেশের এমন এক সাংস্কৃতিক সম্পৎ হারাইব, যাহার সন্ধান হাজার চেষ্টা করিলেও পাওয়া যাইবে না। আমি বিশ্বাস করি, নূতন শিক্ষা-দীক্ষা,

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সাংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের মধ্যে যেই সামাজিক বিবর্তন শুরু হইয়াছে, ইহার শেষ পরিণতি হইতেছে গ্রামীণ-সভ্যতার ধ্বংস ও শহুরে সভ্যতার ক্রমিক বিস্তার। এই অবস্থায় 'লোক-সাহিত্যে'র পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তাই, 'লোক-সাহিত্যে'র পুনরুজ্জীবনের কথা না ভাবিয়া আমাদিগকে ইহার পুনরুদ্ধারের কথাই চিন্তা করা উচিত। বাংলার সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মনোবৈজ্ঞানিক, এমন কি, ঐতিহাসিক উপাদানও এই 'লোক-সাহিত্যে'র মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সত্যকারভাবে জাতিকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে, আমাদের 'লোক-সাহিত্যে'র ব্যাপক উদ্ধার ও সম্যক্ সংরক্ষণ ব্যবস্থার আবশ্যক, যেন গভীর গবেষণার সাহায্যে জাতির নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় পাইতে পারা যায়।

এই যে 'লোক-সাহিত্য' সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক দিক,---ইহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিছক সাহিত্য ও রসের দিক হইতেও লোক-সাহিত্য উপেক্ষণীয় নহে। সুবিশাল ও সুবিস্তৃত 'লোক-সাহিত্যের' অতি সামান্য অংশই এ-যাবৎ শিক্ষিত সমাজের গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাতেই তাঁহারা 'লোক-সাহিত্যে'র সজীবতা, সারল্য, সৌন্দর্য ও অনুভূতির গভীরতায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। যেই দিন এই সাহিত্যের সকল দিক উদ্‌ঘাটিত হইবে, আশা করি, সেই দিন ইহার বিপুল অনাবিষ্কৃত দিকের সন্ধান লাভ করিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবেন। আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় সুদূর ভবিষ্যতের পথ-পানে চাহিয়া রহিলাম। 'লোক-সাহিত্য' অমর হোক।*

---

*বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের লোক-সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ (১৯৫৭ খ্রীঃ)।

সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী–সংস্কৃতির উৎস নিরূপণ

সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পল্লী-সংস্কৃতির উৎস নিরূপণ করাই হচ্ছে এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের পল্লী সংস্কৃতি বহু বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই নানা সংস্কৃতিক উৎসের বিচিত্র রস-ধারায় সুসিঞ্চিত হ'য়ে পরিপুষ্ট। আমরা শীগ্গির তার কিঞ্চিত পরিচয় দেবো। তার আগেই পল্লীর সাহিত্যগত সংস্কৃতির সাথে একটু পরিচয় ক'রে নেওয়াই বোধ হয় ভালো। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই আলোচনা চলবে।

আজকাল আমরা সাহিত্য বল্লে, এমন এক মানসী সৃষ্টি বুঝি, যা শহরের কল কারখানায় প্রস্তুত বহু পরিচিত সামগ্রীর মতন একটা শিল্প বস্তুরূপে গ্রামের ক্ষুধা বা চাহিদা মেটাবার জন্য শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। আগেকার দিনে সাহিত্যের ধারা ছিল গ্রাম থেকে শহরমুখী। এখন আমাদের শহুরে সাহিত্যের সাথে পল্লীর যোগ কেমন যেন এক রকম বিচ্ছিন্নই হ'য়ে গেছে। উপন্যাস, ছোট গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের সাহিত্যের সাথে পল্লীর নিভন্ত পিদ্দিমের দীনতার মতো শেষ যোগ রক্ষার যে চেষ্টা কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে, তার অক্ষমতা দেখলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এতে না আছে পল্লী, না আছে পল্লীর প্রাণ, আর না আছে পল্লীর পোশাক বা মন ভুলানো সৌন্দর্য। আগেকার দিনে কিন্তু পল্লীর সাথে দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধ এমনটা ছিলনা ; দুই-ই ছিল এখন যতটা দূরবর্তী তখন ততটা পরস্পর নিকটবর্তী।

তবুও স্বীকার করতে হবে, আগেকার দিনে আমাদের পল্লীর সাথে আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধ যতই-না-কেন ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হোক, উভয়ের

মধ্যে একটা স্বাভাবিক ফাঁক ছিলই। পল্লীর গোড়ামীর স্থান সাহিত্যে কোন দিনই ছিল না। বিশেষ ক'রে সাহিত্যের নাগরালি বা শহুরে ভাব পল্লী কি করেই বা পাবে? মোটের উপর, আমাদের সাহিত্যের নাগরালি বা শহুরে হাব-ভাব পল্লীর গেঁয়োমির থেকে অনেকটা তফাৎ হ'লেও আমাদের সাহিত্য ছিল পল্লীভাবপ্রধান আর পল্লীপ্রাণপরায়ণ। তার প্রধান কারণ হলো আগেকার দিনে যাঁরা আমাদের মধ্য থেকে সাহিত্য রচনা করতেন, তাঁরা ছিলেন মনে-প্রাণে এবং বসবাসে পল্লীর লোক।

আমাদের এই যে পল্লীর গেঁয়োমিবর্জিত অথচ পল্লী-ভাবপ্রধান সাহিত্য, এ হচ্ছে আমাদের আট-ঘাটবাঁধা সাহিত্যিক সংস্কৃতির নমুনা। আমাদের দেশের মনসা-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল থেকে নিয়ে য়ুসুফ-জোলেখা, হাতেম তাই, আমীর হামজা, মকতুল হোসেন এমন কি কালুগাজী চম্পাবতী পর্যন্ত রচিত সাহিত্য আমাদের এই আট-ঘাট বাঁধা সাহিত্যিক-সংস্কৃতিরই নিদর্শন। এগুলিকে বাদ দিয়ে আমাদের পল্লী-অঞ্চল থেকে তার নিজস্ব ব'লে দাবী করতে পারে, এমন সাহিত্যের অভাব পল্লী কোনদিনই অনুভব করেনি। পল্লী এ সাহিত্যকে কখনও আমাদের মৃত অক্ষরের পিঞ্জরে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেনি বরং সে চেয়েছে প্রাণবন্ত মানুষের জীবন্ত কণ্ঠে কণ্ঠে এ'-কে চির-সবুজ এবং চির চঞ্চল করে লীলায়িত রূপে ফুটিয়ে তুলতে। ফলে এ'সাহিত্য আমাদের পল্লীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, আকর্ষ-আদর্শ, ধর্ম-বর্ম, রীতি-নীতি, ছায়া-ছবি প্রভৃতি যেমন নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে তেমনটি আর কোথাও হয়নি।

আমাদের পল্লীর এই সাহিত্যিক-সংস্কৃতির কথা মনে রেখে এর সংস্কৃতিকে মোটামুটি তিন দিক থেকে বিচার করা চলে। তার প্রথমটি হচ্ছে পল্লী-বচনের দিক, দ্বিতীয়টি পল্লী-সঙ্গীতের দিক এবং তৃতীয়টি পল্লী গাথার দিক। এই দিকগুলির প্রত্যেকটি আধুনিক যুগের শহুরে সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের মানসিক ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য ছাপার অক্ষরে স্থান পেলেও শহরে নির্বাসিতা গেঁয়ো বঙ্গবধূর মতো এরা যেন আজ পুঁথির পৃষ্ঠে বন্দীর জীবন যাপন করছে। এখনও এদের প্রাণের পরিচয় পে'তে গেলে আমাদেরকে যেতে হয় পল্লীর শান্ত-স্নিগ্ধ নিভৃত নিকেতনে। বেতার মারফতে ভাটিয়ালী প্রভৃতি পল্লী-সঙ্গীতের যে কৃত্রিম সুর ও কথা

আজও নগরের গৃহে গৃহে আনন্দ বিলায়, তা নেহাৎ নাটকীয় প্রকৃতির কৃত্রিম আনন্দ,--তাতে পল্লীর স্বাভাবিক প্রাণের পরশ কোথায়?

আমরা এইমাত্র বলছি পল্লীর সাহিত্যিক-সংস্কৃতির প্রথম দিক হচ্ছে 'পল্লী বচনের দিক'। এ-দিকটির বিশালতাও নেহাৎ কম নয়। ডাক ও খনার বচন, প্রবাদ ও প্রবচন, মন্ত্র-তন্ত্র ও ছড়া প্রভৃতিকে 'পল্লী-বচনের' সামিল করা চলে।

আমাদের ডাক ও খনার বচনগুলি পল্লীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির অন্যতম। পল্লী অঞ্চলে এখনও এমন প্রাচীন লোক নেই, যারা এই বচনগুলির দু'চারটি জানেন না। যুগে যুগে এগুলির ভাষা পাল্‌টে গেছে সত্য, তবু প্রাচীনত্বের ছাপ এ-বচনগুলির কিছু কিছু অংশ আজও বহন ক'রে বেড়াচ্ছে। এগুলি হচ্ছে পল্লী প্রজ্ঞার এক একটি মূর্তিমান কীর্তি। চাষবাস, আবহাওয়া শুভাশুভ, মড়ক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি নিয়েই পল্লী-অঞ্চলের প্রজ্ঞা এগুলিতে মূর্তিলাভ করেছে। এগুলিতে পুষ্করিণী খনন, রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি জনহিতকর জ্ঞান কৃষক ও গ্রামাচার্যদের জ্ঞাতব্য জ্যোতিষ্ক শাস্ত্রীয় উপদেশাদিও কম নেই। এগুলি সূত্রাকারে রচিত বলে মনে রাখার পক্ষেও সুবিধে যথেষ্ট। এই তার একটু নমুনা দেখুনঃ

(ক) খনা ডেকে বলে যান,
"রোদে ধান ছাওয়ায় পান।"
(খ) "কার্তিকে ওল, মার্গে বেল।
পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল॥
ফাল্‌গুনে আদা, চৈত্রে তিতা।
বোশেখেতে নিম নালিতা॥
জেঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই।
ভাদ্রে তাল, শাওনে মই;
আশ্বিনে খাও কাশা ঘাসা।
ডাক বলে এই ব'র মাসা।

আমাদের পল্লী-অঞ্চলে 'প্রবাদ ও প্রবচনের' সংখ্যাও একেবারে অনন্ত। ডক্টর সুশীল কুমার দে মহাশয় তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' নামক গ্রন্থে ৬৬৮১টি

'প্রবাদ ও প্রবচন প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থের দীর্ঘ চমৎকার পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভূমিকাটিতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সংগ্রহটিকে যেন বাংলা প্রবাদের চূড়ান্ত গ্রন্থ বলে কেউ মনে না করেন,---অবশ্য সংখ্যার দিক থেকে।

বাস্তবিকই দেশে কত যে প্রবাদ চালু আছে, কে তার খোঁজ রাখে? গ্রামাঞ্চলের সরল প্রকৃতির মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহজ অভিজ্ঞতাকে কথায় রূপ দিতে গিয়ে যে তীব্র টিপ্পনী কাটার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তার মধ্য থেকেই প্রবাদ ও প্রচলনগুলির জন্ম হ'য়ে থাকবে। বহু লোক পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে থোড, বড়ি আব খাড়া খে'য়ে খে'য়ে বিরক্ত না হ'লে কি কেউ কখনও 'নেহাৎ এক ঘেঁয়েমি" বুঝাতে "থোর-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়" বলতেন? বহুবার বহুলোক একের পর এক আপন শরীরের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটায়উৎকট যন্ত্রণা অনুভব করেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তারই ফলে এক তীব্র যন্ত্রণার উপর আর এক তীব্র যন্ত্রণা বুঝাতে গিয়ে টিপ্পনী কাটার ছলে "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" কথাটির তুলনা না দিলে কি কখনও কথাটি চালু হত? এমন করেই আমাদের প্রবাদগুলি তৈরি হয়েছে, হয়ে আসছে এবং হবেও।

তৈরির পর থেকে লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানোই এ-গুলোর স্বভাব, আর সুযোগ পেলেই, অপরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে মর্মবিদ্ধ করাই হচ্ছে এসবের প্রধান কাজ। তাই বোধ হয়, এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোড়ামির ছাপ বহন করেও দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারে অপাংক্তেয় হ'য়ে থাকেনি। তাই এগুলোকে আমাদের ভব্য সাহিত্যের একটা বড় উপাদানরূপে দেখতে পাই। প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্য থেকে নিয়ে আধুনিকতম বাংলা-সাহিত্য অবধি দেশে ব্যবহৃত প্রবাদ ও প্রবচনের পোশাক ঠিক একরকম নয়। প্রাচীন প্রবাদ-প্রবচনগুলি বেশ সংক্ষিপ্ত, বাস্তবতা-ঘেঁষা, উপদেশপূর্ণ এবং পদবিন্যাস প্রণালীতে প্রাচীন ব'লে অনেকটা কটমট। এই ধরুন না "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" কিংবা "দায়ে বালি, কুড়ুলে শিল" সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচীনতম কালের কথা; 'গুরু মারা বিদ্যা' এবং "বোঝার ঘাড়ে বোঝা" জানিয়ে দিচ্ছে বেশ একটু পরবর্তী সময়ের কাহিনী; "খোদার উপর খোদকারী" অথবা "গরীবের ঘোড়া রোগ" নতুবা

'গোলে হরিবোল' স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে মুসলমান আমলের এবং "মাছিমরা কেরানী" কিংবা "লাট-সাহেব" বিজ্ঞাপিত করছে ইংরেজ শাসনের কথা।

লোকের মুখে মুখে যুগ-যুগান্ত ধ'রে ঘুড়লেও প্রবাদ প্রবচনগুলির রস আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এগুলি যেন রসের অফুরন্ত ফোয়ারা। এগুলির চমৎকারিত্বও যে কম তাও মনে হয় না, কেন না এগুলি তাদের নিজস্ব চটকটুকু আজও রক্ষা ক'রে এসেছে! এমন কি, আজও প্রবাদগুলি এদের নিজস্ব সত্যোৎসারিত কৌতুক, এবং বিশেষ করে তাদের জাঁকালো রসিকতাটুকু খুইয়ে দেয়নি! সত্যই, এগুলি যেন আমাদের পল্লীর লোকগুলোর মতো অফুরন্ত জীবনী-শক্তির অধিকারী, শত মড়কেও ম'রে সাবাড় হ'য়ে নিঃশেষ হতে চায় না।

"মন্ত্র-তন্ত্র" ও পল্লী-বচনের আর একটি বড় দিক। মন্ত্র-তন্ত্রে আমাদের অনেকের বিশ্বাস নেই, তা' আমি জানি। কিন্তু বিপদে পড়ে ঝাড়ফুঁক করতে দেখেছি অনেক শিক্ষিত লোককেও। প্রকৃত পক্ষে ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস আমাদের অনেকেরই মজ্জাগত এবং পল্লী-অঞ্চলে আজও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার চেয়ে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসাই হচ্ছে অধিক। আমাদের দেশের মন্ত্রের মধ্যে সাপের মন্ত্র, চোরের মন্ত্র ও রোগের মন্ত্র ছাড়া আরও কত রকমারি মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক যে রয়েছে, তার খবর দেওয়া সম্ভবপর নয়। এ-সব মন্ত্র ব্যবহারে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নেই। যারা এ কাজ করে, তাদেরকে আমরা সচরাচর "রোঝা" বা "ওঝা" বলেই পরিচয় দেই। এই "রোঝা বা ওঝা শব্দ হচ্ছে সংস্কৃত "উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ। রোঝাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নেই। মীর খোরস আলী কৃত একটি ছাপানো মন্ত্রের বই থেকে নমুনা-স্বরূপ আমি একটি সাপের মন্ত্র তুলে দিচ্ছি :

"হস্ত সারম, গলা সারম, আরো সারম, মুখ,
পেট, পিট, চরণ সারম, আরো সারম বুক।
পেট, পিট, চরণ গতি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ ওমুকের কি করিতে পারে॥

কাঙুরের কামিখ্যা দেবী দিয়া গেল বর।
বালির বিন্দ রাজা বলে অমুক হল অমর।।"

তন্ত্রের অন্তর্গত ব্যাপারের সংখ্যাও কি কম? আমাদের তান্ত্রিক বিশ্বাসের মধ্যে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, সম্মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, প্রভৃতি ষড়বিধ তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যতীত আরও কত রকমের অভিচার পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি বলা কঠিন। মাদুলি-ধারণ ও জলপড়া না হ'লে পল্লী অঞ্চলের অনেকেরই অবস্থা যে কি হ'ত, তা আজ কে বলবে? এ দুটিতে কোরান থেকে পুরাণ পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্র মন্ত্রের রূপ ধ'রে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। পীর সাহেবদের তাবিজ না হ'লে পল্লীর কত লোকের যে কত অঘটন ঘটে যেতো, তার সুমার করতে পারে এক মাত্র পল্লীবাসী।

আমাদের দেশে ছড়ার সংখ্যা যে কত, তা' আজও ঠিক হয়নি। আবার এই ছড়ার শ্রেণীতেও রকমারি জিনিসের সন্ধান পাচ্ছি---এই যেমন ধরুন 'ছেলে ভুলানো ছড়া,' ঘুমপাড়ানী ছড়া' 'ব্রতের ছড়া' 'পার্বণের ছড়া' আরও কত কি। আমাদের এই যে অসংখ্য ছড়া,---এগুলি এক একটা অদ্ভুদ সৃষ্টি;---ঠিক কবিতাও নয়, গানও নয়, পদ্যও বলা চলেনা, অথচ পদের মিল, শাব্দিক অনুপ্রাস, এমন কি অন্ত্যানুপ্রাস, কিছুরই অভাব নেই। নমুনা স্বরূপ নামজাদা একটা ছড়া তুলে দেখাচ্ছি:

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না না-খেয়ে বাপের বাড়ি যান।।'

ঘুম পাড়ানী-ছড়াগুলির অবস্থাও এই 'ছেলে-ভুলানো' ছড়ারই অনুরূপ। এগুলিকে 'ঘুমপাড়ানী-গান' ও বলা হয়। সত্যই এই ছড়াগুলিতে ঘুমপাড়াবার শক্তি আছে কি না জানি নে; তবে এই শ্রেণীর ছড়ার আবৃত্তি ক'রে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে দেখেছি বহু বার। এই ছড়াগুলির আবৃত্তির মধ্যে যে একটা সুর ধ্বনিত হয়, ছেলেকে ঘুম পাড়াবার যাদু বোধ হয় তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। নইলে ছেলের মা যখন বলেন,---

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী মোদের বাড়ি এসো।
খাট নাই, পালঙ্ নাই, খোকার চোখে বসো।।

বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো।
জাদুর চোখে ঘুম দিয়ে ফুরুৎ করে যেয়ো॥

তখন ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে কেন? ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী যে ছেলেকে ঘুম পাড়ায় না তা ঠিকই; সুরের মাদকতাই কাজ করে শিশুর মাসী-পিসী স্নেহের পরশের চেয়ে অধিক।

আমাদের দেশে ব্রতের ছড়াগুলি কেবল হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত। শিরাল, চুয়া, ভাদুলী, সেঁজুতি প্রভৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করে ব্রতের ছড়াগুলি রচিত ও আবৃত্ত হয়ে থাকে। এগুলি হিন্দু মেয়েদেরই দেবতা। বহু উদ্দেশ্য নিয়ে, অনেক অপূর্ণ বাসনার পূর্ণতা দান করার জন্য ছড়ার আবৃত্তি দ্বারা দেবতাদের পূজা হয়। সংস্কৃত মন্ত্র-তন্ত্রের ধার এরা বড় একটা ধারে না। বাংলা-ভাষার দ্বারাই এদের কাজ চলে যায়। 'থুয়া' দেবতার একটা ছড়া তুলে দিয়ে একটা উদাহরণ দিচ্ছি:---

"থু---থু থুযন্তি
আঘন মাসের জুয়ান্তি
অকালে ভাতন্তি
সকালে পুতন্তি
বনে বনে আয়তি
ধনে জনে সুয়তি
থুয়ো পূজো মোরা জন্মায়তি॥"

আমাদের এই যে রকমারি ছড়া, রবীন্দ্রনাথ এগুলোকে বলেছেন টুকরো জগৎ অথবা এক একটা আস্ত জগতের ভাঙ্গা টুকরো। এ-জগৎ কিন্তু ছবির জগৎ, চিন্তার জগৎ নয়। 'এই ছবিগুলি একটি রেখা, একটি কথার ছবি। ইঙ্গিত দিয়ে ছেড়ে দেওযাই এগুলির কাজ, বাকী কাজ কল্পনার।

পল্লী বচনের পরে 'পল্লী সঙ্গীতের' দিকেই নজর দিতে হয়। এ-গুলোকে "লোক সঙ্গীত বল্লেই বা ক্ষতি কি? আমাদের পল্লী অঞ্চলে কত রকমের লোক-সঙ্গীত যে রয়েছে, তার কোন লেখাজোখা নেই। আগে পল্লীর গোলায়-গোলায় ধান ছিল বলেই গলায়-গলায় গান ছিল। এখনকার

অবস্থা অন্যরূপ,—ধানের সাথে গানের শেষ। তা হ'লেও, পল্লীর এই ক্ষীয়মাণ সাংস্কৃতিক সম্পৎ এখনও নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি,—এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তাও অনন্ত। এখনও ভাবের গান, রসের গান, পীরের গান, প্রেমের গান, দেবতার গান, কবির গান, জাগার গান, শোকের গান, খুশির গান, কাজের গান, প্রভৃতি কত জাতীয় লোক-সঙ্গীত যে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে, কে তার খোঁজ রাখে? একমাত্র দীনেশ চন্দ্র সেন এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর-উদ্দিন ছাড়া আর কেউ আমাদের এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন কাজ করেন নি।

আমাদের 'ভাবের গান' নানা কারণে দেশে সুপরিচিত। তার মধ্যে সব চাইতে বড় কারণটি হ'ল, এ-জাতীয় গানগুলি আমাদের পল্লী-দার্শনিকতার একটা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। পরকালে গভীর বিশ্বাস ও তার জন্য রাতদিন ভাবনা চিন্তা, বিশেষ ক'রে সংসারের অনিত্যতায় বৈরাগ্য প্রভৃতি নানা চিন্তা দ্বারা আমাদের পল্লী গ্রামের 'ভাবের গান' গুলির সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয়েছে। এ সমস্ত গানের মধ্যে আমরা পাচ্ছি বাউল গান, মুর্শিদা গান, মারফতী গান, সাঁই গান, গুরুভজা গান, দেহতত্ত্ব বিষয়ক ও যোগ সাধনা-মূলক সঙ্গীত। এতগুলো নাম দেখে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই; কেননা সমস্ত গানের অন্তর্নিহিত ভাব এক;—কেবল 'আলম্বন' বা রসের অবতারণার জন্যে ব্যবহৃত আশ্রিত বস্তুটিই তফাৎ। এর ফলে গানগুলির প্রকাশভঙ্গিতেও ভাসা-ভাসা প্রভেদ দেখা দিয়েছে বটে, তবে তাতে ভাবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ শ্রেণীর ভাব ও ঢঙের' সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাবার জন্য ছোট একটা গান প্রথমেই উদ্ধৃত করছি। গোড়ায় এর কথাটি শুনে নিন।

উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার
নিহাইল্যা বাতাসে রে!
মুরশিদ রইলাম তোর আশে।
পশ্চিমে সাজিল মেঘরে, দ্যাওয়ায় দিল ডাক,
আমার ছিঁড়িল হাইলের পানস, নৌকায় খাইল পাক রে।
মুরশিদ রইলাম তোর আশে।
আগা বাইয়া উঠে ঢেউ রে, পাছা বাইয়া যায়,

আমার হিরালাল মানিকের বাড়া সোতে ভাইস্যা যায় রে।
মুরশিদ রইলাম তোর আশে।

এর নাম 'মুর্শিদা গান'; এর অন্তর্নিহিত ভাব হ'ল সংসার গাঙ্গে পল্লী-কবি তাঁর দৈহিক নৌকা নিয়ে আধ্যাত্মিক অবনতির প্রবল-ঝড়ে বিপন্ন ও বিব্রত। তাঁর ভয় হচ্ছে নৌকা প্রতি মুহূর্তেই বুঝি ঝড়ে তলিয়ে যায় অর্থাৎ আত্মিকশক্তি দৈহিক রিপুর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। এ আসন্ন বিপদে তিনি মারফৎ বা অধ্যাত্ম তত্ত্বের দীক্ষাদাতা মুরশিদ বা গুরুর শরণ নিচ্ছেন। এই মুরশিদের উপদেশই তাঁর একমাত্র ভরসা। মুরশিদের দরকার অদৃশ্য ও অবোধ্য সত্তা খোদার অনুভূতি ও উপলব্ধির জন্যেই। এরই জন্যে কবির এত ভাবনা-চিন্তা এত হতাশা, এত ব্যথা, এত কথা।

প্রকৃত পক্ষে এ অদৃশ্য ও অবোধ্য সত্তা খোদাই দেখা দিয়েছে কোন গানে 'অলখ-সাঁই' অলক্ষ্য স্বামিরূপে, কোন গানে 'আলেফ' বা আল্লারূপে, কোন গানে 'অচিন পাখিরূপে, আবার কোন গানেই বা 'মনের মানুষ' রূপে। এই অদৃশ্য বা অবোধ্য সত্তা পল্লীর মনে যখন দোলা দিয়ে যায়, তখন পল্লী আনমনে জন্ম দেয় কতকগুলি আপন ভোলা ভাব-বিহ্বল মরমী লোকের। তখন তারা বুক ভরা বেদনা নিয়ে বলে ফেলেন,

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম তাহার পায়।।"

মানবাত্মা পরমাত্মারই অংশ; তা কি ক'রে দেহের পিঞ্জরে আসে আর যায়, তাকে ধরবার এবং ধ'রে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার উপায়ই বা কি,---এসব জটিল প্রশ্নও পল্লীর লোকের মনে জাগে। তা ছাড়া আপন দেহের দুর্বোধ্য রহস্য, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করার কৌতূহল, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকৌশল, এমনতরো কত কি ভাব পল্লীর মরমী লোকগুলোর মনে আনাগোনা করে। তার ফলেই আজও আমাদের মধ্যে, এত দরবেশ, এত ফকীর, এত বাউল, এত সাঁই, এত গুরু ভজা, এত পীর-পোরস্ত দেখতে পাই। অদৃশ্য সত্তার অবোধ্য রহস্য কেমন করে পল্লীর মরমী লোকগুলোকে বিবাগী বানায় ও উদাসী সাজায়, গুরু-

ভজাদের একটা গান দিয়েই তার একটা নমুনা দিচ্ছি। গানটির কথা হ'ল এই ঃ---

"দিন গেলে আর মিছা গরব কর না,---
মন পাগল রে, গুরু ভজ না!
শুনরে অজ্ঞান মন, ভজ গুরুর শ্রীচরণ,
গুরু বিনে কে আছে আপন?
কিবা রঙ্গ সুখ রে, তরী সাজাইয়া রে।
তরী সাজাইয়া দেশে চল না,—
মন পাগল রে, গুরু ভজনা!
আসিয়া যমেরি দূতে, বাঁধবে তোরে পায়ে হাতে,
উচিত মত শাস্তি করবে গো---
সেই সময় রাখিবার বান্ধব নাই রে,--
মন পাগল রে, গুরু ভজ না।"

আমাদের-পল্লী-অঞ্চলে পীরেরও অভাব নেই, পীরের গানেরও সংখ্যা নেই। এ-সমস্ত পীর শুধু মুসলমানদের পূজো ও ভক্তি পে'য়ে সন্তুষ্ট নন, তাঁদের অনেকেই হিন্দুর শ্রদ্ধা, পূজা ও ভোগ লাভ ক'রে প্রায় দেবতা ব'নে গেছেন। এঁদের মধ্যে গাজী মিয়া, জিন্দাপীর, পাঁচপীর, শাহমাদার, মানিকপীর, সোনাপীর, সত্যপীর প্রভৃতির নাম করা যায়। এই পীরদের কোন-না-কোন ব্যক্তির মাহাত্ম্য বা প্রশংসা কীর্তন করতেই পীরের গানগুলি রচিত হয়েছে। সত্যপীর "সত্য নারায়ণ" রূপে পাঁচালী গানের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুর কাছে অধিক পরিচিত ও প্রিয়। পূর্ব বঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমান মাঝি নদীপথে পাড়ি দেওয়ার সময় আজ যতটা নয়, কিছুদিন আগেও তার চাইতে অনেক বেশি ক'রে গাইত---

"আমরা আছি পোলা পাইন,
গাজী আছে নিকাবাইন্।
শিরে গঙ্গা দরিয়া---
পাঁচ পীর বদর, বদর, বদর!"

জিন্দাপীর ত একান্তই অমর পুরুষ; তিনি হচ্ছেন মুসলমানদের চির পরিচিত 'খোয়াজ খিজির'। তা নইলে কখনও কি আমাদের

পল্লী কবিরা আমাদিগকে নির্দেশ দিতেন,---"যাও জিন্দাপীরের সন্ধানে, আবেহায়াতের মর্ম যে জানে?" আজও পল্লী অঞ্চলে তারই নামে "বেরা বা ভেলা ভাসিয়ে, লোক 'আব-ই-হায়াতের' মর্ম জানতে চায়; কেননা খোয়াজ খিজির বা খাজা-খিজির যে "খিজির" বা চির সবুজ হ'ল, সেত আব-ই-হায়াতের সন্ধান পেয়েই।

মাদার পীরের গান 'নলিয়া' বা 'নল্যাগান' ব'লে দেশে পরিচিত। উত্তর বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ ক'রে পাবনা-বগুড়ায় বসন্ত ও ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হ'লে, লোকে গান গেয়ে 'নল্যা' বা 'নলিয়া' ডাকে। একটা বাঁশ আর তার মাথায় চামর বেঁধে তাকে "মাদারের বাঁশ" ব'লে উল্লেখ করা হয়। এ 'নলিয়া গান' রোগ মুক্তির কামনায় রচিত এবং লৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গীত হ'য়ে থাকে। এ জাতীয় একটি ছোট গান এরূপ:

"ওরে হাতে মালা কাঁধে ঝোলা,
মরণের পথে দাঁড়াইছ মনরে, তোর গলে ফাঁসি।
দুই হস্তে মালা জইপত্যাছো,
নৌকার কথা কি ভাইব্যাছো?
এই নৌকায় ছ জনা কাণ্ডারী!
ইমাম হোসেন তার প্রহরী
নৌকার মাস্তল হজরত আলী রে,
বাদাম হল জিন্দা শা মাদারী।।

বাংলাদেশ বিশেষ ক'রে ঢাকা অঞ্চলে, 'গাজীর গীত, পল্লীর একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। বেশ ঘটা ক'রে, আসর জমিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গাজীর গানের পালা এখনও বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে কিছু কিছু অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। শা সেকান্দর এবং আরও কয়েক জন গাজী বা মুসলমান ধর্ম যোদ্ধার নাম এই গানগুলির সাথে জড়িয়ে আছে। এই গাজীদের যারা ভক্ত, তাঁদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যাও কম নয়। এই গানের শ্রোতা ও গায়ক দলে হিন্দু এবং মুসলমান দুই দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গেও মানিক পীরের প্রভাব যথেষ্ট। সেখানে হিন্দু মুসলমানের

মুখে "মানিকপীর। ভব-নদী যাইবার পার" গানটি বহুবার শুনেছি ব'লে মনে পড়ে। কলিকাতার মানিকতলায় মানিকপীর এখনও পুজিত হচ্ছেন। চট্টগ্রাম জেলার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সাধক শাহ আহমদুল্লাকে কেন্দ্র ক'রে তার জন্ম ও মৃত্যুস্থান 'মাইজ ভাণ্ডার' গ্রামে যে সকল গান রচিত হয়েছে ও হচ্ছে, পল্লীর আগাছার মতই তা অনন্ত।

'দেবতার গান' হিন্দুদের গান। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাবে অল্প-সল্প মুসলমানও যে এ গান লেখেনি বা গায়নি তা কি করেই বা বলি। মুসলমানের প্রভাবে হিন্দু যেমন পীরের পূজা করেছে ও গান বেঁধেছে তেমনিই হিন্দুর প্রভাবে অল্প-সল্প মুসলমানও দেবতার গান বেঁধেছে ও গেয়েছে। তাতে আশ্চর্য হবার মতো কিছুই নেই। তবে দেবতার গানই হিন্দুদের প্রকৃত সাংস্কৃতিক গান।

'দেবতার গানের' মধ্যে 'আগমনী' ও 'বিজয়া গান', 'শ্যামা সঙ্গীত' বা 'কালী কীর্তন', শাক্ত হিন্দুদেরই প্রিয় সঙ্গীত। 'শৈব সঙ্গীতের' সংখ্যাও কি কম? 'ধান ভান্‌তে শিবের গানের' কথা তো আমাদের মধ্যে একটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। 'পটুয়া সঙ্গীত' গুলোও শিবের গান। 'গাজন' আর 'গম্ভীরা গান'ও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তবে 'গম্ভীরায়' শিবকে লোকের দুঃখ-দৈন্য, অভাব অভিযোগের কথাই নিবেদন করা হয় এবং আর-আর শৈব গানগুলিতে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়ে থাকে,—এই টুকুনই যা তফাৎ।

এ কথা সত্য যে, এ-গানগুলি গ'ড়ে উঠেছে কোন-না-কোন দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে। তাই বলে দেবতাই এগুলির আসল বৈশিষ্ট্য নয়। এর আসল বৈশিষ্ট্য টুকুকে বোঝাতে গেলে যাদের কথা বল্‌ছি, তাদেরই ভঙ্গিতে বলতে হয়, এ সমস্ত গানে দেবতা হচ্ছে প্রতিমা মাত্র, আর এই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে পল্লী। পল্লীর সুখ-দুঃখ, পল্লীর রীতি-নীতি, পল্লীর আচার-ব্যবহার এ গানগুলিকে করেছে পল্লীর মতোই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। একটি 'ছোট্ট আগমনী-গান' উদ্ধৃত ক'রে এ মন্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিঃ—

গিরি,—এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাবনা।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়---
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।
দ্বিজ রাম প্রসাদে কয়,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়?
শিব শ্মশানে-মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না।

আমাদের পল্লী অঞ্চল কেবল পীর-ফকির আর দেবতা নিয়েই যে সন্তুষ্ট ছিল, আর কিছু ভাবেনি এমন ধারণা পোষণ করলে ভুল হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও পাড়া গাঁয়ের লোকেরা বাদ দেয়নি। বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে পল্লী অঞ্চলে যে-সব গান রচিত হয়েছে, তার মধ্যে পাচ্ছি মহীপালের গান, মাণিক চাঁদের গান, গোরক্ষ নাথের গান ও ময়নামতীর গান। মহীপাল ও মাণিক চাঁদ ছিলেন বাংলার পাল বংশীয় রাজা, উত্তর বঙ্গে তাঁদের বহু জনহিতকর কাজ রয়েছে। গোরক্ষনাথ বাংলার 'নাথ সম্প্রদায়' অর্থাৎ যোগীদের সিদ্ধ পুরুষ, আর ময়নামতী ছিলেন বাংলাদেশের রাজা গোবিন্দ্র চন্দ্রের মাতা। কুমিল্লার পাটিকারা নগরে তাঁর রাজধানী ছিল। গোবিন্দ্র চন্দ্র বুদ্ধদেবের মত সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত করেছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী, নাম ছিল অদুনা ও পদুনা। রাজার সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে অদুনা যে বিরহ-ব্যথা ব্যক্ত করেছিলেন, তার খানিকটা অংশ এইরূপ---

না যাইও, না যাইও, রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর।।
বান্ধিলাম বাংলা-ঘর না পড়িল কালি।
এমন বয়সে ছাড়িয়া যাও আমার বৃথা গাভুরালি।।
আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও,---
লইয়া যাও, লইয়া যাও, সঙ্গে করি লইয়া যাও।।
জীয়ব জীবন-ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।।
রান্ধিয়া বান্ধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে।
পিয়াস কালে মুখে দিমু পানি।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী।।
আইল পাথার দেখিলে কথা কহি যামু।

গেরস্থের বাড়ি গেলে গুরু-শ্যাম বলিমু ।।
শীতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালিশে হেলান পাও ।—
আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও ।।"

উত্তর বঙ্গের প্রিয় গান হ'ল জেগে থাকার গান বা 'জাগ্-গান'। রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় এই সমস্ত পল্লী-গানের লোকপ্রিয়তা অনেক কমে গেলেও, আজ অবধি লোপ পায়নি। পৌষমাসে ধান কাটার কর্ম্মমুখর দিনগুলির শেষে, শ্রান্ত দেহকে চাঙ্গা ক'রে তুলবার জন্য, রাত জেগে আনন্দ করতে গিয়ে, উত্তর বঙ্গের ধান-চাষীর মধ্যে এ-সমস্ত গান গীত হয়ে আস্ছে। সন্ধ্যার পরে আসর জমিয়ে একজন প্রথমে 'জাগ্' বলে, তার পর সকলে সমস্বরে চেচিয়ে জাগ্‌টিকে গায়,—এ হ'ল এর মোটামুটি নিয়ম। কৃষ্ণলীলা, চৈতন্য লীলা, পীর-লীলা—এমন কত কি বিষয় নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত এ গান চল্‌তে থাকে। রাত জে'গে গাওয়া হয় ব'লে এ-গুলোকে যে 'জাগ্-গান' বলে, তাতে সন্দেহ নেই।

পল্লীর "রসের গানে" মিল্‌ছে, 'বারাসে', 'ভাওইয়া,' 'ঝুঁমুর'; 'ঘাটু', 'বিরহ' ও 'মিলন' সঙ্গীতে। পল্লীর 'বারাসে' বা বারনাসিয়া নামক বারমাসী গানগুলি আমাদের আটঘাট বাঁধা পোশাকী সাহিত্যে প্রাচীনতম কাল থেকে স্থান পে'লেও পল্লী তার এই বিশিষ্ট সম্পৎটুকু আজও হারায় নি। বীরভূমের 'ঝুমুর' কি ক'রে বাংলাদেশে এল এবং মৈমনসিংহের 'ঘাটু' কি ক'রে ঝুমুরের মতো নাচ ও গানে প্রকাশ পেল, তার সন্ধানও কেউ রাখেনি।

আমাদের প্রাচীন পোশাকী-সাহিত্যের বারমাসী,—যেমন কবি কঙ্কণের ফুল্লরা বা দৌলত কাজীর সতীময়নার 'বারমাসী' প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিয়ে, পল্লীর বারমাসীগুলোর কথাই ভাবা যাক। এগুলোতে বর্ণনার বিষয় হ'ল বছরের বার মাসের প্রাকৃতিক পট-পরিবর্তনে ও ভোগ্যবস্তুর অবলম্বনে কোন বিরহিণীর বিরহ বেদনার প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এগুলোতে মূলগত ভাবের উৎস হচ্ছে আদি-রস। প্রধানত বিরহকে অবলম্বন করেই এই পল্লী গানগুলির আদি-রস করুণ মূর্তি ধ'রে শ্রোতার মনে ব্যথার উদ্রেক করে। তাই, আজও পল্লীর এ-গানগুলি এত লোকপ্রিয়। এরূপ একটি ছোট্ট বারমাসী

গানে পল্লী কবি যেমন দরদ দিয়ে বিরহিণীর চিত্র এঁকেছেন, তা সত্যিই দেখবার মতো ----

জ্যৈষ্ঠি-মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ়ে বরষার জল-
শাওন মাস কাটাইল নারী সায়রে, সায়রে,---
সায়রে আর সায়রে!
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা, আশ্বিন মাসে শশা মিঠা
কাতিক মাস কাটাইল নারী কাতরে, কাতরে,---
কাতরে আর কাতরে!
দারুণ পাষাণ বাঁইধাছে পতির মন বিদেশে, বিদেশে,
বিদেশে আর বিদেশে।
আঘন মাসে নওয়া খায়, পৌষ মাস কাটাইয়া যায়,
মাঘের শীত লাগল নারীর বুকেতে, বুকেতে,---
বুকেতে আর বুকেতে!
দারুণ পাষাণ বাঁইধাছে পতির মন বিদেশে, বিদেশে
বিদেশে আর বিদেশে!
ফাগুন মাসে নগুণ জ্বালা, চৈত্র মাসেতে শরীর কালা,
বৈশাখ মাসে কাটাইল নারী পিয়াসে, পিয়াসে,
পিয়াসে আর পিয়াসে!
দারুণ পাষাণ বাঁইধাছে পতির মন বিদেশে, বিদেশে,
বিদেশে আর বিদেশে!

এই 'বারমাসী'গুলিতে প্রকৃতি ও বিরহ যেমন ফুটেছে, তেমন প্রেম ফুটে উঠেছে মিলন-সঙ্গীতগুলিতে। এ জাতীয় গানগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে দেহের ক্ষুধাকে অবলম্বন করে পল্লীর প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার প্রয়াস। প্রেম-নিবেদনের এই প্রচেষ্টায় ছলা-কলার ছলা-টুকু না থাকলেও, কলাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার একটি চমৎকার উদাহরণ পাচ্ছি, পল্লীর এই প্রেম সঙ্গীতটিতে :---

"জল ভর, জল ভর কন্যা, জলে দিচ্ছ ঢেউ।
মাথা তুলে কও না কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।।
কেমন তোমার বাপ মাও কেমন তোমার হিয়া।
এহেন সুন্দর কন্যা না হইয়াছে বিয়া।।

পরের নারী দেইখ্যা সাধু এমন কেন কর।
ভরা কলস গলায় বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মর।।
কোথায় পাব কলস কন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও যমুনার জল, আমি ডুইব্যা মরি।।
বাবা দিল শীতল দীঘি সান-বাঁধা ঘাট তার।
আমি কন্যা চান করিব কিসের চৌকিদার।।

পল্লীতে শোকের গানেরও কোন লেখাজোখা নেই। যদি ইংরেজ কবির "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" 'আমাদের মর্মস্পর্শী সঙ্গীতগুলি করুণ রসেরই উৎসারণ।"—এই কথা সত্য হয় তবে বলতে হবে, পল্লীর শোকের গানগুলি সার্থক সৃষ্টি; কেননা এইগুলি আমাদের মর্মস্পর্শী করে। এ শ্রেণীর শোকের গানের মধ্যে 'ক্রন্দন-সঙ্গীত' ও 'জারি-গানের' নাম করা যায়। 'ক্রন্দন-সঙ্গীত'গুলিতে নারী জাতির একচেটিয়া অধিকার বল্লেও চলে। কোন-না-কোন রকমের শোকশেল বেঁধেনি, এমন নারী আমাদের নারী-প্রপীড়িত পল্লী-অঞ্চলে নেই ব'লে উল্লেখ করা যায়। শোকবহ ঘটনার পরে বিনিয়ে বিনিয়ে গলা ছেড়ে কথার-পর-কথা গেঁথে গান বেঁধে ফেলা, এদের মধ্যে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তার একটা নমুনা দিচ্ছি:—

কোন দেশেতে রইলা বন্ধুরে।
বিধাতার কলমের কালি, কাঁচা চুলে হইলাম রাঁড়ী
ও আমার মনে বলে জহর খেয়ে মরি রে!
কোন দেশেতে রইলা বন্ধুরে।
পতি আমার ওলা-ভোলা, তাড় ভঙ্গিয়া দিছলো বালা,
ও আমার নৎ ভাঙ্গিয়া দিছলো কণ্ঠিমালা রে!
কোন দেশেতে রইলা বন্ধুরে।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখি হইয়া উইড়া যাইত,
ও মুই উড়ি যাইয়া পড়িতাম বন্ধুর গায়েরে!
কোন দেশেতে রইলা বন্ধুরে।
বন্ধু আমার তিলক-চান, তিল কাটাইয়া ফুটাইল ধান,
ও আমার সেও ধান হইয়া গেল শুঁটিরে!
কোন দেশেতে রইলা বন্ধুরে।

জারিগান বাংলাদেশের সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গের রাজশাহীতেও এই গান শুনেছি। উত্তর ভারতের মর্সিয়া এবং বাংলাদেশের 'জারি' ভাষায় পৃথক হলেও, ভাবে, প্রকাশে ও বিষয়বস্তুতে প্রায় এক। মহরমের সময় কারবালার করুণ কাহিনীকে অবলম্বন করেই 'জারি'-গান বাঁধা হয়। তখন লোকজন দলবদ্ধ হ'য়ে এই গান গেয়ে থাকে। এ সময় যখন সমবেত জনতার মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ও স্বরভঙ্গী সহকারে "এজিদরে দাসীর নন্দন! এবার যাবি কই? মোহাম্মদ হানিফা আইল বহুত সৈন্য লই"-এর মত ধুয়াগুলি গাওয়া হয় তখনকার দৃশ্যটি দেখবার মতো ও সুরটি শুনবার মতো। বাস্তবিকই, এই পল্লীর গানগুলিতে অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে যে-সকল করুণ বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে পল্লীর আর কোন গানে তেমন হয়নি।

'কাজের গান' বা কর্ম সঙ্গীতের সংখ্যাও পল্লী-অঞ্চলে খুব কম নয়। সেখানে অধিকাংশ লোককে খে'টে খে'তে হয় এবং মাঠে মাঠে একা একা বা সমবেত ভাবে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। আনন্দের সাথে শ্রমজনক কাজ সমাধা করবার জন্যই কাজের গান বা কর্ম-সঙ্গীত গীত হ'য়ে থাকে। পল্লীর কর্মরত লোকগুলোর শ্রমবিনোদক গান ব'লে হয়ত এগুলির আবশ্যকতা কম নয়। তাই ব'লে তার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই তা বলা চলে না। আনন্দ পরিবেশনই যদি সাহিত্যের একটা বড় উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে আলোচ্য কর্ম-সঙ্গীতগুলোর সাথে পল্লীর অন্য সঙ্গীতের কোন তুলনা করাই চলে না। কেননা পল্লীর অন্য সঙ্গীতগুলো হচ্ছে এখানকার মানুষের বিলাসের সামগ্রী, তাদের সুসময়ের বন্ধু 'কাজের গান' বা কর্ম-সঙ্গীতগুলো তাদের দুঃখের দিনের সাথী, দুঃসময়ের বান্ধব।

এ সমস্ত গানের মধ্যে সারিগান, ছাদ পেটার গান, ধান রোপার গান, ভাটিয়ালি গানই প্রধান। এগুলোর অধিকাংশই শৃঙ্গার-রসপ্রধান হ'য়ে থাকে। শৃঙ্গার রস মানুষের আদিরস। শ্রম-বিনোদনের জন্যে হয়ত বা এ রসের আবশ্যকতা একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। তবু, অন্য রস-প্রধান-গান যে নেই তা নয়। বাংলার নামজাদা ব্রতচারী দলের দ্বারা বহুবিঘোষিত এই সারি গানটির কথাই ধরা যাক না—

"কাউয়া ধান খাইল রে—
খাইবার মানুষ আছে আমার কামের মানুষ নাইরে
কাউয়া ধান খাইল রে।"

ভরা বর্ষায় নৌকার বাইচ খেলার সময় কিংবা মাঠে ধান বপনের সময় যখন সকলের সমবেত চেষ্টা চলে, তখন সারি গান গেয়ে কর্মরত জনগণের শ্রান্ত দেহ ও ক্লান্ত মনকে চাঙ্গা করে রাখা হয় সত্য, তাতে অসংখ্য শ্রোতার চিত্তও যে আনন্দে পরিতৃপ্ত হয় না—এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। এই হিসাবে ঢাকা জেলার ছাদ পেটার গানও নিতান্তই সার্থক সারিগান।

এর সাথে সাথেই ভাটিয়ালি নামক সারি গানের কথা এসে পড়ে। "ভাটিয়ালী সুরেরই নাম—গানের নাম নয় এই সুর বাংলাদেশের নিজস্ব সুর। বাংলাদেশের ভাটিগাঙের আবেশ মাখা লীলায়িত কুল্ কুল্ ধ্বনির মধ্যেই এই সুরের জন্ম। প্রাণ-উদাস-করা এক অপার্থিব মোহিনী মায়াই এই সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের এই মদির সুর দেশে দেশে আনন্দ বিলিয়ে চলেছে; আজও তার সেই প্রাণ-প্রাচুর্যের অবসান ঘটেনি। এখনও ভাটিগাঙে তরঙ্গহীন নদীর বুকে কুলু-কুলু ধ্বনির স্রোতের মুখে নৌকা ছে'ড়ে দিয়ে, যখন মাঝি গলা ছে'ড়ে নদীর দুকূল ছাপিয়ে গান গেয়ে যায়, তখনই বোঝা যায় ভাটিয়ালি কি জিনিস। তার কথার সাথে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটাবার জন্য, কবি জসীমউদ্দীনের খ্যাতনামা ভাটিয়ালি গান "গহীন গাঙের নাইয়া" এখানে তুলে দিচ্ছি:—

"ও আমার গহীন গাঙের নাইয়া।
ও তুমি অফর বেলায় নাও বাইয়া যাওরে—
কার বা পানে চাইয়া।
(আরে আরে ও দরদী।)

ভাটির দেশের কাজল মায়ায়
পরাণডা মোর কাইন্দ্যা বেড়ায় রে—
আব্‌ছা মেঘে হাতছানি দ্যায়
কে জানি মোর সয়া॥

এই না গাঙের আগের বাঁকে আমার বঁধুর দেশ
কলাবনের বাউড়ী-বাতাস দোলায় মাথার কেশ।

কইও খবর তাহার লাইগ্যা
কাইন্দ্যা মরে এই আভাগা রে---
ও তার ব্যথায় দেয়া থাইকা থাইকা
ঝরে নয়ান বাইয়া ।।"

পল্লী-সঙ্গীতের পরে "পল্লী গাথা"র কথা বলতে হয়। এগুলি হচ্ছে গানে বর্ণিত কাহিনী। এই সঙ্গীতায়িত কাহিনীগুলির কথা বেশী কিছু আলোচনা না ক'রে এ বল্লেই যথেষ্ট হয় যে, 'পূর্ব-বঙ্গ-গীতিকা' ও মৈমনসিংহ গীতিকা, পরলোকগত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কল্যাণে আজ দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ও আদর লাভ করেছে। বহু পৌরাণিক, কাল্পনিক, ঐতিহাসিক ও মুসলিম কাহিনী অবলম্বন ক'রে এই গীতিকা বা গাথাগুলি রচিত হয়েছে। পল্লীর সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দ—সবই এই পল্লী গাথাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের এই যে বিরাট ও বিশাল পল্লী-সাহিত্য এর ঐতিহ্য একটা সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ঐতিহ্য অনেকটা বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ এবং এর ভিত্তিমূল নানান সাংস্কৃতিক উৎসের রসে সিঞ্চিত। আমরা এবার তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

আমাদের দেশের মূল সাংস্কৃতিক ভিত্তি কয়েকটি স্তরে গঠিত। অনার্য স্তরই হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম। আমাদের দেশ ছিল গোড়ায় দ্রাবিড়প্রধান। দ্রাবিড় ছাড়া আরও কয়েক জাতের অনার্য বাস করত আমাদের দেশে। এ-দেশের নাম যে 'বাংলা' তাও অনার্য 'বং' জাতি থেকেই। তখন উত্তর-বঙ্গে বাস করত অনার্য 'পুণ্ড্র' জাতি; আর তাদের আড্ডা ছিল বগুড়া জেলার অন্তর্গত 'মহাস্থানে',—যা'কে পরে বলা হয়েছিল 'পৌণ্ড্রবর্ধন'। এখানকার 'পোদ' বা 'পোদ' জাতি এই পুণ্ড্র জাতিরই অধস্তন বংশধর। অনার্যেরা আমাদের দেশ থেকে যে একেবারে বিদায় নেয়নি, তার নজীর খুঁজতে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না। আমাদের কৈবর্ত, চাঁড়াল, হাড়ি, ডোম, বাগদী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিগুলি এখনও অনার্যই। তবে, আর্যদের প্রচারণার ফলে পরিচয় দিচ্ছে হিন্দু বলে।

এই অনার্যেরা ছিল গাছ, বাঁশ, সাপ, বাঘ, পাথর ও ভূত প্রেতের পূজারী। নদী-নালায়, খাল-বিলে, পাহাড় পর্বতে তারা কল্পনা করেছে

অপদেবতার। এ-সমস্ত অনার্য-সংস্কৃতি আমাদের জন-সাধারণের লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে কিছু কিছু আছে, যেমন মাটির নীচে আছে জীবাশ্ম বা "ফসিল" (Fossil)। আমাদের পল্লী-সাহিত্যে এ-সমস্ত অনার্য সংস্কৃতির ভূরি-ভূরি নিদর্শন মিলে। আমরা যখন "ভূতের বেগার খাটি" অথবা "ভূতের বোঝা বহি" কিংবা যখন আমাদের "ঘাড়ে ভূত চাপে" বা আমাদেরকে "ভূতে পায়", তখন অজানিতে আমাদের পূর্বপুরুষ অনার্যদেরকেই স্মরণ করে থাকি।

আমাদের জ্ঞানী পুরুষ হ'ল "ডাক" আর "খনা"। ঐ-ঐ নামে কোন-লোক কোন দিন আমাদের দেশের মাটিতে জন্মেছিল ব'লে কেহ জানেন না। তবে এরা কারা? প্রাচীন গ্রীকদের 'ওরাকল্' (Oracle), আর প্রাচীন 'কেল্টিক' জাতির 'ড্রুইড' (Druid) সম্বন্ধে আমরা শুনেছি। তাদের কীর্তিকলাপও কিছু কিছু জানি। আমাদের দেশের অনার্য যুগে এদের ভাই বন্ধুরা এসে স্থান করে নিয়ে থাকবে 'ডাক' ও 'খনার' নামে। নইলে তাদের বচন আজও পল্লী-প্রজ্ঞার ভাস্কর্য হ'য়ে থাকবে কেন? আমাদের মন্ত্রতন্ত্রের মূল খুঁজলেও এখানে এসে পৌছুবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য তার সাথে আর্য-সংস্কৃতিও কিছু কিছু মিশে থাকবে। মন্ত্র-তন্ত্রের মূল উৎস ব'লে খ্যাত স্বয়ং অথর্ব-বেদটিও অনার্য প্রভাবে যে হয়নি, তাই বা কি ক'রে বলি।

আমাদের 'নলিয়া গানের' নল বা বংশ দণ্ড মাদার পীরের নামে তোলা হ'লেও, তাতে অনার্য বাঁশ পূজার অভিনব প্রকাশ যদি কেউ দেখে থাকেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? ব্রতের ছড়ার শিরল, খুয়া, লাউল, ভাদুলি, সেঁজুতি প্রভৃতি দেবতা, ভাসান-গানের মনসা, শীতলা পূজার শীতলা প্রভৃতিকে আর্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সুন্দরবনের বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় এবং কালু রায় আর্য-পোশাকে যে অনার্য দেবতা, তাতে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এরা শেষ পর্যন্ত কলিমা প'ড়ে তওবা ক'রে, "কালুগাজী-চম্পাবতী" নামক মুসলিম পুঁথিতে ধৃত পল্লী-গাতিকার "গাজী মিঞা" হ'য়ে যে দাঁড়ায় নি, তাই বা কি ক'রে বলি?

বল্‌তে কি, দেশ থেকে এখনও আমরা অনার্য-প্রভাব নির্মূল করতে পারিনি। আমাদের সমগ্র বাংলাদেশের কথা না হয় নাই বা বল্লাম। তথাপি, তাকে এদেশের মশরেকদের দল থেকে খারিজ করা যাবে কি?

ভাবছি আমাদের বগুড়ার "ড়া" কুড়িগ্রামের "কুড়ি", এবং পাবনার 'পাবনা"-টুকু ছাড়বার উপায় কি? নওয়াব গঞ্জের অন্তর্গত পোরশা থানার 'পেত্নীতলা' না হয় 'পত্নীতলা'-য় পরিবর্তিত হ'য়ে অনেকের মনে ভাবাবেশ এনে দেবে। কিন্তু তাতে তো অনার্য "পেত্নী" বা প্রেতিনীতে বিশ্বাস ছাড়ানো যাবে না। আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা প্রভৃতি "ডাঙ্গা"তে যে দ্রাবিড় জাত ঘুমিয়ে আছে, তাকে নিয়েই বা কি করা যায়? ফরিদপুরের "পাংসা" এবং ঢাকার 'টঙ্গী' বা কম কিসে? আমাদের 'কুঁড়ে' লোকগুলো থেকে এখনও কুড়েমি বশে দ্রাবিড় প্রভাব তো ছাড়াতেই পারে নি। তারা কুঁড়ে ঘরে বাস করে তারি পাশে রেখে দেয় আঁস্তা 'কুড়ে'। আমাদের 'ঝাড়ঝোপে' এখনও অনার্যেরা লুকিয়ে আছে ব'লে, আমাদের অনেকেই আজও 'কুড়ি' সংখ্যার অধিক গুন্‌তে শেখেনি। অবস্থা সত্যই এমন হয়ে পড়েছে যে, আমরা এখন আর 'ঝালে-ঝোলে', ঝিঙ্গা'-তরকারিতে কিংবা 'ঝিঙ্গা-শাল" চালের মধ্যে মোটেই অনার্য গন্ধ পাই নে।

অনার্যদের পরে এল পশ্চিম থেকে আর্যজাতি; নিয়ে এল সাথে ক'রে সংস্কৃতের মত একটা উন্নত ভাষা, দেব-দেবীর মত অদৃশ্য সত্তায় বিশ্বাস, আর সে-বিশ্বাসের রূপায়ণ স্বরূপ অসংখ্য মূর্তি ও অজস্র আচার-বিচার। উত্তর-ভারতে তারা অনার্যদেরকে নির্মূল করলে, আর বাংলায় পৌঁছে করলে জয়। এর মূলে আর যা কিছুই থাক, আর্যদের আত্মোৎকর্ষবোধ বা Superiority Complex-ই ছিল প্রকৃত রসায়ন। তাদের এই আত্মোকর্ষ বোধ অনার্যদের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি তারা এতে করে নিজেদের জন্যে নিয়ে এসেছিল খাল কে'টে কুমীর। প্রকৃত পক্ষে, এই বোধই আজও হিন্দুকে চূড়ান্ত রক্ষণশীল ক'রে রেখেছে।

আগের থেকে আর্যদের সাথে অনার্যদের আচার-বিচার, কাজ-কাম, বিশ্বাস-আশ্বাস একে একে অলক্ষিতে মিশে যাচ্ছিল। রক্তের সঙ্গে যে শাস্ত্রের বাঁধ ও শরীরের বর্ণ সীমা ডিঙ্গিয়ে রক্তের মিশ্রণ ক্বচিৎ কোথায়ও স্থাপিত হচ্ছিল না, তেমন নয়। বাংলায় এসে ভাল ক'রে জমল সেই মিলন; ফলে, পরাজিত-অনার্য বিজয়ী-আর্যদেরকে জয় করলে ধীরে, অতি ধীরে। অনার্যেরা হারাল তাদের আপন বুলি, আর আর্যরা হারাল তাদের নিজস্ব ভাষা। আর্যদের সংস্কৃত-ভাষা 'অপভ্রংশের' শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়েছিল আগেই। এবার

“অপভ্রংশ”-ও মরে ভূত হয়ে অনার্যদের জ্যান্ত ভূতের দলে মিশে গেল।—জন্ম নিল আর একটি অপভ্রষ্ট বুলি, উচ্চারণে, বাক্‌রীতিতে, প্রকাশ-ভঙ্গীতে, পদ-বিন্যাস-প্রণালীতে আর একটি সম্পূর্ণ নতুন ভাষা, যাকে আমরা আজকাল বলছি “বাংলা-ভাষা”—তারই পূর্বপুরুষ। অতীতের অন্ধ যবনিকার ছিদ্রপথে আমরা তার যা ঝাপ্‌সা চেহারা দেখতে পাচ্ছি, তা হচ্ছে এইরূপ :—

“অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড় অ ভুসুকু অহেরি।।
তিন নচ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী।।”

(অনুবাদ)

আপন মাংসের দ্বারাই হরিণ নিজে নিজের শত্রু।
ভুসুকু ব্যাধ ক্ষণকালের জন্যেও তাকে ছাড়ে না।।
হরিণ তৃণ ছোঁয় না, পানিও খায় না।
হরিণ ও হরিণীর বাস কোথায় জানি না।।

এর পর থেকেই, লোকের মুখে-মুখে, পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে, ঘরের আনাচে-কানাচে গানের রূপ ধ'রে, গাথার মূর্তি নিয়ে প্রবাদ-ছড়ার পোশাক প'রে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে ‘দেশী ভাষা’। ধীরে ধীরে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ ‘নামাবলী’ব মতো এর গায়ে উঠল ফুটে; আর এতদুভয়ের সুর-লহরী এর প্রাণে উঠল বে'জে। এবার ছড়ার রাজ্যে শিরল, থুয়া, লাউল, ভাদুলি অনার্য অপদেবতার পার্শ্বে এসে বসল আর্য-দেবতা লক্ষ্মী, শনি, সূর্য, আরও কত কি। লোকের কাছে কানু ছাড়া গীত থাক্‌ল না, গাথার দেবলীলা ছাড়া বুলি ফুটলনা। শিব, দুর্গা, রাধা জন্ম দিলেন গাজন, গম্ভীরা, পটুয়া, বিজয়া, আগমনী, ঝুমুর প্রভৃতি পল্লী-গানের, আর তার সুরের অর্থাৎ সঙ্গীতের কৃতিত্বটুকুও তার কাছে রইল না, কেড়ে নিলেন নারদ মুনি। মোট কথা, আমাদের পল্লীজীবনের প্রতিটি স্তরে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছাপ একে একে ফুটে উঠল, নির্মল আকাশে সান্ধ্য তারকার মতো স্পষ্টরূপে ও উজ্জ্বল দীপ্তিতে।

যদিও বিশাল বাংলার ভাষা এমন করেই হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আপন করে নিলে, তবুও তার বিশেষ কদর কেউ করলে না। হিন্দুদের আত্মোৎকর্ষবোধ বা আর্য অহমিকাই হ'ল তার কাল। এই বোধ বাংলা বুলির গায়ে অপমান সূচক "ভাষা" নামক একটি ছাপ বা লেবেল এঁটে দিলে,---ব্যবস্থা দেওয়া হল:---

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।

(অনুবাদ)

অষ্টাদশ পুরাণ ও রামের চরিত্র (অর্থাৎ রামায়ণ)
(বাংলা) ভাষায় মানুষ শুনিলে রৌবব-নরকে যায়।

এমন করেই মরা সংস্কৃতের ভূত আবার ফিরে এসে অনার্য অপদেবতার মতো জীবন্ত বাংলা-ভাষাকে আবিষ্ট করলে। বাংলা-ভাষার মনে ভয় দেখা দিলে; তার মনে জেগে উঠল আত্মাপকর্ষবোধ বা Inferiority complex। সে আপন ভোলা হ'য়ে ভাবলে, "তবে কি তাই?" ফলে, সেও বলতে শুরু করলে, "কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুনঘেঁষে এই তিন সর্বনেশে; বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস, বাংলা মহাভারতের রচয়িতা কাশীদাস এবং আর যারা ব্রাহ্মণ-ঘেঁষা, এই তিন শ্রেণীর লোক মানুষের সর্বনাশ সাধনকারী।" অগত্যা মুখচোরা হয়েই বাংলা-ভাষার দিন কাটতে লাগল, আর 'দিন-গত পাপক্ষয়' অবস্থায় তার জীবন বয়ে চল্‌ল অপরাধীর মতো পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে।

এমন সময় বিজয়ীর বেশে এলেন বাংলায় আর একটি জাত। তাঁরা ছিলেন গোত্রে আর্য; মাতৃভাষায় তুর্কী, পোশাকী ভাষায় ফারসী, আর ধর্মে মুসলিম। এবং যারা এদের আগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও ঢাকা বিভাগের নদীপথে দেশের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন ইসলাম, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন গোত্রে সেমীয়, ভাষায় আরবী ও ধর্মে মুসলিম। বাংলাদেশে উভয় দলের মিলন হ'ল,---রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে ধর্মীয় শক্তির সমন্বয় ঘটল। এই জন্যই, আজও বাংলাদেশে মুসলিমপ্রধান এবং ইসলামী শক্তিতে প্রবল।

বলা বাহুল্য প্রচারের মধ্যস্থতায়, শাসনসূত্রে, সামাজিক সংগ্রবে, শিক্ষা-দীক্ষায় আর-আর দেশের মতো বাংলা দেশকেও মুসলমানেরা অনেকখানি আপন ক'রে নিলেন। বাংলা-ভাষাকে মুক্তি দিলেন তাঁরা ব্রাহ্মণদের খপ্পর থেকে, টুটিয়ে দিলেন তাদের রৌরব-নরকের ভয়, দেখিয়ে দিলেন তাদেরকে বেহেশ্‌তের "মঞ্জিল-ই-মকসূদ" বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। বাংলা-ভাষার জীবনে শুরু হ'ল এক নূতন জীবনের নবীন অভিযান।

এমন করেই দেশে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। একেবারে আমূল। দেশের আশায়, দেশের ভাষায়, দেশের ধর্মে, কর্মে, বিদ্যায়, চিন্তায়, সাধনা ও আরাধনায়---এক কথায় একেবারে দেশের হাড়ে-মাংসে মিশে গেল ইসলাম। হিন্দু-বাংলার ভিত্তি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে গেল একটি মুসলিম বাংলা,---ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দায় উন্নত-মানসম্পন্ন বাংলা।

দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এই মুসলিম-বাংলার দান অপরিমেয়। আমাদের প্রতিবেশী পূজারী ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু ক'রে, বকসী, সিকদার, মজুমদার, রায়-চৌধুরী পর্যন্ত সকলেই মুসলিম বাংলার এই দান নীরবে গৌরবের সাথে ঘোষণা ক'রে বেড়াচ্ছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা "দত্তখান" ও গুণরাজখান থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর ফকীর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করছেন। আজও ভাষার এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম কাগজ, কলম, দোয়াত না হ'লে বাংলা লেখা যায় না, মুসলিম প্রভাব ছাড়া 'হিসাব-নিকাশ' চলে না, 'সেতার, 'তবলা', 'সারঙ্গ' প্রভৃতির সাথে 'ইমন', 'খাম্বাজ', 'দাদরা', 'শাহানা', 'কাফী', 'বাহার' প্রভৃতির সুরের মিল না ঘটলে গানের আসর অর্থাৎ বৈঠক জমে না।

আমরাই আজ এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী---হয় তো বা নেহাৎ অনুপযুক্ত। কিন্তু তার জন্য আফসোস কি---আমাদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, অতীতও যে গৌরবময়। আমরাইতো হিন্দু বাংলার জনগণকে "তুর্কী নাচন" নাচালাম। বিরাটত্বের বিস্ময় প্রকাশ করতে "এলাহি কারখানা" খুললাম, আর দুর্লভ বস্তুর সন্ধান দিতে গিয়ে "ডুমুরের ফুলের" সাথে "ঈদের চাঁদ"

মিলিয়ে দিলাম। আমাদের প্রেরণায় বাংলার গলায়-গলায় জাগল জারি, সারি, গাজী, মুর্শিদা, মারফতি প্রভৃতি গান, আর তার সাথে সাথে অঞ্চলে অঞ্চলে চঞ্চল জীবন রূপ নিলে সঙ্গীতায়িত কাহিনীতে অর্থাৎ গাথায়,—বীরগাথা, পীরগাথা, প্রেম গাথায়। “আল্লাহ, নবী, পাঁচ পীর, বদর, বদর”, আমরা তুলে দিয়েছি বাংলার মাঝির মুখে,—দান করেছি প্রতিবেশী হিন্দুকে “সত্যনারায়ণ”, আর মুসলমানকে “সত্যপীর” ; তার উপর “মানিক পীরকে” দিয়ে আমরাই করেছি বাংলার “মুশকিল আসান” আর বাঙালীর প্রাণে জাগিয়েছি তার গান।

এই ক’থা কটি মনে রে’খে আমাদের পল্লী-সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ হচ্ছে অনার্য, আর্য ও মুসলিম সংস্কৃতির সৃষ্টি। এর কোথাও এ তিন সংস্কৃতি মিশে একাকার হয়ে গেছে, আবার কোথায়ও বা মেশেনি, কোথায়ও বা পাশাপাশি বসে দর্শকের মনে অপরিসীম কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। মোটের উপর আমাদের পল্লী-সংস্কৃতি যে একটা বিচিত্র সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শাহ্ মুহম্মদ সগীর

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যে মুসলমানেরা বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার হইলেও, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তত দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দান যে বিদ্যমান ছিল, ইহাও বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। শাহ্ মুহম্মদ সগীর নামক এক মুসলিম কবির 'ইউসুফ-জলিখা' নামক একটি বাংলা কাব্যের আবিষ্কারের উপর এই ঐতিহাসিক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। এই কাব্যের রাজ-প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যায়, গৌড়ের সুলতান গিয়াসু-দ্-দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৬—১৪১০ খ্রীঃ) কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

ইউসুফ-জলিখার প্রণয়-কাহিনী অতি প্রাচীন। বাইবেল ও কুরআনে 'প্যারাবল' বা নৈতিক উপাখ্যান হিসাবে এই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই মূল কাহিনীকে পল্লবিত করিয়া ইরানের মহাকবি ফিরদৌসী (মৃত ১০২৫ খ্রীঃ) ও সুফী-কবি জামী (মৃত ১৪৯২ খৃঃ) কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ফেরদৌসীর 'ইউসুফ-জলিখা' একটি রমন্যাস বা রোমান্স, এবং জামীর 'ইউসুফ-জলিখা' একটি 'এলিগরিক্যাল এপিক' বা রূপক কাব্য। বিষয়-বস্তু বা অনুবাদগত দিক হইতে সগীরের কাব্যের সহিত কোন কাব্যের মিল নাই। তবে, সগীরের কাব্য ফিরদৌসীর কাব্যের ন্যায় রমন্যাস বটে। জামী তাঁহার পরবর্তী কবি; সুতরাং তাঁহার কথা উঠেই না। উহা হইতে অনুমিত হয় যে, পবিত্র কুরআন ও ফিরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম কিংবদন্তী ও স্বীয় সৃজনী প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই সগীর তাঁহার 'ইউসুফ-জলিখা' রচনা করিয়াছিলেন।

শাহ্ মুহম্মদ সগীরের জীবন-কথা জানা যায় না। কেননা, তাঁহার কাব্যে আত্মবিবরণী বলিতে সচরাচর যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহা নাই। তবে তাঁহার উপাধি দৃষ্টে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি 'দরবেশ' বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রামে ও একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিশেষত

তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় বিশিষ্ট শব্দ আজও চট্টগ্রামের উপভাষায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া অন্য প্রমাণের অভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী ছিলেন।

একমাত্র 'ইউসুফ-জলিখা' ব্যতীত সগীরের অন্য কোন কাব্য বা কবিতা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আলোচ্য কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা বেশ পরিণত রচনা। ভাষা প্রাচীন বটে, তবে কাঁচা হাতের লেখা নহে।

কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার আবহই ইহার প্রাণ। কাব্যখানি পাঠ করিতে গিয়া মনেও হয় না যে, ইহ কোন বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ। তিনি কিতাব-কোরান দেখিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন। অথচ, ইউসুফের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বনী-আমীনের সহিত মধুপুরীর (ভাওয়ালের অন্তর্গত মধুপুর কি?) গন্ধর্বরাজ-কন্যা বিধুপ্রভার বিবাহ-কাহিনী কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া সম্ভব নহে। ইহাতে মনে হয়, কাব্যখানি মুসলিম ও বঙ্গীয় কিংবদন্তী নির্ভর।

আল্লাহ্ ও রসূল, মাতাপিতা ও গুরুজন এবং রাজবন্দনান্তে 'ইউসুফ-জলিখা' কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। কাব্যবর্ণিত কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ:--

পশ্চিম দেশে তৈমুস নামে এক প্রবল-প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বহুদিন নিঃসন্তান থাকিয়া অনেক দান-ধর্ম করিবার পর এক কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যার নাম রাখা হইল 'জলিখা'। যথাকালে জলিখা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে যৌবনশ্রী ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। যে তাঁহাকে দেখিল, সে-ই ভাবিতে লাগিল---

কেশ বেশ সুভেস অলক বঙ্ক ফন্দি।
সুরপুরী হুরী কিবা হেরি কাম বন্দী।।
নহলী যৌবনী কন্যা সর্ব কলাজিত।
শরৎ-চন্দ্রিমা জেহ্ন নক্ষত্র-বেষ্টিত।।

এই সময়ে জলিখা একে একে তিন বৎসরে তিনবার এক সুপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্তা হইলেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট-ব্যক্তি মিসরাধিপতি আজিজ-মিসর। রাজা তৈমুস তাঁহার কন্যা জলিখাকে আজিজ-মিসরের

সহিত বিবাহ দিবার জন্য মিসরে দূত প্রেরণ করিলেন। দৌত্য সফল হইল; আজিজ-মিসর জলিখাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। জলিখা যথাসময়ে মিসরে প্রেরিতা হইলেন। তাঁহার সহিত আজিজ-মিসরের দেখা হইল। কিন্তু হায়! জলিখা দেখিলেন যে, এই আজিজ সেই 'আজিজ' নহে। অথচ ইহাকেই বিবাহ করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া, জলিখার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সখীগণকে ডাকিয়া করুণ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন:--

শুন শুন শুন সখি,
জার তরে হৈলুঁ দুখী,
প্রাণের সখি ল।
প্রথম স্বপ্নেত দেখি
হৃদয় অন্তরে কামহতা।
এ তিন বরিখ ধরি'
রজনী বসিয়া ঝুরি,
প্রাণের সখি ল।
বিরহ আনলে পুড়ি
কাহাত কহিমু এহি কথা॥
সে জন ন হয় এহি,
স্বপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,
প্রাণের সখি ল।
মোর তরে গেল কহি,
সেহি মোর পরমার্থ -বাণী।
দোসর স্বপ্নের কথা,
কহিতে মরম ব্যথা,---
প্রাণের সখি ল।
কহিল সে মোক কথা,
আকুল হইলুঁ তথা,
শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি॥

বিলাপ করিতে করিতে একদা জলিখা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মূর্ছিতা অবস্থায় আকাশবাণী হইল:-

উঠ উঠ অয়ি কন্যা তাপিত হৃদয়।
তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পুরিব নিশ্চয়॥
আজিজ-মিছির তোর নহে মনস্কাম।
সুখ-ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম॥
আজিজ-মিছির তোর পতি মাত্র লেখা।
তার যোগে হইবে তোর প্রভু সনে দেখা॥

এই দৈববাণী শুনিয়া জলিখা চৈতন্য লাভ করিলেন ও আশ্বস্ত হইলেন। যথাসময়ে শুভ বিবাহ সমাধা হইল; কিন্তু জলিখার সহিত আজিজ-মিসর দাম্পত্য জীবন যাপনে অসমর্থ হইলেন। ফলে অন্তঃপুরে জলিখা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

খেনে হেথা খেনে হোথা ভ্রমে চারিদিশ।
উঠি বসি গোঞাএ দিবস অহর্নিশ॥

এইরূপে ভবিষ্যতের আশায় ভাঙ্গা বুকে জলিখা তাঁহার বিরহবিধুর দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

কেনান দেশে এয়াকুব নামে এক নবী ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এয়াকুব নবীর দশ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ইউসুফ এবং অপরটির নাম বনী-আমীন বা ইবনে আমীন। ইউসুফ এমন সুপুরুষ ছিলেন যে, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া যে-কোন মানুষ সম্মোহিত হইয়া পড়িতেন। ফলে,—

ইয়াকুব নবীর ইছুফ জেহ্ন আখি।
সবক্ষণ ইছুফ নয়ানে থাকে পেখি॥

এয়াকুব নবীর বাসভবনে একটি ‘ধর্মতরু’ ছিল। তাঁহার এক এক পুত্রের জন্মকালে এই বৃক্ষে একটি করিয়া শাখা অঙ্কুরিত হইত। সন্তান বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাখাটিও বড় হইত এবং এয়াকুব নবী তাহা কাটিয়া যষ্টি বানাইয়া পুত্রকে দান করিতেন। যখন ইউসুফ জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন এই বৃক্ষে আর ডাল নির্গত হয় নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া এয়াকুব নবী আল্লাহর কাছে ইউসুফের জন্য একটি যষ্টি ভিক্ষা করিলেন। ফলে

বেহেস্ত হইতে এক 'আসা' বা যষ্টি নামিয়া আসিল। এয়াকুব নবী ইহা ইউসুফকে দান করিলেন, আর—

হেন 'আছা' দেখিয়া ইছুফ করগত।
সর্বলোকে কহিলেন্ত আছার মহত্ত্ব।।

ইহাতে ইউসুফের ভ্রাতৃগণ দেখিল যে, তিনি শুধু পিতার স্নেহ অত্যধিক মাত্রায় লাভ করিতেছেন এমন নহে, বরং বেহেস্তী 'আছা' প্রাপ্তিতেও সৌভাগ্যবান। সুতরাং, তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের ঈর্ষ্যা পোষণ করা স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গেল। এমন সময় একদিন ইউসুফ স্বপ্নে দেখিলেন,

'একাদশ নক্ষত্র আওর রবিশশী।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমিতলে পশি'।।

এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা তিনি পিতাকে কহিলেন। পিতা এই স্বপন কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে ইউসুফকে নিষেধ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, ইহাতে কোন ফল হইল না। কারণ—

নিভৃতে ইছুফ তরে করিলা নিষেধ।
দৈববলে কেহ তাক করিলেক ভেদ।।
এহি কথা ভাই সবে সকল শুনিল।
বিধির নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারিল।।

অতঃপর, ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইউসুফকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র চলিল। ঠিক হইল যে মৃগয়া করিবার ছলে ইউসুফকে বনে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে হইবে। ইউসুফ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগয়া করিতে বনে গমন করিলেন। বনে পৌছিলেই ষড়যন্ত্র অনুসারে ভ্রাতৃগণ ইউসুফের শরীর হইতে কাপড়-চোপড় খসাইয়া লইল এবং শেষে তাঁহাকে বনমধ্যে এক কূপে নিক্ষেপ করা হইল। কূপে পড়িবার সময় ইউসুফকে ফিরিশতারা ধরিয়া ফেলিলেন এবং বেহেস্ত হইতে একটি সুন্দর পাট আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি সেই পাট ধরিয়া কূপের মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন।

ইউসুফের বস্ত্র লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ সানন্দে বাড়ি ফিরিলেন।

এয়াকুব নবী পুত্রশোকে দিনযাপন করিতে লাগিলেন, 'মণিরু' নামে

মিসরে এক বণিক বাস করিতেন। তিনি এই সময়ে বহু বণিক ও লোকজন সঙ্গে লইয়া কেনান অভিমুখে বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন।

এহি সাধু পূর্বকালে স্বপ্ন দেখিছিল।
পূর্ণিমার শশী তার ঘরে প্রবেশিল।।

তিনি এই স্বপ্নের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বণিকগোষ্ঠী যখন সীমান্তে অবস্থিত অরণ্যটি অতিক্রম করিতেছিল, তখন তাঁহাদের মধ্যে পানীয়-জলের অভাব দেখা দিল। অদূরে এক জলপূর্ণ কূপের সন্ধান মিলল। সুদীর্ঘ রশিতে কলসী বাঁধিয়া পানি তুলিতে কূপমধ্যে ফেলা হইল। কি আশ্চর্য, কলসীতে বসিয়া জলের সহিত এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবক উঠিয়া আসিল। তাঁহাকে সাধুর নিকট আনা হইল। সাধু মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। এইবার তাঁহাকে বিনা বাণিজ্যে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভালো করিয়া ইউসুফের মুখ ঢাকিয়া দিয়া 'মণিরু' তাঁহার দলের শ্রেষ্ঠীবর্গকে আহারান্তে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

সকলেই আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় এয়াকুব নবীর দশ পুত্র, তখনও ইউসুফ কূপমধ্যে বাঁচিয়া আছেন কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আসিয়া শূন্য কূপ-দর্শনে ইউসুফের অনুসন্ধানে বাহির হইল এবং বণিকদের মধ্যে ইউসুফকে আবিষ্কার করিয়া বলিল যে, তাহাদের এই 'দুরাচারী দাস' তাহার অসৎকর্মের জন্য কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; দাসটিকে হয় অর্থ দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে, না হয় তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই আকস্মিক বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার অন্য কোন সহজ উপায় দেখিতে না পাইয়া,

সাধুবোলে, মোর ঠাঁই ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার।।
ভাই সবে বোলে জেই দেহ ত সত্বর।
আহ্মা হোন্তে দূর হউ দিক দিগন্তর।।

এইরূপে 'মণিরু' সাধু ইউসুফকে তাম্রমুদ্রায় (তামার ঢেপুয়ায়) ক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার অন্য কোন সওদা হইল না। তজ্জন্য তিনি দুঃখিতও হইলেন না।

দেশে পৌঁছিতেই 'মণিরু' দেখিতে পাইলেন দেশের সর্বত্র হট্টগোল শুরু হইয়া গিয়াছে। দূতমুখে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে, 'মণিরু' বিদেশ হইতে এক অপূর্ব দাস ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, এমন ক্রীতদাস জগতে দুর্লভ।

আজিজ-মিসরও এই কথা জানিতে পারিলেন। ইউসুফকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, আজিজ-মিসর এক বিশিষ্ট দিনে সভা ডাকিয়া রাজ্যময় এক আদেশ জারি করিলেন যে,---

জথ রূপবন্ত আছে নারী বা পুরুখ।
সুবেশ করিয়া আইস আমার সমুখ।।

চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। সকলেই যথাকালে আজিজ-মিসরের দরবারে উপস্থিত হইতে চলিল। সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হইয়া ইউসুফ ও 'মণিরু' সাধু রাজ সভায় উপস্থিত হইলে, ইউসুফকে বসিবার জন্য বহুমূল্য আসন দেওয়া হইল। ইউসুফকে এই আসনে সমাসীন দেখিয়া সকলের মনে প্রতীয়মান হইতে লাগিল ---

সিদ্ধ বিদ্যাধর রূপ জিনি তান তনু।
মানব-মুরতি ধ'রি মর্ত্যে আইল ভানু।।

জলিখাও রাজ-অন্তঃপুর হইতে তাঁহার ধাত্রী ও সখীগণকে সঙ্গে লইয়া ইউসুফকে দেখিবার জন্য উটের 'আম্বারী'তে আরোহণ করিয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইউসুফকে দেখিয়া তিনি মূর্ছিতা হইলেন 'আম্বারী' রাজ-অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেল। মূর্ছান্তে জলিখা ধাত্রীকে কহিলেন---

শুন ধাত্রি মোহর বচন।
এহি মোর হরিল জীবন।।
দেখাইল আপনাক মুখ।
দিলেক বিরহ মনে দুঃখ।।
অন্তরীক্ষে দিল দরশন।
সে অবধি পোড়ে মোর মন।।

ধাত্রী জলিখাকে প্রবোধ দান করিল। জলিখা ইউসুফকে ক্রয় করিবার জন্য দরবারে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,---

ইছুপ কিনিতে আইল জথ বণিজার।
জার স্নেহ মনে ভাত্র মূল্য করিবার॥

* * *

ডাকোয়ালে ডাকি বলে শুন সাধুগণ।
ইছুফ কিনিতে আইস জার জথ ধন॥

'মণিরু' সাধুর নিকট ক্রেতৃগণ ইউসুফের প্রকৃত মূল্য জানিতে চাহিলে, তাহাদিগকে জানানো হইল যে,—

তান যোগ্য মূল্য হএ কনক রতন।
মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন॥
সব সমতুল্য করি জুখিবেক সার।
কিনিবারে আইস এহি মূল্য হইল তার॥

এই ঘোষণার পর, ক্রয়েচ্ছু সাধুগণ নিরাশ হইলেন। এমন কি, এত অধিক মূল্যে ইউসুফকে কিনিবেন কিনা, আজিজ-মিসরও সেই সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জলিখা-আজিজ-মিসরের চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতৃদত্ত মণি-মাণিক্য দিয়া ওজন করিয়া ইউসুফকে কিনিবেন। তাঁহাকে যেন এই ক্রীতদাসটিকে কিনিবার সম্মতি দেওয়া হয়। আজিজের সম্মতিক্রমে জলিখা—

এক এক মাণিক্য মিছির মূল্য জান।
সেহি রত্ন আনি দিলা সাধু বিদ্যমান॥
ইছুফ জলিখা সঙ্গে রত্ন মণি মূল্য।
তথাপিহ ইছুফক নহে সমতুল্য॥

এতৎসত্ত্বেও 'মণিরু' সাধু ইউসুফকে আজিজের নিকট বিক্রয় করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। কারণ,

লোকে বোলে, মণিরু বড়হি ভাগ্যবন্ত।
ধনের ঈশ্বর হইল সাধু গুণবন্ত॥

'মণিরু' সাধু ইউসুফের পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে জলিখার আদেশক্রমে ষোড়শোপাচারে ইউসুফের সেবা চলিল।

এইভাবে জলিখা ইউসুফের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হইলেন। নানাবিধ ছলাকলায় ইউসুফকে ভুলাইবার প্রয়াস চলিল। কিন্তু, কিছুতেই

ইউসুফের আত্মসংযম টুটিল না। জলিখা তাঁহার ধাত্রীকে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকল কথা নিবেদন করিলেন ও তাহার নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রী জলিখাকে আশ্বস্ত করিল যে, ইউসুফের প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা জানাইয়া ইউসুফের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিবে। অতঃপর ধাত্রী তাহার দৌত্য সমাধা করিলে, ইউসুফ উত্তর দিলেন যে, আজিজ-মিসর 'পুত্রবাচ' দিয়া তাঁহাকে জলিখার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। অধিকন্তু—

মহীদেবী যেন গুরু-পত্নীর সমান।
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান॥
আজিজ বুলিল মোক তুহ্মি পুত্র ধর্ম।
পুত্র-ধর্ম ন হএ করিতে হেন কর্ম॥

ফলে ধাত্রী ব্যর্থ হইল। এইবার ইউসুফের নিকট জলিখা স্বয়ং আসিয়া প্রেম নিবেদন করিলেন। ইহাতেও ফলোদয় হইল না। জলিখা আবার তাঁহার ব্যর্থতার কথা ধাত্রীকে জানাইলেন। ধাত্রী বলিল, ।চিন্তিত হইবার কারণ নাই।—

হেন এক মন্দির রচিব সুরচিত।
জীবন নক্ষত্র পুরিআ সমুদিত॥
ইছুফ জলিখা কেলি চিত্রে লিখি আর।
অঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গম যে বিবিধ প্রকার॥
ইছুফে দেখিয়া সেই হৈব কামাতুর।
রতিসুখ কেলি রঙ্গে হৈব মতি ভোর॥

ধাত্রীর পরামর্শ অনুসারে জলিখা এই মন্দির নির্মাণ করাইলেন। ইহারই নাম 'সপ্তখণ্ড টঙ্গী'।

জলিখা অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হইয়া এই 'সপ্তখণ্ড' টঙ্গীতে গমন করিলেন। যথাসময়ে ইউসুফও তথায় নীত হইলেন। জলিখা ইউসুফকে যৌবন নিবেদন করিলেন। এবারও তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউসুফ পালাইয়া গিয়া জলিখার কাম-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। পলাইবার সময় ধরিতে গিয়ে জলিখা ইউসুফের পিঠের কাপড় ধরিয়া ফেলিলেন। ইউসুফ পালাইয়া গেলেন বটে, জলিখার হাতে তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া

থাকিয়া গেল। জলিখা মূর্ছিতা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন সখীগণের যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। চরম হতাশায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া জলিখা আজিজ-মিসরের নিকট ইউসুফের নামে নিজের সতীত্ব-নাশের অপবাদ দিলেন। ইউসুফের বিচার হইল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে অপবাদ অস্বীকার করিলেও লজ্জায় সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। ফলে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

কারাগারে আটক-কালে ইউসুফ এক 'অন্তরীক্ষ-বাণী' শুনিতে পাইলেন যে, জলিখা যখন তাঁহাকে অধর্ম-কার্যে প্রবৃত্ত করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন তাঁহার এক সখা পর্দার আড়ালে থাকিয়া তিন মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দোলনায় রাখিয়া ঘুম পাড়াইতে সচেষ্ট ছিল। শিশুটি সব কিছু দেখিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে সাক্ষ্য দিবে। এহেন 'অন্তরীক্ষ-বাণী' শ্রবণ করিয়া ইউসুফ তখনই আজিজ-মিসরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তিনি যে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, সে সম্বন্ধে এক সাক্ষী আছে এবং এই সাক্ষী হইতেছে জলিখার সখার তিন মাসের অবোধ শিশু। আজিজ-মিসরের আদেশে জলিখা কোলে করিয়া সেই শিশুকে লইয়া আসিলেন। আজিজ-মিসর শিশুকে প্রশ্ন করিলেন,---

শিশু বলে, মুঞি নহোঁ নবির চরিত।
কার তরে কার বাক্য ন কহি বিদিত।।
জাহার অগ্রত ভাগে বিদার বসন।
তার কথা মিথ্যা জান প্রলাপ বচন।।
জার পৃষ্ঠগত বস্ত্র বিদার প্রমাণ।
সে হি সত্যবাদী ধর্মশীল অনুমান।।

শিশুর এই কথা শুনিয়া আজিজ-মিসর দেখিলেন যে, ইউসুফের পৃষ্ঠের এবং জলিখার সম্মুখের বস্ত্র ছিন্ন। ইহাতে আজিজ জলিখাকে অনেক গঞ্জনা করিলেন বটে, কিন্তু ইউসুফকে উপদেশ দিলেন,

তোমার কর্তব্য কর্ম মুঞি ভাল জানোঁ।
তুমি মাত্র কার ঠাঁই ন কহিবা আন।।

এতৎসত্ত্বেও, জলিখার কেলেঙ্কারীর কথা গোপন রহিল না। তাহা মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে জলিখা বিচলিতা হইলেন।

কলঙ্ক মোচনের উপায় সম্বন্ধে ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে, দেশের যাবতীয় যুবতী নারীকে নিমন্ত্রণ দিয়া একত্র করিয়া, এই রমণী-সমাজে ইউসুফকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে। তখন তাহাদের সম্মুখেই ধাত্রী কুৎসা-চর্চা খণ্ডন করিবে। পরামর্শ অনুসারে কাজ করা হইল। দেশের যাবতীয় যুবতী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরে সমবেত হইলেন। তাহাদের জন্য নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য সরবরাহের আয়োজন করা হইল।

ভোজনান্তে ফলাহারের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া 'তরুঞ্জা' নামে পরিচিত সে-দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ফল এবং তাহা কাটিবার জন্য এক একখানা করিয়া 'খরশান কাতি' দেওয়া হইল। আহারের সুযোগ লইয়া যুবতীগণ বলিল, ইউসুফকে না দেখিলে তাহারা কিছুই খাইবে না।

অগত্যা---

জলিখা আদেশ কৈল এক সখী তরে।
ইছুফক কহ গিয়া আসউ সত্বরে।।

জলিখার অনুনয়ে ইউসুফ রমণীদের সভায় আগমন করিলেন। রমণীগণ তখন ফলাহার করিতেছিল। ইউসুফের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই রমণীরা---

দেখিলেন্ত পরতেক, কিবা এ স্বপন।
এক-দৃষ্টে নেহালন্ত পাসরি আপন।।
হাতেত তরুঞ্জা ফল, কাতি খরশান।
হস্ত সঙ্গে ফল কাটে, মনে নাহি জ্ঞান।।
কেহ ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কর, কিবা ফল, এক ন জানিল।।

হাস্য-পরিহাসচ্ছলে জলিখা রমণী-সমাজে বলিলেন যে, বহু ধন দিয়া এই ক্রীতদাসকে কিনিয়া কত আদর যত্ন করিয়াছি; কিছুতেই সে আমার বশ্যতা স্বীকার করিল না।

এইবার ইউসুফ নির্জন কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু জলিখার মনে শান্তি রহিল না। একদা তিনি আজিজ-মিসরের আদেশ লইয়া

নির্জন কারাগারে গমন করিয়া ইউসুফের নিকট কামবাসনা তৃপ্তির প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে জলিখার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি অনুচরগণকে আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন ইউসুফের শরীর হইতে ভাল বস্ত্র ও আভরণ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অতি সাধারণ পোশাকে সাজাইয়া দেন। জলিখার অনুচরেরা তাহাই করিল। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য বন্দীরা ইউসুফকে দাসের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল। ইউসুফের জন্য এদিকে জলিখা রাজ-প্রাসাদে বসিয়া প্রত্যহ বিলাপ করিতে লাগিলেন। একদা নিশীথে কারাকক্ষে ইউসুফের সহিত দেখা হইল। জলিখা তাঁহাকে মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। জলিখার মুখে তাহার মনোবেদনার কথা শুনিয়া ইউসুফও দুঃখিত হইলেন। এই সময় রজনী ভোর হইয়া আসিতেছিল। আর কারাগারে অবস্থান করা সংগত মনে না করিয়া জলিখা রাজ-অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন।

এইভাবে যখন জলিখার বিরহ-জীবনের আতপ্ত দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল, তখন একদিন হঠাৎ আজিজ-মিসরের মৃত্যু হইল। ইহাতে জলিখা আনন্দিত হইতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন।---

দুক্ষের উপরে দুক্ষ দিল বিধি তার।
হস্ত হোন্তে দূর গেল রাজ্য অধিকার॥

আজিজ-মিসরের মৃত্যুর পর পূর্ব নরপতি মিসরের রাজা হইলেন। তিনি তখন কঠোরভাবে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

এই সময় মিসর রাজ এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। পাত্র-মিত্র সকলকে ডাকিয়া এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হইল। কেহই স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিলনা। তখন এক রাজ-অনুচর রাজাকে কহিল যে, বন্দী ইউসুফ ব্যতীত আর কেহই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পরিবেন না। ইউসুফকে সসম্মানে রাজসভায় আনা হইল। রাজা তাঁহাকে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন:

সপ্ত বৃষ হৃষ্টপুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুবলিত॥
খীনবল সপ্ত বৃষ বলবন্ত হৈআ।
এহি সপ্ত বৃষ খাইতে গেল জে ধাইআ॥

জেহ্ন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিআ তাহাকে ধরিল।
অহি সপ্তপুষ্ট তনু বৃষক ভখিল।।
আর এক অপূর্ব দেখিলা নৃপবর।
সপ্ত ছড়া গোহম গাছাইল মাটিপর।।
ছবজা বর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন সুরিত।
জেহেন চামর দোলে অতি সুললিত।।
তাহার নিয়ড় হোন্তে আর সপ্ত ছড়া।
গাছাইল তেহেন বর্জিত জেহ্ন মড়া।।
সপ্ত ছড়া মরএ জলিল পূর্ণ ছড়া।
সেহি ক্ষণে শুকাইল জেহ্ন হৈল মরা।।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ইউসুফ বলিলেন,—

দেখিলা যে সপ্ত বৃষ পুষ্ট অঙ্গ তার।
সপ্তছড়া গোহম তণ্ডুল পূর্ণ আর।।
সেহি সপ্ত ছড়াতে সংযোগ হৈব কাল।
সপ্ত অব্দ পৃথিবী পুরিত শস্য ভাল।।
আর স্বপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুর্বলিত।
আর সপ্ত গোহম জে তণ্ডুল বর্জিত।।
সেহি সপ্ত বরিখ দুর্ভিক্ষ হৈব কাল।
জনশূন্য পৃথিবী শুকাইব খাল নাল।।

মিসর-রাজ তাঁহার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে "নৃপতি দেখন্ত আনে নিজ মন হিত"।

বলা বাহুল্য ইউসুফকে ইতঃপূর্বে কারামুক্ত করিয়া মহা সম্মানে রাজসভায় আনা হইয়াছিল এবং মিসর-রাজ দেশের মঙ্গল-চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল, সাতবৎসর দেশে যখন অসম্ভব ফসল ফলিবে, তখন দিন আনন্দেই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু, পরবর্তী সাত বৎসর যখন দুর্ভিক্ষ হইবে, তখন কিভাবে দেশকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে? তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে, 'মহামতি ইউসুফ সর্বজ্ঞ'। পাত্রমিত্রকে এই বিষয়ে

জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারাও ইউসুফের অতিমানবীয় প্রজ্ঞা সম্বন্ধে মিসর-রাজের সহিত একমত হইলেন। যথাকালে এক মহতী সভা আহূত হইল। তখন—

সভা সম্বোধিতা কহে মিছির ঈশ্বর।
শুন শুন মহাজন, আহ্মার উত্তর।।
বৃদ্ধ হৈলুঁ পৃথিবীত পুত্র নাহি মোর।
অনুদিন এহি চিন্তা করোঁ মতি ভোর।।
মনে মনে যুক্তি কল্পিতা কৈলুঁ সার।
ইছুফক দিমু এহি রাজ্য অধিকার।।

যেই কথা, সেই কাজ। মিসর-রাজ সানন্দ-চিত্তে সদ্যকারামুক্ত ইউসুফকে

আপনক ছত্র দিলা রত্ন সিংহাসন।
মাণিক্যরতন দিলা অঙ্গক ভূষণ।।

এইভাবে আজিজ-মিসর পদে একরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে ইউসুফ অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার নাম অচিরেই মিসরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। চারিদিকে 'ধন্য ধন্য'' পড়িয়া গেল।

এইবার ইউসুফ রাজ্য-শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, দেশে অপর্যাপ্ত শস্য ফলিয়াছে; এই শস্য জমা করিয়া রাখিতে হইবে, যেন আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় লোক অনাহারে মারা না যায়। তিনি প্রতি গ্রামে দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড শস্যাগার নির্মাণ করিয়া উপযুক্ত মূল্যে শস্য কিনিয়া তাহাতে জমা করিতে আদেশ দিলেন। ধীরে ধীরে সরকারী শস্যাগার ক্রীত শস্য-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে অপুত্রক মিসর-রাজের আয়ুর সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করিলে ইউসুফ মিসরের রাজপদ অলঙ্কৃত করিলেন।

মিসরে ইউসুফ সুবিচারের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বে লোকের কোন অভাব-অভিযোগ রহিল না। অথচ জলিখার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি তখন প্রায় উন্মাদ। এই সময়ে তাঁহার কাছে—

কেহ জদি ইছুফক কহন্তি বারতা।
জেহি মাঙ্গে-সেহি দেন্ত হইআ সম্মতা।।

সুতরাং অচিরেই জলিখা ফতুর হইয়া গেলেন। অর্থাভাববশত সমস্ত দাস-দাসী তাঁহাকে ত্যাগ করিল। এমন কি, মাতৃতুল্য ধাত্রীও তাঁহার মায়া কাটাইয়া পরলোকগামিনী হইল। শোকে দুঃখে জর্জরিত হইয়া তাঁহার অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি এক অতি সামান্যা 'নগরুয়া নারী' মাত্র। হায়, একদিন--

জার কেশ সৌরভ সমীব সমুদিত।
আউল বাউল অতি কুভেস চরিত।।
জার দন্ত বিজুত চমকিত ছুটফট।
দেখি দূর জাএ তার দশন বিকট।।
মিছিরের লোক সভে বিস্মরিল তারে।
বহুল বরিখ হৈল কোন্হে পুছে কারে।।

তথাপি, ইউসুফ যেই পথে যান, জলিখা সেই পথের পার্শ্বে "বাসা বাঁধিয়া" রাত্রদিন সেখানেই বসিয়া থাকেন। শেষে মর্মপীড়ায় জলিখার ধৈর্যে'র বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাস হারাইলেন এবং যে অদৃশ্য পরমেশ্বরকে ইউসুফ পূজা করেন, তৎপ্রতি আস্থা পরায়ণা হইয়া---

কান্দিআ পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ।
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মন-সুখ।।

আল্লাহতায়ালা এই রজনীতেই তাঁহার--তওবা কবুল করিয়া তাঁহার সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

প্রভাতে ইউসুফ নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। ইউসুফ যখন জলিখার 'বাসা-বাড়ির' পাশদিয়া যাইতেছিলেন, তখন সহসা ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, এক দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেছে। ভিখারিণীর কাতর আর্তনাদে ইউসুফের মন গলিয়া গেল। তিনি এক অনুচরকে আদেশ করিলেন যে, বৃদ্ধা যাহা চাহে তাহা যেন তাহাকে দেওয়া হয়; ইহার কোন ব্যত্যয় ঘটিলে তাহার কঠোর শাস্তি হইবে। এই অনুচরের সহায়তায় রাজ-প্রাসাদে ইউসুফেরী

সহিত জলিখার সাক্ষাৎ হইল। ইউসুফের প্রথম আশীর্বাদে দৃষ্টিহীনা জলিখা তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মতী হইলেন। তখন—

জলিখা বোলন্ত, শুন আজিজ স্বরূপ।
সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে আছিল জেহিরূপ॥
সেহি রূপ যৌবন মোর পুনি দেউ বিধি।
তাঁহার প্রাসাদে হউ মনোরথ সিদ্ধি॥

জলিখার এই প্রার্থনা শুনিয়া ইউসুফ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করিলেন। দেখিতে দেখিতে জলিখা তাঁহার পূর্ণ যৌবন ফিরিয়া পাইলেন। তারপর ইউসুফ জলিখাকে "পুছিলেন কহ আর কি আছে বাঞ্ছিত।" জলিখাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। এইবার শেষ বাসনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া—

কন্যা বলে, তোহ্মা পদ তলে মোর ছায়া।
নিশি গোঙাইতে চাহোঁ লুবুধিত কায়া॥
ডুবিলুঁ বিরহ সিন্দু ঢেউএ পোড়ে মন।
পদ অবলম্বে মোর রাখহ জীবন॥

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া ইউসুফের মাথা হেঁট হইয়া গেল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে ফেরেশতা অবতরণ করিয়া ইউসুফকে জানাইলেন যে, জলিখা ইউসুফের ধর্মপত্নী এবং তিনি যেন তাঁহাকে বিবাহ করেন। অন্তরীক্ষ-বাণী লাভ করিয়া ইউসুফ পাত্র-মিত্রকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিলেন। ইউসুফের সহিত জলিখার বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইল। নব দম্পতিরূপে বসবাস করিবার জন্য ইউসুফ-জলিখা অন্তঃপুরে এক সুরম্য টঙ্গী রচনা করিলেন; ইহার নাম রাখা হইল 'উদয়-মঙ্গল'। পরপর তাঁহাদের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

ইতোমধ্যে ইউসুফের রাজত্বের শস্যপূর্ণ প্রথম সাত বৎসর পূর্ণ হইয়া অষ্টম বৎসরে দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুর্ভিক্ষের প্রথম বৎসরে মিসরের লোক ধান্য বেচাকিনা করিয়া আত্মরক্ষা করিল; দ্বিতীয় বৎসরে মালমাত্তা বিক্রয় করিয়া প্রাণ বাঁচাইল; তৃতীয় বৎসরে কাহারও কাছে আহারের জন্য এক কণা শস্যও অবশিষ্ট রহিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া মিসরের লোক ইউসুফকে কহিল,—

ভক্ষ্য দিআ কিন আন্ধা পুত্র পরিজন।
দাস দাসী করিআ রাখহ প্রাণধন।।

ইউসুফ পূর্বসঞ্চিত শস্যভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইহাতে মিসরের লোক তাঁহার 'দাস-দাসী' তুল্য হইয়া গেল। ইউসুফ খোদার কাছে প্রার্থনা করিলেন।—

বৃদ্ধ নবী মোর বাপ আছে মহা দুঃখী।
মোহোর বিচ্ছেদে কান্দি হৈছে অন্ধ আঁখি।।
কৃপা কর তান মোর হউ দরশন।
অন্ধজন জেহ্ন পাউ ফিরিআ নয়ন।।

তখন আকাশ বাণী হইল, "হে ইউসুফ নিশ্চিন্ত হও, অবিলম্বে তোমার সহিত তোমার পিতার দেখা হইবে।" শাম রাজ্যের কেনান (কনয়ান) গ্রামে এয়াকুব নবী ও তাঁহার দশ পুত্র বাস করিতেন। শাম দেশও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। ফলে, এয়াকুব নবীর দশ পুত্র শস্যের অন্বেষণে মিসরে আসিল। ইউসুফ তাহাদের পরিচয় লইলেন ও নিজের পরিচয়টি গোপন করিয়া তাহাদিগকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন ও প্রচুর শস্য ও গোপনে তৎসহ শস্যের মূল্য ফেরত দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুদিন পরেই এয়াকুব নবীর পুত্রগণ তাহাদের কনিষ্ঠ ভাই বনী-আমীনকে সঙ্গে করিয়া আবার শস্য সংগ্রহ করিতে মিশরে গমন করিল। এইবার তাঁহারা রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ইউসুফের সহিত আহার করিল। এইখানেই একান্তে রাজ-অন্তঃপুরে বনী-আমীনের সহিত ইউসুফের পুনর্মিলন ঘটে।

ইউসুফ একটি 'পাখরিয়া অশ্ব' বৃদ্ধ নবীকে আনিবার জন্য দান করেন নবীর পুত্রগণ যথাসময়ে পিতাকে সঙ্গে লইয়া মিসরে রওয়ানা হইল। ইউসুফ মিসর-সীমান্তে আসিয়া পিতাকে অভ্যর্থনা দান করিলেন। সকলকে আদেশ দিলেন—

রথ হোন্তে লামহ জথ রথ রথিগণ।
পদে হাঁটি দেখি গিআ বাপের চরণ।।

চলিলেন্ত সৈন্য সব পদরথি হৈআ।
নৃপ সঙ্গে চলে সব আনন্দ পুরিআ।।

অনতিবিলম্বে পিতাপুত্র রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুচর দ্বারা জলিখার কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল-বিধান।
আইলা জলিখা বিবি সভা বিদ্যমান।।
সর্ব তনু বসনে ঢাকিয়া আঁখি মুখে।
নবীর-চরণ বন্দে মনে বাসি সুখে।।

নবী একে একে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। জলিখাকে পুত্রবধূ রূপে পাইয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। বনী-আমীন ও আসিয়া পিতার সহিত মিলিত হইলেন। ইউসুফের দশ ভাই এই সময়ে 'উদয়-মঙ্গল' টঙ্গীতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। পরম যত্নে আদর আপ্যায়ন করিয়া বনী-আমীনসহ পিতাকে এই টঙ্গীতে নেওয়া হইল। তথায়—এয়াকুব নবী তাঁহার দ্বাদশ পুত্র, দুই নাতি ও এক পুত্রবধূ লইয়া আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

ইউসুফ আবার রাজ্য-শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার বড় ভাইকে মুখ্যপাত্র করিলেন; অন্যান্য ভাইদিগকেও যথোপযুক্ত রাজকার্য দেওয়া হইল। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে কাহারও অভাব-অভিযোগ রহিল না। যখন—

হেন মতে সপ্তম বরিখ গঞি গেল।
রাজ্যের দুর্ভিক্ষ নাহি, শুভ দশা ভেল।।

দুর্ভিক্ষান্তে ধরিত্রী পুনরায় শস্যশ্যামলা হইল। মিসরেও আবার ফসল ফলিতে লাগিল। মিসর-রাজ্যে শান্তি সুখের অবধি রহিল না।

এই সময়ে একদিন ইউসুফ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তিনি যেই দিকে গমন করিলেন, সেই দিকই ভয়ে থরহরি কম্পিত হইয়া উঠিল। রাজ-রাজড়ারা ইউসুফের সহিত সকল বিবাদ এড়াইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া মনের আনন্দে তাঁহার সহিত চলিলেন। এইভাবে ইউসুফ দিগ্বিজয় করিয়া 'সুবর্ণপুর' (সোনারগাঁও কি?) পৌঁছিলেন। তথায় বিশ্রাম কালে

ইউসুফ একদিন প্রভাতে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। পথে এক বনে এক অপূর্ব জন্তু দৃষ্টিগোচর হইল। ইউসুফ জন্তুটিকে ধরিতে তৎপর প্রতি-অশ্বধাবন করিলেন। ঘোড়ায় চড়িয়া কিছু দূর গমন করিলে তিনি তথায় এক সুরম্যপুরী দেখিতে পাইলেন,

তার মধ্যে এক কন্যা রত্ন সিংহাসনে।
তান সম রূপ নাহি এ তিন ভুবনে॥

এই কন্যার নাম বিধুমতী বা বিধুপ্রভা। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহাকে এক নবীপুত্র স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহার মত রূপবান পুরুষ তিনি কখনো দেখেন নাই। বিধুপ্রভার উক্তি শুনিয়া—

ইছুফ বোলন্ত শুন রাজার নন্দিনী।
যার মুখে স্বপ্নে তুহ্মি দেখিলা আপনি॥
তাহান বৃত্তান্ত আহ্মি জানি ভাল মতে।
কহিব তোহ্মাতে আহ্মি সর্ব কথা তত্ত্বে॥
আমার কনিষ্ঠ ভাই ইবন্-আমিন।
জার লাগি মনস্তাব ভাবে রাত্রিদিন॥

এই কথা শুনিয়া বিধুপ্রভা ইউসুফের পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ইউসুফ অশ্বে ও বিধুপ্রভা রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন,

অবিলম্বে পাইল গিয়া সেহি মধুপুরী।
জিনিয়া অমরাপুর রাজার উয়ারী॥

মধুপুরীতে (ভাওয়ালের অন্তর্গত মধুপুর কি?) পৌঁছিয়াই বিধুমতী বিধুপ্রভা রথ হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃ-মাতৃ পদে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের কাছে নিবেদন করিলেন যে,

জার লাগি মনস্তাপ পাও রাত্রিদিনে।
তান জ্যৈষ্ঠ সহোদরে আসিছে আপনে॥

তখন গন্ধর্ব-রাজ শাহবাল সন্তুষ্ট চিত্তে ইউসুফকে বলিলেন,—

তোহ্মার অনুজ এবে আন শীঘ্র করি।
কুমারী বিবাহ-সজ্জা এথা আব্রি করি॥

বিধুপ্রভা তাহার স্বয়ম্বরের আয়োজন করিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। ফলে মধুপুরে স্বয়ম্বর-সভার উদ্যোগ চলিল। নানা দিগদেশ হইতে রাজরাজড়ারা এস্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য—

বেয়াল্লিশ-বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিত।
মধুপুরী মধ্যে জেহ্ন অমৃত পূরিত॥

অত্যল্পকাল মধ্যে সখী ও সহচরী-সংবেষ্টিতা হইয়া বিধুপ্রভা কুঞ্জর-গমনে স্বয়ম্বর-সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে পুষ্পমালা। চলিতে চলিতে তিনি বনী-আমীনের সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিতেই—

জয় জয় শব্দ হইল স্বয়ম্বর-পুর।
দোহানে দোহানে দেখি আনন্দঘন মোর॥
মুখরোল কৈল জথ গন্ধর্বের নারী।
দুহু জন বসাইল নিআ অন্তঃপুরী॥

নিশাভাগে বিধুপ্রভা ও বনী আমিন বাসর যাপন করিলেন। প্রভাতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বিধুপ্রভা বনী আমিনকে বলিলেন,—

আউল হইল কেশ মুকল কুন্তল।
কানড়ী কবরী বান্ধি দেঅ পুঽপদল॥

সাত-রাত্রি সাত দিন কাটিয়া গেল। গন্ধর্ব-রাজ শাহবাল সভা করিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,

পুত্র নাহি মোর ঘরে দিতে রাজ্য-ভার।
জামাতাক রাজ্য দিমু দেব-অধিকার॥

মধুপুরীতে বনী-আমীনের রাজ্যাভিষেক ক্রিআ সুসম্পন্ন করিয়া ইউসুফ মিসর দেশে ফিরিয়া গেলেন। মিসর যাত্রা কালে তিনি বনী-আমীনকে বলিলেন,—

তুহ্মি রহি থাক এথা রাজ্য অধিকার।
পশ্চাতে যাইবা তুহ্মি বাপ দেখিবার॥

যথাসময়ে বনী-আমীন ও বিধুপ্রভা গিয়া মিসরে উপস্থিত হইলেন। বধূবরণ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার শুরু হইল।

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া---

মহলা করিয়া তবে জলিখা সুন্দরী।
অন্তঃপুর মধ্যে কন্যা নিলা হস্তে ধরি।।
কন্যা সঙ্গে ইব্‌ন-আমিন মুখ দেখি।
ইছুফ জলিখা মনহৈল বহু সুখী।।
ইছুফ জলিখা বন্ধু-বান্ধব সংহতি।
সুখে নিবাস-এ হৈআ রাজ্য অধিপতি।।
মধুপুরী ইব্‌নে-আমিন অধিকার।
পরিচর্যা গন্ধবে করন্তি অনিবার।।

এইভাবে মিলনান্ত রূপ লইয়াই ইউসুফ-জলিখা কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই কাব্যের মূলে ঘটনার কোন কোন অংশের সহিত ফারসী-সাহিত্যের কোন কোন অংশের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাগত মিল দেখিতে পাওয়া গেলেও, কাব্যিক রূপায়ণ, গল্পের বন্ধন-পদ্ধতি অথবা ভাষা ও ভাবগত অনুবাদ প্রভৃতির দিক হইতে কোন ফারসী কাব্যের সহিত ইহার মিল নাই। অধিকন্তু সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে বাংলার আবহ পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান। বনী-আমীনের সহিত বিধুপ্রভার বিবাহই তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা কোনো ফারসী পুস্তকে নাই। কোন ফারসী পুস্তকে নাই, এমন আরও বহু বর্ণনা এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

নবাবী আমলের জনৈক মুসলমান কবি

যে বৎসর বঙ্গের হতভাগ্য নবাব সিরাজুদ্‌দৌলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পলাশীর ক্ষেত্রে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ঠিক সেই বৎসরে উত্তরবঙ্গে পল্লীর নিভৃত কুটীরে বসিয়া "হায়াৎ মাহমুদ" নামক একজন মুসলমান কবি আপন মনে কাব্যপ্রিয়ার অপরূপ রূপের সাধনায় বিভোর ছিলেন। সিরাজুদ্‌দৌলার পতনের সহিত বঙ্গের মুসলিম গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে; কিন্তু পল্লীর নিভৃত কুটীরে কাব্য-সাধকের সাধনা নিষ্ফল হয় নাই। প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বে উত্তর বঙ্গের পল্লী-কুঞ্জে বসিয়া যে-পাপিয়া আপন মনে গান গাহিয়াছিল, আজও তাহার মধুময় ঝঙ্কার বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার সেই ধ্বনি আমাদের নিকটও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার রসধারা উপলব্ধি করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

উত্তরবঙ্গীয় মুসলমানদের বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দূরীভূত হইয়াছে—মুস্‌লিম বঙ্গের সুপরিচিত লেখক জনাব মৌলবী মনসুরুদ্‌দীন্‌, এম, এ মহোদয়ের অক্লান্ত কর্মতৎপরতায়। বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সেবক হিসাবে তিনি বিশেষ পরিচিত। তাঁহারই সাধনায় উত্তরবঙ্গ হইতে কবি "হায়াৎ মাহমুদ" আবিষ্কৃত হইয়াছেন; এই আবিষ্কারের জন্য আমরা মৌলবী সাহেবের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার নিকট বর্তমান কবির দুইখানা কাব্য—(১) "আম্বিয়া-বাণী" ও (২) "হিতজ্ঞান-বাণী"—সংরক্ষিত আছে। এই পুঁথি দুইখানির মধ্যে "আম্বিয়া-বাণী" অবলম্বনে আমরা কবির বর্তমান পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

বর্তমান রংপুর জেলার "বাগদ্বার" পরগণার অন্তর্গত "ঝারবিসিলা" গ্রামে কবির বাস ছিল। তাঁহার বাসস্থানের অনতিদূরে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে

কবির মামার বাড়ি ছিল বলিয়া মনে হয় (১)। সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার নাম কবীর। এ-সম্বন্ধে কবির উক্তি হেঁয়ালিপূর্ণ। তিনি মাত্র একটি স্থানে লিখিয়াছেন, "হেয়াৎ মামুদে ভুনে কবির নন্দন।" এই "কবীর নন্দন" কথার অর্থ কি? তাঁহার পিতাও কবি ছিলেন বলিয়া কি তিনি নিজেকে "কবির নন্দন" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন? কিংবা তাঁহার পিতার "কবীর আহ্‌মদ্‌" বা "আহ্‌মদ কবীর" এইরূপ কোন নাম থাকায়, তিনি "কবির নন্দন" বলিয়া উল্লেখ করিলেন, বুঝিবার উপায় নাই।

কবির নিজ রচনা হইতে আমরা আর কোন বিশেষ পরিচয় পাই না। তবে তাঁহার পুঁথির লিপিকারক কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়,—কবি একজন খ্যাতনামা আলিম্‌ ছিলেন। আরবী, ফারসী, নাগরী, বাঙ্গালা প্রভৃতি কয়েক ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি একজন পারদর্শী বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার অমৃতময় সারগর্ভ বক্তৃতা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিত এবং মূর্খও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিত। ধর্ম-প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল (২)।

কবির জীবন-কাল নির্ণয়ে কোন অনুমানের আশ্রয় লওয়ার আবশ্যক হয় না। তাঁহার কাব্যে রচনা-কাল স্থান পাওয়ায়, এ-বিষয়ে আমরা একেবারেই নিঃসন্দেহ। এমন কি, এই রচনা-কালের ফলে, আমরা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই তাঁহার জন্মতারিখ সম্বন্ধেও জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে কবি আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"সন এগার স আর চৌসট্ট বছইরে।
রচিলু আম্বিয়া বানি এত সনান্তরে॥
একে সে অকাল আর বিসম জঞ্জাল
তথাপি রচিলাম জদি কেহ বোলে ভাল॥"

ইহা হইতে জানিতেছি,—বৃদ্ধ বয়সে কবি নানা সাংসারিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়াও ১১৬৪ বাঙ্গালা সনে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে "আম্বিয়াবাণী" রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কবি বৃদ্ধ; সুতরাং এখন যদি তাহার বয়স অন্যূন ৬০ বৎসর বলিয়াও ধরা হয়, তবে তিনি আনুমানিক ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবির "আম্বিয়া-বাণী" একখানি বিরাট গ্রন্থ। প্রায় ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৬ ইঞ্চি প্রস্থ তুলট কাগজে ১৩৪ পত্রে অর্থাৎ ২৬৮ পৃষ্ঠায় পুঁথিখানি সমাপ্ত। পুঁথিখানিকে আরও দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা কবির ছিল। কিন্তু বার্ধক্যের জন্য তাহা তিনি করিতে সমর্থ হয়েন নাই (৩)। শুধু বৈরাট্যের দিক হইতেই যে গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য তেমন নহে, ইহা অত্যন্ত উপাদেয়ও বটে।

(১) "মৌজে ঝাড় বিসিলায় আমার বসতি
পরগণে বাগদ্বার ঘোড়াঘাট খেতি॥"

(২) "হায়াৎ মুহামুদে ভুনে আম্বিয়ার বানি।।
আমী না কহিব পুঁথি কহিব নিসানি।।
মহা গুণবন্ত সেহ বিসেস অপার।
কহিব কতেক আমি মহিমা তাহার।।
আরবি, ফারছি, বাঙ্গলা নাগরি ইঞ্জিল।
পড়াতে মওলবি সেহ আছিল ফাজিল।।
কিতাবের জতো কথা বাঙ্গলা করি ভুনে।
বাঙ্গালি লোকেক বুঝাএ দিনের কারণে।।
গণ্ডার কতেক লোক আছিল বিস্তর।
নমাজ পড়াইল সবেক গুণের সাগর।।
ছাড়ায়া গণ্ডারি বুদ্ধি হদিস বুঝাএ।
এহি মতে কত লোক নছিহত পাএ।।
তাহার জোবান জেন অমৃতেব বাণী।
মুর্কে স্থনিলে গ্যানী হইত তখনী।।
কলিতে এমোন বেক্তি না জন্মিব আর।
হাজার ছালাম জানাই জোনাবে তাহার।।"
(শেষপত্র---আম্বিয়া-বাণী

(৩) "একে শেষকাল তাথে জঞ্জাল অপার।
কহিতে না পারি আমি একাধিক আর।।
যদি কাব ইচ্ছা হএ পড়ে আর স্থনে।
যে পারে কিতাব দেখি বিরচিয়া ভুনে॥

প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই কবি হায়াৎ মাহমুদ এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রেরণাজাত হইলেও কাব্যখানি বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, ধর্মই এ দেশের কাব্যের মূলে প্রাধানতঃ রস-সিঞ্চন করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, মনসা, চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল কাব্যমালা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ। সুতরাং হায়াৎ মাহমুদের আলোচ্য কাব্যখানি যদি ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য কবিকে দোষ দেওয়া চলে না। কবি কঙ্কণের চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যেমন ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াও প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তেমনই কবি হাযাৎ মামুদের "আম্বিয়া-বাণী" ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াও প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন। অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গীয় মুসলমানকে কাব্যের মধ্যদিয়া জানিতে হইলে, এই পুস্তক না পড়িয়া উপায় নাই।

"আম্বিয়া বাণীর" বিষয়-বস্তু লইয়া আলোচনা করিতে গেলে সর্বাগ্রে মনে পড়ে---ইহা ইসলাম শাস্ত্রীয় কাহিনীর রত্নখনি। সৃষ্টির আদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত মুহম্মদের জীবনকাল পর্যন্ত যে সকল ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমানদের কাহিনী যুগে যুগে সৃষ্টিপরায়ণ মানব-মনের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই বিরাট গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হজরত মুহম্মদের 'নূর" বা আদি আলোক সৃষ্টি, তাহার এক সামান্যতম অংশ দ্বারা পরে যাবতীয় সৃষ্টির সৃষ্টি, "আরশ্", "কুরশ্," "লুহ্", "কলম", "বেহেশ্ৎ" ও "দোজখ্" সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত আদম ও বিবি হাওয়ার সৃষ্টির ঘটনা পর্যন্ত যাবতীয় মুসলিম-বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট কাহিনী, ইহার প্রথমেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর "বেহেশত" হইতে আদম-হাওয়ার বহিষ্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর, যাবতীয় প্রসিদ্ধ নবীর জীবনীসংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনায় পুঁথিখানি পরিপূর্ণ। পুঁথির এই অংশে সু-প্রসিদ্ধ "কসসুল-আম্বিয়া" বা নবী-কাহিনী নামক মূল গ্রন্থের প্রভাব,—শুধু প্রভাব নয়, ছায়া পর্যন্ত সুস্পষ্ট। যে-সকল নবীর কাহিনী পুঁথির এই অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের নাম এইরূপ :---

(১) আদম্, (২) শীশ, (৩) ইদ্রিস্, (৪) নূহ, (৫) হুদ, (৬) সালিহ্, (৭) ইব্রাহিম্, (৮) ইস্মাঈল, (৯) ইস্হাক্, (১০) হজরত মুহম্মদ মুস্তফা।

এই নবীদের মধ্যে হজরত আদম, ইব্রাহিম্ খলীলুল্লাহ ও মুহম্মদ মুস্তফার জীবনসংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনাই অধিকভাবে পুথিটিতে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক নবীর উল্লেখ আছে।

"আম্বিয়া-বাণী" মৌলিক কাব্য না হইলেও, মৌলকতার মাধুর্যে মধুর, মৌলিক শোভায় শোভমান, ও মৌলিকতার গৌরবে গৌরবান্বিত। কবির সৃষ্টি-শক্তিই কাব্যখানিকে এই গৌরব দান করিয়াছে। তাঁহার এই শক্তি প্রতিভাপ্রদীপ্ত এক সর্বব্যাপিনী পরিকল্পনাকে উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই কল্পনা বিলাসে যথেচ্ছাচার নাই, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার এই কল্পনার মুর্তিকে সহজেই প্রশান্ত মহাসাগরের সৌম্য মূর্তির সহিত তুলনা করা যায়। মুসলিম ধর্ম ও সাহিত্যের বিশাল প্রান্তরে, যে-সকল উপাদান বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে কবি তাঁহার কল্পনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সংযত। তাঁহার এই কল্পনা-সংযম তাঁহাকে যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, কল্পনা-বিলাসে তাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বলিতে কি, কবির কল্পনা-বিলাস কল্পনা-সংযমে পর্যবসিত হওয়ায়, তাঁহার কাব্যের মাধুর্য কতদূর বর্ধিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-বর্গকে উপহার দিতে গিয়া, আমরা এই স্থলে কবির স্বর্গ-বর্ণনার কিয়দাংশ উৎকলিত করিলাম। অংশটি "শব্-ই-মে'রাজ" অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ কর্তৃক ঊর্ধ্বলোক-ভ্রমণের ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত।

হজরত মুহম্মদ মুস্তফা আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য "মি'রাজের" রাত্রে অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকযাত্রার রাত্রে "বোর্রাক" নামক স্বর্গীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া ঊর্ধ্বলোকে উড্ডীয়মান। এ-যাত্রায় তিনি সৃষ্টির যাবতীয় গুপ্ত বিষয় পরিদর্শনে ব্যস্ত। তিনি জিব্রাইল্ ফেরেশতাগণ মৃতনবী ও স্বর্গ নরক প্রভৃতি একে একে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সমস্তের কবিপ্রদত্ত পরিদর্শন বর্ণনা অর্থাৎ কবিপ্রদত্ত স্বর্গ পরিভ্রমণ এইরূপ:—

বিহিস্তের বয়ান

(ত্রিপদী ১২৮ পত্র)

ভিস্তের ভিতরে নবী,　　দেখিয়া বেড়ায় সবি,
বিবিধ প্রকার দেখে অতি ।
মুকুতা মাণিকে গড়ি,　　দেখে সব সারি সারি
জ্বলে যেন অগ্নির দীপতি ।।
লক্ষে লক্ষে দেখে টঙ্গি,　　সুশোভিত মহারঙ্গী,
নির্ম্মিয়াছে বিবিধ প্রকার ।
মুকুতা মাণিক তথি,　　য়্যাকুত, জমরুদ, মুতী,
রহিয়াছে বিচিত্র আকার ।।
রবির কিরণ যেন　　টঙ্গি সব জ্বলে হেন,
মধ্যে মধ্যে সবুজ সুন্দর ।।
লক্ষে লক্ষে পুষ্পদল,　　ফুটিয়াছে সর্ব্বস্থল,
বাস করে অতি মনোহর ।।
গুলাল, গোলাব, যূথি,　　আছে ফুল নানা জাতি,
আগর, আম্বর যাহে মোহে ।
সিমূল, কুসুম, ডানা (?)　　নরগেজ, কোর নানা
কস্তুরি চন্দন গজ মোহে ।।
বাগানের চারিভিত　　বহে নদী সুশোভিত
তার মাঝে দীপ্ত টঙ্গিঘর ।
টঙ্গিপ্রতি বহুদ্বার,　　লেখা নাহি ঝরকার
জড়িয়াছে রত্ন থরে থর ।।
সেহি ত টঙ্গির মাঝ,　　করিয়া সুবেশ সাজ,
বসিয়াছে হুরপরীগণ ।
পালঙ্কে বসিয়া খেলে,　　রবি যেন রূপে জ্বলে,
কটাক্ষে হরিছে জগমন ।।
রূপে রঙ্গে রতি যেন,　　ত্রিভুবনে নাহি তেন,
কে পারে উপমা দিতে তার ।
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার,　　রঙ্গে শোভে দীপ্তিকার
সুবাসিত শরীর সবার ।।

তরু মেওয়া লাখে লাখ, ধরিয়াছে শাখে শাখ
ভিস্তের ভিতরে সর্বস্থানে।
খোরমা, আঙ্গুর যত, আঞ্জির আনার কত,
নানা মেওয়া বিবিধ বিধানে ॥

পাকিয়া রহিছে শাখে, হুরগণ খায় তাকে,
যার ইচ্ছা যেমন যখন।
বেহেস্তে ন্যামৎ কত, যে চাহে সে পায় শত,
সুখে খায় যাহার যেমন ॥

বহে নদী মিষ্টধার, সুবাসতি জল তার,
সেহি পানি খায় নিরন্তর।
ভিস্তের অর্বুদ সাজ, দেখিয়া অপূর্ব কাজ,
আনন্দে পূরিল পয়গম্বর ॥

বলে হেন ভিস্তপুরী, যে পাইব পুণ্য করি,
ততোধিক ভাগ্য আছে কার।
জিব্রিল তাঁহারে কয়. "শুন নবী মহাশয়,
এ পাইব উম্মৎ তোমার ॥ (৪)

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে দেখা যায়,---এই অংশে কবির কল্পনা বিলাসের যে প্রচুর অবকাশ ছিল, তাহার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। আশ্চর্যের বিষয়, সর্বত্র তাঁহার কল্পনার লীলা সংযত হইলেও, এই সংযমের দ্বারা তাহা সংহত হয় নাই। এ কথা নিতান্তই সত্য যে, এই বর্ণনার মূল উপাদান (এইরূপ অপরাপর অংশের মূল উপাদানও) তাঁহার নিজস্ব নহে। কিন্তু বিশাল মুসলিম সাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, কবি যে ভাবে তাহার দ্বারা মাল্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শুধু বাঙ্গালী মুসলমানের নহে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর উপভোগ্য বস্তু।

---

(৪) স্বর্গের এই বর্ণনা এমনই চমৎকার যে, একটু পরিবর্তন করিয়া লইলেই অনায়াসে ইহাকে প্রাচীন মুসলিম কবির রচনার নিদর্শনরূপে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমরা বর্ণনাটিকে ইচ্ছা করিয়াই যথাসম্ভব আধুনিক বানানে লিখিয়া দিলাম।

কবি হায়াৎ মাহ্মুদ 'আম্বিয়া-বাণী'' প্রণয়নের যে-কারণ নির্দেশ করিয়াছেন (৫), তাহা পাঠ করিলে, কবিকে পুচ্ছগ্রাহিতার দোষে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়। ইহার পূর্বে মনে রাখিতে হইবে, মধ্যযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যে পুচ্ছগ্রাহিতার অভাব নাই। মাধবাচার্যের পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াও কবিকঙ্কণ বিখ্যাত। মনসা-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় যাবতীয় কবি পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট। সুতরাং পুচ্ছগ্রাহিতার দোষ দিয়া কবি হায়াৎ মাহমুদকে সাহিত্যের আসর হইতে বাদ দেওয়া চলে না। তিনি পূর্ব কবিদের পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াও স্বীয় কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন (১)। তাঁহার নিজের কথায়, তাঁহার এই কাব্যখানি এই নামীয় পূর্ব কবিদের কাব্য হইতে ছন্দ-সৌন্দর্যে, প্রামাণিকতায়, ভাষায় মাধুর্যে ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠ করিয়া রচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাকে এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যদিও কবি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদিগকে মূল কাহিনীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, তথাপি 'বাছাই করিয়া' লিখিতে গিয়া তিনিও অল্পবিস্তর সে-দোষে আক্রান্ত হইয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কবি একজন প্রসিদ্ধ "আলিম" ছিলেন। সুতরাং তাঁহার লিখনী হইতে ধর্ম ও তত্ত্ব কথা ব্যতীত অন্যবিধ রচনার আশা করা যায় না। এমন অবস্থায় তাঁহার ধর্ম সংক্রান্ত কাব্য

---

(১) "আদ্যের কাহিনী শুন আম্বিয়ার বাণী।
পদবন্ধে কহি আমি কিতাবে যে জানি।।

অন্য অন্য পূর্ব্বে লোকে কহিছে বিস্তর।
সুজটন নহে তার পদ সমশ্বর।

কিতাবের যত কথা সব নহে সহী।
ভাল মন্দ বিচারিয়া না কহিল রাবী।।

কত বাড়াইয়াছে কত করিয়াছে কম।
রচন সুন্দর নহে বচন উত্তম।।

তে কারণে লিখি আমি আদ্যর কাহিনি।
রচিলু এসব কথা করিয়া বাছনী।।

“আম্বিয়াবাণীর” মধ্যে আমরা যে-কবিত্বের নিদর্শন লাভ করি, তাহার মূল্য সামান্য নহে। কিন্তু তাঁহার “হিতজ্ঞান বাণী” নামক পুস্তকখানির সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। ইহা একখানি নৈতিক গ্রন্থ। নামই ইহার নৈতিক বিষয়-বস্তুর প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে। হিন্দুদিগের সংহিতার ন্যায় ইহাও একখানি মুস্‌লিম্ সংহিতা গ্রন্থ। সুতরাং সাহিত্যের আসরে ইহার স্থান যতটা নহে, ধর্মের ক্ষেত্রে ইহার মূল্য ততোধিক। তাই আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনার পক্ষপাতি নহি।

কবির “আম্বিয়া-বাণীর” একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহার বিস্তৃত সূচীপত্র। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে পৃথক করিয়া সূচীপত্র লেখার রীতি ছিল না। কোন কোন পুস্তকের গোড়ায় প্রসঙ্গ ক্রমে মূল-বিষয় বলিয়া রাখিবার প্রথা ছিল। কিন্তু বর্তমান পুস্তকে এমন বিস্তৃত পৃথক সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে যে কেবল সূচীপত্রটি পাঠ করিলেও পুস্তকের বিষয় অনেকটা জানিতে পারা যায়। স্থানাভাববশতঃ আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রাচীন আরবী ও ফারসী গ্রন্থে পৃথক ও বিস্তৃত সূচীপত্র দিবার ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবতঃ তাহারই অনুকরণে এই পুস্তকে পৃথক সূচীপত্র সংযোজিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, কবি হায়াৎ মাহমুদের কাছ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তাঁহার পূর্বে উত্তরবঙ্গে আরও মুসলমান কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ষোড়শ শতাব্দীতেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মুসলমানদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আজ (১৯৩০) পর্যন্ত কেহ উত্তরবঙ্গের এই অনাবিষ্কৃত কবির আবিষ্কারে যথোচিত যত্নবান হইলেন না। আমরা উত্তর বঙ্গের মুসলমানদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন জাতির এই ধ্বংসোন্মুখ সম্পদ রক্ষায় যত্নবান হন—প্রাচীন মুস্‌লিম্ কবিদের পুঁথি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। প্রাপ্ত পুঁথি দুষ্পাঠ্য হইলে আমরা আবিষ্কর্তৃগণকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের মুসলিম মহিলা কবি

মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্য বলিতে প্রধানতঃ কাব্য সাহিত্যই বুঝায়। সুতরাং, এই যুগে কবি না হইলে সাহিত্যিক হওয়া যাইত না। তখনকার দিনে পুরুষ-কবির সংখ্যা যেমন অগণ্য ছিল, মহিলা-কবির সংখ্যাও তেমন ছিল নগণ্য। চণ্ডীদাস-প্রেয়সী বলিয়া প্রসিদ্ধা রামী ধোবানী, রামায়ণ-প্রণেত্রী চন্দ্রাবতী এবং হরিলীলা প্রণেত্রী আনন্দময়ী ব্যতীত আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহিলা-কবির সন্ধান আজ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই।[১] মহিলারা যেন এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যে একরূপ অপাঙ্‌ক্তেয়া ছিলেন। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, এই সময়ে আমাদের দেশে বিদ্যাচর্চা প্রধানতঃ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মোটের উপর, মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে মহিলার অস্তিত্ব সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। এই উক্তি হিন্দুর পক্ষে যেমন সত্য, মুসলমানের পক্ষেও তেমনই খাঁটি। মধ্যযুগীয় মুস্‌লিম বাংলা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বহু কাল কাব্য-চর্চা করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন; কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মহিলা কখনও সাহিত্যসাধনা করিয়াছিলেন, এমন কোন নিদর্শন কাহারও চোখে পড়ে না। এযাবৎ আমরা হিন্দু-মুসলমানদের বহু পুথির পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, কিন্তু কোন মহিলা কোন কালে কোন পুঁথির অনুলেখিকা ছিলেন,—এমন প্রমাণও এই সেদিন পর্যন্ত পাই নাই। এমন অবস্থায় আমাদের মনে স্বাভাবিক কারণে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মুস্‌লিম রমণীরা অতীতে কোন দিন বাংলা-ভাষা বা বাংলা-সাহিত্য চর্চা করেন নাই।

সম্প্রতি, রহীমু'-ন্-নিসা (শ্রীমতি রহিমন্নিচা) নাম্নী এক মধ্যযুগীয় মুস্‌লিম মহিলা-কবির রচনা আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের পূর্ব-ধারণা পরি-

বর্তিত হইয়াছে সত্য, তবে এই সময়ের সাহিত্য-সাধকের মধ্যে তিনি যে ব্যতিক্রম মাত্র,---সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ এখনও অপনোদিত হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও, আমরা এই আবিষ্কারে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি যে, আমাদের বর্তমান জাতীয় জাগরণের দিনে বাংলা-সাহিত্যের ভাবী-গবেষকগণ যদি উৎসাহভরে দেশের চির-উপেক্ষিত পল্লী-কুটীরে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তবে অধিক সংখ্যায় না হইলেও, দুই চার জন প্রাচীন মুসলিম মহিলা কবির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা গবেষণাকাঙ্ক্ষী বাংলাদেশের তরুণদের ভাবী আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় উৎসুক রহিলাম।

আলোচ্য মহিলা-কবি রহীম-'ন্-নিসার (শ্রীমতি রহিমন্নিচার) কাব্যের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের কাহিনী তেমন কোন চমকপ্রদ ঘটনা নহে। বিগত ১৯৫৪ সালের শেষ দুই মাস হইতে ১৯৫৫ সালের শেষ মাস অবধি আমি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছিলাম। এই সময়ে "জাতির লুপ্তপ্রায় সম্পৎ উদ্ধার" সম্বন্ধে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের এক সভায় আমি বক্তৃতা দান করি। এই বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত দেশের প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের কথা বিশেষভাবে বলা হয় এবং আমি এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের জন্য শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধ করি। কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটি বাংলা প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে এই জেলার দৌলতপুর নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেবের ব্যক্তিগত চেষ্টায় সংগৃহীত "পদ্মাবতী" পুথির একখানি পাণ্ডুলিপি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনাব অধ্যাপক সাহেব এই পাণ্ডুলিপিখানি জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আমাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া দান করেন। আমি এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, ইহা রহীমু-'ন্-নিসা (শ্রীমতি রহিমন্নিচা) নাম্নী এক মহিলার দ্বারা অনুলিখিত। পাণ্ডুলিপির শেষে অনুলিখিকা ৪৮টি শ্লোকে তাঁহার স্বামী ও পিতার বংশ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা তাঁহার একটি চমৎকার "আত্মবিবরণী"। ইহা হইতে দেখা যায়, তিনি স্বামীর আদেশেই "পদ্মাবতীর" পাণ্ডুলিপিটি তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইরূপ :---

"শুন গুনিগণ, হই এক মন'
লেখিকার নিবেদন।

অক্ষর পড়িলে, টুটা পদ হৈলে,
শুধরিঅ সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট হেন মহাকষ্ট,
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি, বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভাবতী ॥
পদের উকতি, বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিলু গাঁথি ॥'

রহীমু-'ন্-নিসা যদি শুধু পুঁথির অনুলেখিকা হইতেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। তিনি যে একজন কবি ছিলেন, তাহার প্রমাণও তিনি এই বিবরণীতে রাখিয়া গিয়াছেন দেখিয়া মনে আপনা হইতেই ঔৎসুক্য জন্মিল। ফলে, পাণ্ডুলিপিটির সহিত যে কয়টি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ছিল তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া দেখিতে পাই, তাহাতে লেখিকার আরও দুইটি লেখা পাওয়া যাইতেছে। তাহার একটি 'বারমাসী'- অপরটি নামহীন খণ্ডিত আকারে প্রাপ্ত খণ্ড কাব্য। যথাস্থানে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচিত হইবে।

এই আত্মবিবরণী' কয়েকভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইহা অনুলেখিকার কবিত্বের পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ, ইহা তাহার আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ের সহায়ক; তৃতীয়তঃ, ইহা তাঁহাকে মধ্যযুগীয় মুস্‌লিম বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র মহিলা কবির মহাগৌরবময় আসন দান করিতেছে। চতুর্থতঃ, ইহা অনুলেখিকার সাধুতার একটি প্রধান প্রমাণ। এই শেষ উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। দেখা যায়, মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে অনেক অনুলেখক গ্রন্থের ভণিতায় মূল কবির নাম বাদ দিয়া নিজের নাম বসাইয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। ইহাতে এক জনের রচনা আর একজনের নামে চলিয়া যায়। ইহাকে মধ্যযুগের 'সাহিত্যিক জুয়াচুরি' বলিয়া অভিহিত করা চলে। স্থানে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থের ভণিতায় কবির নামের সহিত অনুলেখকের

নাম বসাইবার নিদর্শনও নিতান্ত দুর্লভ নহে। আবার এক এক স্থলে পুঁথির ভণিতায় শুধু কবির নাম এবং স্থলে স্থলে মূল কবির নাম বাদ দিয়া অনুলেখকের নাম জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে এইজাতীয় অসাধুতার প্রমাণ খুব কম নহে। কিন্তু, আলোচ্য 'পদ্মাবতীর' পাণ্ডুলিপির অনুলেখিকা রহীমু-'ন্-নিসা এমন কোন সাহিত্যিক অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়া-কহিয়াই পাণ্ডুলিপির শেষে 'আত্মবিবরণী'' যোগ করিয়াছেন। এই জাতীয় নানা কারণে, চিরত:র বিলুপ্তির হাত হইতে উদ্ধার করিবর জন্য অনুলেখিকা রহীমু-'ন্ নিসার ''আত্মবিবরণীর'' সবটুকুই এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলাম।

অনুলেখিকা রহীমু-'ন্-নিসা (শ্রীমতি রহিমন্নিচা) তাঁহার ''আত্মবিবরণীকে'' দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমভাগে 'লঘু-ত্রিপদীতে' রচিত চতুর্দশ শ্লোকে তিনি স্বামীর বংশ-পরিচয় দিয়াছেন; দ্বিতীয় ভাগে 'খর্বছন্দে' অর্থাৎ পয়ারে রচিত চৌত্রিশ শ্লোকে তিনি পিতৃকুলের পরিচয় দান করিয়াছেন কোন কুলবতী মহিলার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। নিম্নে আমরা তাঁহার এই বিবরণীর সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।:

স্বামিবংশের পরিচয়

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানার 'মেখল' গ্রামে মহিলা-কবি রহীমু-'ন্-নিসার (শ্রীমতি রহিমন্নিচা) শ্বশুরালয় ছিল। তাঁহার দাদা-শ্বশুরের নাম ঘুলাম হুসৈন (গোলাম হোচন)। এই গ্রামে তিনি একজন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ঘুলাম হুসৈনের পুত্র ও তাঁহার শ্বশুরের নাম জান আলী (শ্রীযুক্ত জান আলী)। ইনি তাঁহার পিতা ঘুলাম হুসৈন হইতেও অধিক খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে অনুলেখিকার স্বামী আহ্মদ্ 'আলীর (শ্রী আহমদ আলী) জন্ম। স্বামীর সম্বন্ধে রহীমু-'ন-নিসা (শ্রীমতি রহিমন্নিচা) 'মোর পতি রসরাজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যে শুধু 'রসিক-সমাজে' সুপরিচিত ছিলেন এমন নহে, 'ব্রত ধর্ম কাজ'-ও উপেক্ষা করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে সোনায় সোহাগার মিলন হইয়াছিল,—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কাব্য-রস-পিপাসু ছিলেন। বোধ

হয়, এই জন্যই রহীম-'ন্-নিসাকে তাঁহার স্বামী আহ্মদ 'আলী 'পদ্মাবতীর অনুলিখনে আদেশ করিয়াছিলেন। রহীমু-ন্-নিসা লিখিয়াছেন:

"জ্ঞানে ধীর অতি বলী, ছিরী আহমদ আলী
আজ্ঞা পাগ মস্তকে জড়াই।
মুই হীন অভাগিনী, রহিমন্নিচা সেবকিনী
লেখিলুম পঞ্চালি রচাই॥

('পদ্মাবতীর একস্থলে প্রদত্ত অনুলেখিকার রচনা)

বলাবাহুল্য চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল-গ্রামের জান 'আলী চৌধুরীদের বাড়ি একটি প্রাচীন অভিজাত ঘর। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক স্বচ্ছলতায় এখনও এই বাড়ির প্রাচীন প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। আলোচ্য মহিলা-কবি রহীমু-'ন্-নিসা যে এই জান 'আলী চৌধুরীর পুত্রবধূ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার দাম্পত্য-জীবন পরম সুখের ছিল। তেমনটি হইবারই কথা,—কেননা, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই দম্পতিতে কাব্যরসিক ও কাব্য-রসিকার মধুর মিলন ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের এই মধুর দাম্পত্য-জীবনে যেন কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মধুময় দাম্পত্য-জীবনের মধুরেণ সমাপ্তি ঘটে, তজ্জন্য রহীমু-'ন্-নিসা তাঁহার 'আত্মবিবরণীতে' কলাবিদ্গণের কাছে নিবেদন করিয়াছেন:

"গুণীদের পদ, করিএ ভকত,
কর মোরে আশীর্বাদ।
স্বামীর সঙ্গতি, থাকিতে পিরীতি,
না হোক যে বিসংবাদ॥
প্রভু করতারে, মুই অভাগীরে
করুণা রহে সতত।
আন ভাব মতি, নৌক আন পত,
না করৌক লজ্জাগত॥"

পিতৃকুলের পরিচয়

রহীমু-'ন্-নিসার পিতৃকুল চট্টগ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁহার দাদা অর্থাৎ পিতামহ বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মুঙ্গেরের অধিবাসী ছিলেন। মুঙ্গেরে ফিরিঙ্গী ইংরেজের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ বাধিলে:

অগ্রগামী হইয়া ইংরাজ যুদ্ধ দিল।
দৈবদশা ফিরিঙ্গীর বিজয় হইল॥
মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্ন ধন।
লুটিয়া করিল খয় যত পাপিগণ॥

রহীমু-’ন্-নিসার পিতামহও মুঙ্গেরে একজন মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ধনরত্ন ইংরেজ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার উপর ইংরেজদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিল। উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তিনি---

“অনেক লাঘবে নিজ জন্মভূমি ছাড়ি।
চট্টগ্রামে আসিয়া রহিলা বাস করি॥
পীর হৈয়া শিষ্য কৈলা কত কত গ্রাম।
প্রকাশ হইল তান যশ কৃতি নাম॥”

ইহা হইতে মনে হয়, মুঙ্গেরের রাজনৈতিক গোলযোগে রহীমু-’ন্-নিসার পিতামহ চট্টগ্রামে সপরিবারে হিজরৎ করিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। চট্টগ্রামে আসিয়া “জংলী শাহা”—এই ছদ্ম নামে তিনি পীরি-মুরীদী-কার্যে লিপ্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন। রাজরোষ হইতে রক্ষা পাইবার ইহা যে একটি উপযুক্ত পন্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জংলী শাহের একমাত্র পুত্রের নাম ‘আবদু-’ল কাদির (আবদুল কাদের শাহা)। তিনি রহীমু-’ন্-নিসার পিতা ছিলেন। দরবেশ বা আউলিয়া হইয়া তিনি পিতার অধ্যাত্ম-উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ‘শাহ’ উপাধি ধারণ করিয়া পৈতৃক পীরি-মুরীদী-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সম্বন্ধে রহীমু-’ন্-নিসা লিখিয়াছেন:

“গুণজ্ঞাত শুদ্ধমতি আওল ফকির।
ছুফী খান্দানেতে পীর আছিল সুধীর॥
করিল বহুল শিষ্য তত্ত্বজ্ঞান দিয়া।
সগৌরবে করে শিষ্য আপন চিনিয়া॥”

শাহ্ ‘আবদু-’ল-কাদিরের তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আবদু-’ল-জব্বার, মেঝো ছেলের নাম আবদু-’স-সত্তার, সেজো সন্তান হইলেন আলোচ্য মহিলা-কবি রহীমু-’ন্-নিসা এবং ন-ছেলের নাম আবদু-’ল্-ঘফুর। রহীমু-’ন্-নিসা তখন অবোধ বালিকা এবং

'আবদু-'ল-ঘফুর দুগ্ধপোষ্য, তখন শাহ্ 'আবদু-'ল্-কাদির পরলোকে গমন করেন। সুতরাং মায়ের হাতেই কন্যা রহীমু-'ন্-নিসার শিক্ষার ভার পড়িল। তাঁহার মাতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি কন্যার প্রাথমিক শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। রহীমু-'ন্-নিসা বলিতেছেন:

"অবোধ কালেতে মোর পিতা স্বর্গে বাস।
মুই হীন অভাগিনী হৈলুম নিরাশ।।
নারিলু করিতে সেবা পিতার চরণ।
মুই হীন অভাগিনী তাপিত জীবন।।
স্মরিতে পিতার শোক চির বিচলিত।
সুখ বিঘটিত মোর মিলিল কু-রীত।।
সে কারণে শাস্ত্র জ্ঞাতা না হইলু অতি।
কিঞ্চিৎ দর্শাইল পুঁথি মাতৃ গুণবতী।।
প্রভুভক্তা সতীত্ববতী জননী অনুপাম।
শ্রীমতী আলিমন্নিচা জান তান নাম।।"

অল্প বয়সে পিতৃহারা হইলেও, বিদুষী মায়ের কাছে রহীমু-'ন্-নিসা যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তোলে। অতঃপর, আবু-'ল-হুসৈন্ (আবুল হোচন) নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তির হাতে রহীমু-'ন্-নিসার উচচ-শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। এই ব্যক্তির সযত্ন অধ্যাপনায় অচিরেই তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি 'আত্মবিবরণীর' একস্থলে এই শিক্ষাগুরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

রহীমু-'ন্-নিসার দাম্পত্য-জীবন সুখের হইলেও, তাঁহার সমগ্র জীবন শোক-সন্তাপে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বালিকা-বয়সে পিতৃহারা কন্যা পিতার শোক ভুলিতে না ভুলিতেই, মধ্যম ভ্রাতা 'আবদু-'স্-সত্তার (আবদুল ছত্তার) অকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অমর-ধামে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর, তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বামী জগতের মায়া কাটাইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিলে, তিনি সর্ব 'আশাভ্রষ্ট হইয়া অনাথ' হইলেন। রমণীর পক্ষে এই নিদারুণ শোক ভুলিতে পারা কঠিন। তথাপি তিনি মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর কনিষ্ঠ

সহোদর 'আব্দু-'ল্-গফুর যখন পরলোক গমন করিলেন, তখন ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত ধাতব-পদার্থ ও বিগলিত আগ্নেয়-লাভার ন্যায় তাঁহার যুগান্ত-সঞ্চিত শোক "বারমাসীর" আকারে ভ্রাতৃ-বিলাপের রূপ ধরিয়া উৎসারিত হইল। যথাস্থানে এই "বারমাসী" সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

রহীমু-'ন্-নিসার আবির্ভাব-কাল

মহিলা-কবি রহীমু-'ন্-নিসার কোন রচনার তারিখ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি, তাঁহার 'আত্মবিবরণী' হইতে তাঁহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তাঁহার 'আত্মবিবরণীতে' মুঙ্গেরে মুসলমানদের সহিত ফিরিঙ্গি-ইংরেজের যুদ্ধের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজনৈতিক গোলযোগেই তাঁহার পিতামহ অর্থাৎ দাদা সপরিবারে মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া "জংলী শাহ্" নামে চট্টগ্রামে হিজরৎ করিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই রহীমু-'ন্-নিসার আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা যায়।

এই কথা কয়টি স্মরণ রাখিয়া ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, রহীমু-'ন্-নিসা কর্তৃক উল্লেখিত রাষ্ট্র-বিপ্লব বাংলা ও বিহারের শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসিমের রাজত্বকালে (১৭৬১-১৭৬৪) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মীর কাসিম নবাব হইয়াই ইংরেজের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিহার প্রদেশের মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া ইংরেজদের সহিত নবাব মীর কাসিমের যুদ্ধ বাধে। হতভাগ্য নবাব ঘেরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হইয়া ক্রোধে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীসহ সমস্ত ইংরেজ বন্দীকে মুঙ্গেরে হত্যা করিয়াছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে, বিজয়ী ইংরেজ মুঙ্গেরে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সমস্ত মুসলমানের ধন-প্রাণ বিপন্ন করিয়া এই শহরে ইংরেজ-হত্যার প্রতিশোধ লইয়া থাকিবেন। এই সময়েই "জংলী শাহ্" মুঙ্গের হইতে চট্টগ্রাম হিজরৎ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই রহীমু-'ন্-নিসা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কারণ, 'জংলী শাহ্'

হইতে রহীমু-'ন্-নিসার ব্যবধান মাত্র দেড় পুরুষ অর্থাৎ ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের চেয়েও কম।

রহীমু-ন্-নিসার রচনাবলী

রহীমু-'ন্-নিসার রচনা এযাবৎ অধিক সংখ্যায় আবিষ্কৃত হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও, উপযুক্ত অনুসন্ধান চলিলে তাঁহার কোন গ্রন্থ যে আবিষ্কৃত হইবে না,—এমন কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁহার রচনার মধ্যে 'আত্মবিবরণীর" কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা মোট ৪৮টি শ্লোকে দুই অংশে লিখিত। ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথাও আগে বলা হইয়াছে। এই "আত্মবিবরণীটি" যে রহীমু-'ন্-নিসার কবিত্বের পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু ইহা রমণী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিনয়-ভক্তি, মাধুর্য-স্নিগ্ধতায় পেলব, সুন্দর ও মেদুর। এই 'আত্মবিবরণীর' প্রথম অংশে শ্বশুর-বংশের বিবরণ এবং দ্বিতীয় অংশে পিতৃকুলের পরিচয় দান এবং দুই বর্ণনায় দুই ছন্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। লঘুত্রিপদীতে শ্বশুর-বংশের বর্ণনা স্বতঃস্ফূর্ত ও চঞ্চল এবং পয়ারে পিতৃপুরুষের বর্ণনা যেন গুরু-গম্ভীর। আমাদের দেশের কুলবধূরা পিতৃকুলের গৌরব ও শ্বশুর-বংশের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। "আত্মবিবরণীতে" তাহা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট।

রহীমু-'ন্-নিসার দ্বিতীয় রচনা একটি শোক-সঙ্গীত। ইহা সেই সময়কার কাব্যিক রেওয়াজ অনুসারে "বারমাসির"-র আধারে ঢালিয়া রচিত হইয়াছিল। কিরূপ মানসিক পরিবেশে কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'আব্দু-'ল্-মফুরের অকাল-মৃত্যুতে কবি এই শোক-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বলা হইযাছে। "বারমাসিতে ভ্রাতৃ-বিলাপ" বলিয়া আমরা ইহার নাম দিতে পারি। এই শোক-সঙ্গীতটি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে ২০ বিশটি শ্লোকে রচিত। আলোচনার পূর্বে কয়েক কারণে সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি।

বারমাসিতে ভ্রাতৃবিলাপ

[রহিমন্নিচা]

প্রণমিএ নিরঞ্জন,   মনে স্মরি গুরুজন,
বর্ণিতেছি দুক্ষের বাসর।
নিবেদিএ গুণিপাদ,   কর মোরে আশীর্বাদ,
দোভাব না হৌক মন মোর।। (১)
হীনমতি নেচাবর,   রহিমন্নিচা নাম মোর,
শুন গুণী হই এক মন।
মোর পরে করতার-   যত দিছে দুক্ষ ভার,
সে সকল না যায় কহন।। (২)
ফিরিল ভাগ্যের নিধি,   বিমন হইল বিধি,
আচম্বিতে শিরে বজ্রাঘাত।
পূর্ব জন্মে কৈলু পাপ,   সে দোষে ফলিল তাপ,
আশাভ্রষ্ট হৈলুম অনাথ।। (৩)
মিত্রের প্রাণের প্রাণ,   ভ্রাতৃ মোর রূপবান,
নাম জান আবদুল ছত্তার।
তান পরে জগপতি,   গৌরব হইয়া অতি,
পাপ হস্তে করিল নিস্তার।। (৪)
আহা ভাই গুণসিন্ধু,   রসিক জনের বন্ধু
জ্ঞানেগুরু প্রেমের ওখার।
তোমার কৃতির সীমা,   কি কহিমু সে উপমা,
ধীর স্থির সত্যবন্ত সার।- (৫)
মিত্রের প্রাণের প্রাণ,   ভ্রাতৃ মোর রূপবান,
নাম তার আবদুল গফুর।
আঘ্রানের পক্ষ দিন,   শুক্রবার শুভ চিন,
ভ্রাতৃ মোর গেল স্বর্গপুর।।(৬)
ফেলি মাও ভাই বোন,   ভ্রাতা মোর সুখ মন,
স্বর্গপুরে গেলা মনোরঙ্গ।
ভুরুযুগ অতি টান,   নয়ান কটাক্ষ সান,
স্বরগের হুর মনোভঙ্গ।। (৭)

ভাবে মগ্ন হই মতি,　　　প্রভু হস্তে মাগি গতি,
　　ভ্রাতৃ মোর লৈ গেল ধরিয়া।
পুষল মাসেতে দুখ,　　　কহিতে বিদরে বুক,
　　তোমা শোকে ফাটি যায় হিয়া ।। (৮)

পূরিলে নিবন্ধ আয়ু,　　　বন্ধন না হয় বায়ু,
　　সেই ছিদ্রে যমে দিল কোল।
দিবানিশি অভিপ্রায়,　　　কান্দ এ অভাগী মায়,
　　না শুনিয়া তোমা সুধা বোল ।। (৯)

মাঘল মাসেতে আল্লা,　　　মোরে নিদারুণ হৈলা,
　　ভাই রত্ন করিলা বঞ্চিত।
আছিলাম জোড়া ভাই,　　　বেজোড়ে করিলা ছাই-
　　হেন ছিল দৈব নিয়োজিত।। (১০)

ফাগুনে ফিরিল ঋত,　　　অস্থির মোহর চিত,
　　ভাই বিনে জগ আন্ধিয়ারি।
দুঃখের জননী তোর,　　　সমর্পিলা কার পর,
　　উদাসিনী হৈলা তোমা স্মরি ।। (১১)

চৈতেতে চাতকী ঘন-　　　তৃষিত হইয়া মন,
　　নীরদান মাগে প্রভুস্থান।
অনুজ অনুজা ত্যজি,　　　কার ভাবে গেলা মজি,
　　কেবা তোমা করে আশ্রা-দান।। (১২)

বৈশাখ মাসেতে সার,　　　ভাগ্যহীন নাই আর,
　　মোর সম হেন ত্রিভুবন।
শিশুকালে মৈল বাপ,　　　চিত্তে জলে সেই তাপ-
　　কাটা ঘায়ে যেহেন লবণ ।।(১৩)

জৈষ্ঠল মাসেতে মন,　　　দুনা হৈল উচাটন,
　　সুসম্পদ লাগএ কর্কশ।
আহা প্রাণাধিক ভাই,　　　কোথায় লুকিলা যাই,
　　কেবা তোমা করিল বিরস।। (১৪)

আষাঢ় যে পরবেশ,   শরীর বিন্ধিল কেশ,
তোমা শোকে বিবরএ প্রাণি।
মনে দুক্ষ পাইলে ভাই,   কাহাতে কহিবা যাই,
এহ লোকে তোমার জননী ॥ (১৫)

শ্রাবণে দাদুরী রব,   ময়ূর ডাহুক সব,
নিজ স্থানে সদা সুখ মন।
বিহরিতে ভ্রাতৃ সনে,   না দিলেক কোন জনে,
নিবান্ধবী হৈলু তেকারণ ॥ (১৬)

ভাদ্রেতে সপূর্ণ জল,   করে মহী টলমল,
কোথা মোর ভাই গুণমণি।
না দেখিএ চন্দ্রমুখ,   টুক্-টুক্ হৈল বুক,
তোমা খেদে স্থির নহে প্রাণি ॥ (১৭)

না পূরিতে কলানিধি,   কেন খয় হয় বিধি,
কদাপি না মিটে কর্ম্মভোগ।
না কৈলা সংসার সুখ,   প্রভু তোমা করাউক,
স্বর্গপুরী হুরের সম্ভোগ ॥ (১৮)

আশ্বিনেতে খোয়াময়,   কান্দে তরুলতাচয়,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি,   বনে কান্দে কুরঙ্গিনী,
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥ (১৯)

কার্ত্তিকেতে বুদ্ধিছন্ন,   বনচর হৈল পূর্ণ,
মুই সম নাই ভাগ্যহীনী।
হেন দৈব ঘটে কার,   অঙ্কুরেতে এ অঙ্গার,
নিআশা হইলু কলঙ্কিনী ॥ (২০)

কি কি কারণে রহীমু-'ন্-নিসার "বারমাসিটি" উপরে উদ্ধৃত হইল, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে, বিষয়টি সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া নাও উঠিতে পারে। তাই, বাধ্য হইয়া "বারমাসিটির" বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিতে হয়। "বারমাসি" পরিপ্লাবিত মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে ইহার স্থান নির্ণয়েও কথাগুলির আবশ্যক।

অনেকেই অবগত আছেন যে, মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে "বারমাসি" রচনা একটি অত্যন্ত মামুলী কাব্য-রীতি। কিন্তু, যে-শ্রেণীর "বারমাসি" রচনা এই যুগে একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল, রহীমু-'নু-নিসার "বারমাসি" তাহা হইতে সম্পূর্ণ না হইলেও, বহুলাংশে স্বতন্ত্র। কবিকঙ্কণের "ফুল্লরার বারমাসি" অথবা দৌলতকাজীর "ময়নার বারমাসি" ন্যায় মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের অধিকাংশ "বারমাসি" কবির কোন-না-কোন মূল কাব্যের একটা অংশ। মূল কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই "বারমাসি' অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে পৃথক খণ্ডকাব্য হিসাবেও সমাদর লাভ করিয়াছে। একথাও সত্য যে, মধ্যযুগের শেষ ভাগে দেশে যখন জনসাধারণের মধ্যে "বারমাসির" কদর বাড়িয়া গিয়াছিল, তখন কোন কোন কবি শুধু খণ্ডকাব্য হিসাবেও "বারমাসি" রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় "বারমাসিতে" কবি অধিক পরিমাণে স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইতেন এবং এইগুলি টীকা-টিপ্পনী সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হইত। এই শ্রেণীর একটি "বারমাসির" তিনটি শ্লোক এইরূপ :---

"মাধবী মাসেত মন্মথ মহীরাজ।
মহোৎপল দণ্ড রুচি মধুসেনা সাজ॥
মধুব্রত ফুল-মধুমত্ত ভোগ স্বাদ।
মধুবিত পরভৃত করে মধু নাদ॥
মনরুয়া বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মান বিরহ আকুল॥"

মোটের উপর, "বারমাসি" কোন বৃহত্তর কাব্যের অংশরূপে লিখিত হউক, অথবা শুধু খণ্ডকাব্য হিসাবেই রচিত হউক, বারমাসে ঋতু-বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করিয়া কোন কাব্যের নায়িকা বা কোন কাল্পনিক বিরহিণী যে-কান্ত-বিচ্ছেদ ব্যথা ভোগ করিতেন বলিয়া কবিরা মনে করিতেন, অধিকাংশ "বারমাসিতে" তাহারই কল্পিত রূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, মধ্যযুগীয় "বারমাসি" অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরহিণীর প্রেমের ব্যথার বাঙ্ময় রূপায়ণ মাত্র।

আলোচ্য মহিলা-কবি রহীম-'ন্-নিসার "বারমাসি" যেমন একদিকে কোন বৃহত্তর কাব্যের অংশ নহে, অন্য দিকে তেমন কোন বিরহিণীর

প্রেমের ব্যথার বাঙ্ময় রূপায়ণও নহে। ইহা তাঁহার ভ্রাতৃ-বিয়োগের করুণ-বেদনা-সংঘাতে উন্মথিত হৃদয়ের "শোক-সঙ্গীত"। এই দিক হইতে ইহা ইংরেজী সাহিত্যের Elegy-জাতীয় কাব্যের সগোত্র। তাই, এইযুগে ইহার স্থান একরূপ একক বলিয়া মনে হয়। একক হউক বা না হউক, ইহা যে মধ্যযুগীয় প্রচলিত "বারমাসি" বা কাব্যরীতির একটি প্রধান ব্যতিক্রম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নিদারুণ শোকে উন্মথিত হইয়াই রহীমু-'ন্-নিসা তাঁহার "বারমাসি" রচনা করিয়াছিলেন। পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর মৃত্যুতে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার বঞ্চিত-বুকে যে-বেদনা সঞ্চিত হইতেছিল, হঠাৎ কনিষ্ঠ সহোদর "আবদু-'ল্-ঘফূরের অকাল-প্রয়াণে তাহা ফেনাইয়া উঠিতেই 'আলোচ্য 'বারমাসির' সৃষ্টি। বোধ হয়, এই কারণেই ইহা লেখিকার বিগলিত করুণার চিরন্তন প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে। এই শোক-সঙ্গীতটিকে 'বারমাসির' আধারে ঢালা হইলেও,'বারমাসির' আদিরসাশ্রিত মদিরার পরিবর্তে ইহাতে যে 'আঁসূর শরবৎ' 'ভর-পেয়ালায়' পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার মধুর আভা আধারের স্বচ্ছ স্ফটিক-প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরেও ঠিকরিয়া পড়িতেছে। তাই, আমরা যখন শুনি :

"আশ্বিনেতে খোয়াময়, কান্দে তরুলতাচয়,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি, বনে কান্দে কুরঙ্গিণী,
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায়।।"

তখন এক আলুলায়িত-কুন্তলা, বিস্রস্ত-বসনা, বিমর্ষ-বদনা বিলাপিনী-রমণীর সকরুণ-মূর্তি নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের চক্ষু দুইটিও অলক্ষিতে 'ছলোছলো বেদনায়' উছলিয়া উঠে। আমরা এই পিতা, স্বামী ও ভ্রাতৃহীনা রমণীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না এবং আমাদের কণ্ঠ হৃদয়ের গুঞ্জরিত-ব্যথার বিপুল-উদ্বেগে বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর যখন আশ্বস্ত হই, তখন খ্যাতনামা ইংরেজ কবির সেই চিরপ্রসিদ্ধ চরণটি আমাদের মনে পড়ে এবং আমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা পাই যে, Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"

অমাদের করুণাতম চিন্তার অভিব্যক্তিতেই মধুরতম সঙ্গীতমালার সৃষ্টি। এইদিক হইতে চিন্তা করিলে মনে হয়, মহিলা কবি রহীমু-'ন্-নিসা সত্যই একজন সার্থক কাব্যস্রষ্ট্রী।

রহীমু-'ন্-নিসার তৃতীয় রচনাও একটি শোকগাথা। ইহার মাত্র ৪৭টি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। গাথাটির প্রথম তিন পাতা অর্থাৎ ৬ পৃষ্ঠা নাই; চতুর্থ পত্রের অর্থাৎ ৭।৮ পৃষ্ঠার পূর্ণ অংশ এবং পঞ্চম পত্রের মাত্র নবম পৃষ্ঠা বর্তমান। এতদ্ব্যতীত ইহার আর কয়পৃষ্ঠা ছিল বলিবার উপায় নাই। প্রাপ্ত ৪৭টি শ্লোক পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইতে এই শোক-গাথার বিষয়-বস্তু এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়?

"দোরদানা" নামক কোন সুন্দরী তরুণীকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বিবাহ দেওয়া হয়। তখন দোরদানার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী সকলেই বর্তমান ছিলেন। কি কারণে জানি না, বিবাহের অত্যল্প কাল পরেই দোরদানা স্বামীর হস্তে শহীদ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বনে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিলাপ এই গাথায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

গাথাটির কোন নাম নাই। তথাপি, ইহা কতকগুলি বিলাপের সমষ্টি বলিয়া, ইহাকে "দোরদানা-বিলাপ" আখ্যায় অভিহিত করা চলে। রহীমু-'ন্-নিসা স্বেচ্ছায় এই গাথা রচনা করেন নই। প্রাপ্ত অংশের এক স্থলে যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়:

"ছিরী আহামদ আলী জ্ঞানবন্ত ধীর।
মানে মহামন্ত অতি দানে কর্ণ বীর।।

স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।
রহিমন্নিচা নাম জান আদ্যে ছিরীমতী।।"

"দোরদানা-বিলাপ" দীর্ঘ রচনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মায়ের বিলাপের শেষেই উপরি উদ্ধৃত ভণিতা দেখা যায় এবং এই ভণিতার পর পঞ্চম পাতার নবম পৃষ্ঠার কিয়দংশ শূন্য। এই পত্রের দশম পৃষ্ঠাও শূন্য। বিলাপটির যদি আরও অতিরিক্ত অংশ থাকিত, তবে পঞ্চম পত্রের নবম পৃষ্ঠার কিয়দংশ ও দশম পৃষ্ঠার সম্পূর্ণটি শূন্য থাকিত বলিয়া মনে হয় না।

"দোরদানা-বিলাপ" একটি খণ্ড-কাব্য। ইহাতে আলোচ্য মহিলা-কবির মূল-বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। তাঁহার শোকজর্জর ও সন্তাপদগ্ধ জীবনে আনন্দ-সামগ্রীর আবেদন স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাই, তাঁহার হৃদয় শোক-তাপেই সংবেদশীল হইয়া পড়িয়া থাকিবে। "দোরদানা"-বিলাপে রহীমু-'ন্-নিসার এহেন সংবেদনশীল মনের পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট। একে মাতৃজাতি: তদুপরি হৃদয় একান্ত শোক-সংবেদনশীল: রহীমু-'ন্-নিসা এই বিলাপ রচনা করিতে গিয়া যে-শোকজাল বুনিয়াছেন, তাহা পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিকেও দৃঢ়-বন্ধনে জড়াইয়া ফেলে। তাঁহার এই জালে আবদ্ধ হইয়া শুধু যে দোরদানার মায়ের নয়নে অশ্রুর পাথার উথলিয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, ইহা আমাদের সকলকেই অশ্রুসিক্ত করিয়াছে। আমরাও যেন কন্যাহারা জননীর কণ্ঠে সুর মিলাইয়া বলিয়া ফেলি:

"নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার।
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর।।"

শোকাতুরা মায়ের সেই গগন-ভেদী আর্তনাদ 'দেশে দেশে বনে বনে' ঘুরিয়া ফিরিয়াছে, জলভরা মেঘের বুকে বিদ্যুতের বহ্নি-শিখা জ্বালাইয়াছে এবং ধরণীর ছায়াশীতল বুক গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহে পোড়াইয়া দিয়াছে। আজও স্তব্ধ মনে কান পাতিয়া রাখিলে সেই মর্মবিদারী আর্তনাদ যেন শুনিতে পাই এবং মন্থরগতি বায়ুস্তর ভেদ করিয়া যে করুণ স্বর ভাসিয়া আসে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারি:

"বনে কান্দে পশু পক্ষী দুক্ষ ভাবি মন।
স্বদেশী বিদেশী কান্দে পন্থে পন্থিগণ।।"

"দোরদানার-বিলাপের" মধ্যে কেবল যে মাতৃজাতির কোমল-হৃদয় বৃত্তির অভিব্যক্তি আছে তাহা নহে; ইহাতে কবির মননশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে কবির হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেন গভীর প্রীতিভরে পারস্পরিক আলিঙ্গনে যুগল-মিলন ঘটাইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে মাত্র চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল:

"জহুরীএ জানে ভাল সুবর্ণের মূল।
হীরামুক্তা নাহি চিনে লোহারের কুল।।

বনান্তরে থাকি অলি পুষ্প মধু খায়।
বৃক্ষ মূলে থাকি ভেকে পরিচ না পায়।।

সুজনের সঙ্গে প্রেম মেঘবৃষ্টি প্রায়।
ভাঙ্গিলে সোহাগ পুনি অচিন জোড়ায়।।

কুজনের সঙ্গে প্রেম মাটিয়া কলসী।
ভাঙ্গিলে না লয় জোড়া হয় বিদ্ধানাশি।।”

উপরে মহিলা-কবি রহীমু-’ন্-নিসার (শ্রীমতি রহির্মন্নিচা) যে-কয়টি রচনা আলোচিত হইল, তাহা ছাড়া তাঁহার আর কোন লেখার সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অতএব, সৃষ্টির প্রাচুর্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার রচনার সংখ্যা অত্যল্প। তাই বলিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই, এমন কথা মনে করা একান্তই অবিবেচনার কাজ। হয়ত, তিনি আর কোন কাব্য লিখেন নাই; হয়ত তিনি আরও বহু কাব্য লিখিয়াছিলেন। সাহিত্যে কাব্য-স্রষ্টার স্থান নির্ণয়ে তাঁহার সৃষ্টির প্রাচুর্য খুব বড় কথা নহে। বরং তাঁহার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের পক্ষে অত্যধিক আবশ্যক। দৌলত কাজী তাঁহার “সতীময়না” নামক একখানা অসম্পূর্ণ কাব্য রচনা করিয়া মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁহার “উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম” লিখিয়া আধুনিক যুগে বিশিষ্ট, এবং ইংরেজ কবি গ্রে (Gray) যদি অন্য কোন কবিতা না লিখিয়া শুধু “এলিজি” (Elegy) রচনা করিতেন, তথাপি তাঁহার স্থান ইংরেজী কাব্য-জগতের যেখানে এখন আছে, ঠিক সেখানেই থাকিত। আলোচ্য মহিলা-কবি রহীমু-’ন্-নিসাও অত্যল্প সংখ্যক রচনা লইয়া মধ্যযুগের বাংলা-কাব্য-জগতের শেষপ্রান্তে বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শান্ত-সমাহিত বিষাদিনী মাতৃ-মূর্তির সম্মুখে আসিয়া আমরা শুধু ইসলামী নীতি-বশে আনত-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকি না, অধিকন্তু বিষাদভারাক্রান্ত অন্তরে শ্রদ্ধাভরে মস্তকও অবনত করি।

পরিশেষে, এই কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রহীমু-’ন্-নিসার যে স্বল্প-সংখ্যক রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দোষ-ত্রুটি যে নাই, তেমন নহে। তিনি নিজেও সে-বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁহার

“আত্মবিবরণীতে” গুণীগণের পদে বারংবার সে-ত্রুটি ক্ষমা করার আবেদন জানাইয়াছেন। বলাবাহুল্য, বর্তমান আলোচনায় তাঁহার সেই ত্রুটির দিক উপেক্ষিত হইয়াছে। কারণ, নিজের দোষ-ত্রুটির মার্জনা ভিক্ষা করিতে গিয়া রহীমু-’ন্-নিসা যে একটি সাবজনীন-নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারই কথায় আমরা কৈফিয়ৎ দিতে চাই :

“মহতে ঢাকিয়া রাখে হীন অপরাধ।
নিগুণীএ না বুঝিয়া বাড়ায় বিবাদ।।’

পরিশিষ্ট পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পরিশিষ্ট

[প্রথম পর্যায়]

রহিমু-’ন্-নিসার আত্মবিবরণী

(লঘু ত্রিপদী)

শুন গুণিগণ,   হই এক মন,
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে,   টুটা পদ হৈলে,
শুধরিঅ সর্বজন।। (১)
পদ এই রাষ্ট,   হেন মহাকষ্ট,
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মণি,   বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী।। (২)
পদের উকতি,   বুঝি কি শকতি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ   মানিয়া বিশেষ
সাহস করিলু গাথি।। (৩)
সে পদ হিমল,   মন মোর উঝল,
ধীরবন্ত শুদ্ধ পতি।
নাম আর গ্রাম,   শুন অনুপাম,
বর্ণিমু কিঞ্চিত কৃতি।। (৪)
মেখল দিব্য স্থান,   অতি শোভমান,
মোহন্ত গুণী বসতি।
নিত্য সুখ রস,   নহে পাপ বস,
সদা সুআচার অতি।। (৫)

মোহন্ত প্রধান,　　রূপে পঞ্চবাণ,
গোলাম হোচন বীর।
সর্ব গুণধারী,　　মহাদান কারী,
ধৈর্যে যিনি যুধিষ্ঠির ॥(৬)
প্রভুব ভাবক,　　কাঙ্গালী পালক,
কুলশীল শুদ্ধ জ্ঞান।
না গুণি সংশয়　　সানন্দ হৃদয়
কাটিলেক কাল তান ॥ (৭)
তাহান তনয়,　　অতি গুণালয়,
সাহসিক বুধশালী।
জ্ঞানবন্ত কুরু,　　মানে জিনি গুরু,
ছিরীযুত জান আলী ॥ (৮)
পিতৃ হস্তে অতি,　　তাহান যে কৃতি,
প্রচারিল ক্ষিতি মাঝ।
তান ঔরসের,　　আমদ আলী বর,
মোর পতি রসরাজ ॥ (৯)
রসিক সমাজ,　　ব্রত ধর্ম কাজ,
উপেক্ষা না করে চিত।
মোহর যে গুরু,　　মহা কল্পতরু,
অখণ্ডিত উপনীত ॥ (১০)
সত্যবন্ত স্থির,　　জ্ঞানবন্ত ধীর,
নাম আবুল হোচন।
তান কৃপা দান,　　নহে মোর স্থান,
কিবা যোগ্য বিরচন ॥ (১১)
গুণীনের পদ,　　করিএ ভকত,
কর মোরে আশীর্বাদ।
স্বামীর সঙ্গতি,　　থাকিতে পিরীতি,
না হৌক যে বিসংবাদ ॥ (১২)
প্রভু করতারে,　　মুই অভাগীরে,
করুণা রহৌক সতত।
আন ভাব মতি-　　নৌক আন পতি,
না করৌক লজ্জাগত ॥ (১৩)

নিজ গোত্র নাম, স্থান আর গ্রাম,
কহিএ সব বাখানি।
যবে পাও দোষ, না হইঅ রোষ
খেম যত বুধমণি।। (১৪)

পয়ার—খর্ব্বছন্দ

নাম গোত্র বিরচিয়া করিমু বর্ণন।
কর্ণগতে শুন মন দিয়া কবিগণ।। (১৫)

জংলী শাহা নাম করি গুণে অনুপাম।
আহালে কোরেশ বংশে উৎপত্তি তাহান।। (১৬)

যখনে ইমাম-সঙ্গে দাসীর নন্দন।
ধর্ম ছাড়ি সজ্জ হৈল করিবারে রণ।। (১৭)

হোচেনের সেনাপতি মিলি কত লোক।
ঈশ্বর স্মরিয়া মনে জানি কর্মভোগ।। (১৮)

কত কত বহিত্র যে পূর্ণ সাজ করি।
বাগদাদে আসিলা ইমাম আজ্ঞা ধরি।। (১৯)

তথা হন্তে আর কত মুঙ্গেরে আসিল।
সে মুলুক নৃপ সঙ্গে বহুযুদ্ধ হৈল।। (২০)

অগ্রগামী হইয়া ইংরাজে যুদ্ধ দিল।
দৈবদশায় ফিরিঙ্গীর বিজয় হইল।। (২১)

মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্ন ধন।
লুটিয়া করিল খয় যত পাপিগণ।। (২২)

অনেক লাঘবে নিজ জন্মভূমি ছাড়ি।
চট্টগ্রামে আসিয়া রহিলা বাস করি।। (২৩)
পির হই শিষ্য কৈলা কত কত গ্রাম।
প্রকাশ হইল তান যশ কৃতি নাম।। (২৪)

চারি খান্দানের মাঝে খলিফা আছিল।
পুণ্য কর্মে দানে ধর্মে সুখে নির্বহিল।। (২৫)

আয়ু শক্তি হীন দেখি মৃত্যু সেহ আশ।
সকল অনিত্য জানি সর্গে কৈলা বাস।। (২৬)
তাহান ঔরসে মোর পিতা গুণালয়।
আবদুল কাদের শাহা নাম সুনিশ্চয়।। (২৭)
গুণজ্ঞাত শুদ্ধমতি আওল ফকির।
ছুফী খান্দানেতে পির আছিল সুধীর।। (২৮)
করিল বহুল শিষ্য তত্ত্বজ্ঞান দিয়া।
সগৌরবে করে শিষ্য আপন চিনিয়া।। (২৯)
অবোধ কালেতে মোর পিতা সর্গে বাস।
মুই হীন অভাগিনী হৈলুম নিরাশ।। (৩০)
নারিলু করিতে সেবা পিতার চরণ।
মুই হীন অভাগিনী তাপিত জীবন।। (৩১)
স্মরিতে পিতার শোক চিত্ত বিচলিত।
সুখ বিঘটিত মোর মিলিল কুরীত।। (৩২)
সে কারণে শাস্ত্রজ্ঞাতা না হৈলুম অতি।
কিঞ্চিত দর্শাইল পুঁথি মাতৃগুণবতী।। (৩৩)
প্রভুভক্তা সতীত্ববতী জননী অনুপাম।
শ্রীমতি আলিমন্নিচা জান তার নাম।। (৩৪)
তিন ভ্রাতা এক নাম আবদুল জব্বার।
মহা ধৈর্যবন্ত সেই নিত্য সুব্যভার।। (৩৫)
আবদুল ছত্তার আর অতি জ্ঞানমান।
পাপ ক্রোধ শোভ হীন রূপে পঞ্চবান।। (৩৬)
বিংশ বৎসরেতে তান কাল উপস্থিত।
স্বর্গপুরে যাই দেহ করিলা লুকিত।। (৩৭)
ভ্রাতৃ অনুশোচে হৃদে নাহি পরিত্রাণ।
জানিবে এ দুক্ষ মোর যেবা বুধমান।। (৩৮)
মোহর কনিষ্ঠ আবদুল গফুর অজ্ঞান।
অপ্রকাশ বুদ্ধি আর জানিবা তাহান।। (৩৯)

ধিক কি বর্ণিমু মোর স্থির নাই বুদ্ধি।
জ্ঞানদৃষ্টে অন্বেষিএ না পাই যে শুদ্ধি॥ (৪০)

গুণীনের পদে আর এই সে আরতি।
পতিভক্তি সতীত্ব রাখিতে একমতি॥ (৪১)

না জন্মৌক আনভাব হৃদয়ের মাঝ।
ললনার রৌক গীম সতীর সমাজ॥ (৪২)

অনাথিনী এতিমের নাম শুন গুণী।
শ্রীমতি রহিমন্নিচা দুষ্ট কলঙ্কিনী॥ (৪৩)

পদের অক্ষর খয় হৈলে কদাচন।
দোরসিও তাকে গুণী হই তুষ্ট মন॥ (৪৪)

পিতাহীন সুতা জানি গৌরব করিবা।
দুক্ষিনীর পদ এই শুধবিয়া দিবা॥ (৪৫)

মহতে ঢাকিয়া রাখে হীন অপরাধ।
নিগুণীএ না বুঝিয়া বাড়াস বিবাদ॥ (৪৬)
এই পুঁথি বিকি যদি করি কদাচিত।
নিজ হস্তে দস্তখত দিমু যে নিশ্চিত॥ (৪৭)

ফেরেব রূপেতে কেহ মালিকি লিখিবা।
তার মাতৃ তিরী পরে তেলাক জানিবা॥ (৪৮)

দোরদানা-বিলাপ

[দ্বিতীয় পর্যায়]

রহীমুন্-নিসা

(প্রথম হইতে তৃতীয় পত্র অর্থাৎ প্রথম হইতে ষষ্ঠ পৃষ্ঠা নাই)

৪ চতুর্থ পত্র (৭।৮ পৃষ্ঠা)

- - - - - - - - - - - - - -পাপিষ্ঠের হিয়া ।
মৃত্যুর উপরে খাঁড়া দিলি কিনা গিয়া ।। (১)
নবী-বংশ এজিদার যুদ্ধেতে পড়িল ।
মোর কন্যা তোর হস্তে শহীদ হইল ।। (২)
আপনার তিবী বলি না কৈলা বিচার ।
কি উত্তর দিবি যাই গোচরে আল্লার ।। (৩)
স্বর্গবাসী হুব সব হরষিত হৈয়া ।
কন্যা মোর নিল আসি আগু বাড়াইয়া ।। (৪)
পিতায়ে কান্দন করে আর্তনাদ ছাড়ি ।
কোথা লুকাইল মোর দোরদানা সুন্দরী ।। (৫)
কোন্ বাটোয়ারে আসি কৈল বাটোয়ারি ।
মিথ্যা পরিবাদে জাদু লই গেল ধরি ।। (৬)
নিদোষীরে দোষী করি মর্ম বিদারিল ।
তোমা অঙ্গ রক্ত ভাটি উজান ধরিল ।। (৭)
হেন অপমান আল্লা প্রাণে কেনে সয় ।
পাপদেহ কাড়ি প্রাণি কেনে লৈ ন যায় ।। (৮)
আঁখির পোতলি কন্যা প্রাণের দোসর ।
কোন্ মেঘে আচ্ছাদিল পূর্ণ শশধর ।। (৯)

ভাই সবে কান্দে আল্লা করি হায় হায়।
ছোট ভাই কান্দন করি ভূমিতে গড়ায় ॥ (১০)
বিলাপ করিয়া বোনে বুকে মারে হাত।
কোন্ ছারে দিল মোর শিরে বজ্রাঘাত ॥ (১১)
আহা ভগ্নী চন্দ্রমুখী সংসার মোহিনী।
কোথাতে লুকাইলে মোর সোদর পরাণী ॥ (১২)
ভগ্নী বলি অভাগিয়া কাহারে ডাকিমু।
মনে দুক্ষ পাইলে ভগ্নী কাতে নিবেদিমু ॥ (১৩)
মা জননী কান্দে আল্লা আপনা পাসরি।
কোন্ দোষে জাদু তোর গলে দিল ছুরি ॥ (১৪)
তোর বুকে কোন্ ছারে করাত বসাইল।
পয়গাম্বরী মুছিবত আমারে পাড়িল ॥ (১৫)
পতিঙ্গাতে লহুর নহর বহি যায়।
পরিন্দা জানোয়ার কান্দে করি হায় হায় ॥ (১৬)
হেন দুক্ষ মা জননী প্রাণে কেনে সয়।
সিংহাসনে বসি আল্লা কি না রঙ্গ চায় ॥ (১৭)
মোর জাদুর দুক্ষ দেখি ফেরেস্তা কান্দিল।
হেন বিপরীত আল্লা কি দোষে করিল ॥ (১৮)
চন্দ্র সূর্য না দেখিছে হেন জাদু মোর।
বিচার না কৈলা মনে অধর্মী বর্বর ॥ (১৯)
জহুরীএ জানে ভাল সুবর্ণের মূল।
হীরামুক্তা নাহি চেনে লোহারের কুল ॥ (২০)
বনান্তরে থাকি অলি পুষ্পমধু খায়।
বৃক্ষমূলে থাকি ভেকে পরিচ না পায় ॥ (২১)
সুজনের সঙ্গে প্রেম মেঘবৃষ্টি প্রায়।
ভাঙ্গিলে সোহাগ পুনি অচিন জোড়ায় ॥ (২২)
কুজনের সঙ্গে প্রেম মাটিয়া কলসী।
ভাঙ্গিলে না লয় জোড়া হয় বিদ্দানাশি ॥ (২৩)
দুষ্টজন মনে কভু নাহি স্থির বুদ্ধি।
গোময়ের কীটে কি জানিবে প্রেমশুদ্ধি ॥ (২৪)

মৃত পরে খাঁড়া দিতে কোন্ শাস্ত্রে পালি।
একদিন মৃত্যু আছে ভাবি না চাহিলি।। (২৫)
কি উত্তর দিবি পাপী হিসাবের কালে।
কুকীর্তি জন্মালি তুই এ মহী মণ্ডলে।। (২৬)
যত দিন আছে মোর দেহেতে জীবন।
এই শেল ঘাও কভু না হৈব খণ্ডন।। (২৭)
মোর কন্যা রূপ দেখি চন্দ্র সূর্যগণ।
লজ্জা পাই মেঘে মুখ করএ গোপন।। (২৮)
স্মরিয়া কন্যার রূপ কলিজা ফাঁফর।
বেজোড়া করিলি কার জোড়ের কৈতর।। (২৯)
ভরনি বাজারে মোর কেবা ভঙ্গ দিল।
বিকিকিনি সমে মুই নিরাশ হইল।। (৩০)
মোর পুস্প বৃন্দাবনে কেবা অগ্নি দিল।
মোর পুষ্প কাঁচা ডাল কেবা যে ভাঙ্গিল।। (৩১)
মোর পুষ্প কলি আল্লা কেবা যে ছিঁড়িল।
বিকাশ না হৈতে পুষ্প কেনবা ঝড়িল।। (৩২)

৫পঞ্চম পত্র (৯ পৃষ্ঠা)

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার।
মোর জাদু গেল ফিরি না আসিল আর।। (৩৩)
দেশে দেশে বনে বনে করি অন্বেষণ।
কোথাতে লুকাইল মোর এ মাণিক্য ধন।। (৩৪)
মালিয়া মালিনী কান্দে পুষ্পহার লই।
রূপের মুরারী আল্লা গেল যে পলাই।। (৩৫)
এই পুষ্পমালা মুই দিমু কার গলে।
হেন কাঁচা গীম আর নাই ভুমণ্ডলে।। (৩৬)
জলে কান্দে জল মৎস্য শোকাকুল হৈয়া।
এহেন নিদোষী জন কে নিল ধরিয়া।। ৩৭)
বনে কান্দে বন পশু দুক্ষ ভাবি মন।
স্বদেশী বিদেশী কান্দে পঙ্খে পঙ্খিগণ।। (৩৮)

ইষ্ট মিত্র সবে জাদু আছিলাম বেড়িয়া।
কেমন তস্করে তোমা লৈ গেল হরিয়া।। (৩৯)
কোন্ বনের ব্যাঘ্র জাদু লৈ গেল ধরিয়া।
কোন্ বনের নাগে জাদু দংশিল আসিয়া।। (৪০)
বৃক্ষ ডালে ডালে পাতে পাতে বিচারিলু।
কোন স্থানে গেল জাদু উদ্দেশ না পাইলু।। (৪১)
সমুদ্রেতে ডুব দিয়া পাতালে ভ্রমিলু।
হেন কাঁচা তনু আর কোথা না দেখিলু।। (৪২)
যদি সে জানিতু জাদু ছাড়ি যাইবা মোরে।
আপনার হৃদ চিড়ি ঠাঁই দিতু তোরে।। (৪৩)
মা জননী সুখ জাদু কেন বিসরিলা।
কোন দোষে জাদু মোরে বিচ্ছেদ হইলা।। (৪৪)
আর ত না দেখি তোমা চন্দ্রিমা বদন।
আর না শুনিলাম তোমা মধুর বচন।। (৪৫)
কি করি কাটামু কাল তোমারে ছাড়িয়া।
অভাগী মায়েরে নাও ফিরিয়া আসিয়া।। (৪৬)
ছিরী আহামদ আলী জ্ঞানবন্ত ধীর।
মানে মহামন্ত অতি দানে কর্ণ বীর।। (৪৭)
স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লেখি এ ভারতী।
রহিমন্নিচা নাম জান আদ্যে ছিরীমতী।। (৪৮)

মন্তব্য :—ইহারঃ পর এই বিলাপের আর কোন অংশ অনুলিখিত হয় নাই। কাজেই দশম পৃষ্ঠা শূন্য। হয়ত, বিলাপটি এইখানেই শেষ হইয়াছিল।—সম্পাদক।

টীকা-টিপ্পনী

বারমাসীতে ভ্রাতৃ-বিলাপ

(১) প্রণামিএ----নামধাতু 'প্রণাম' হইতে অসমাপিকা ক্রিয়ায় "প্রণামিএ"= প্রণাম করিয়া।

(২) নিরঞ্জন----মধ্যযুগে এই শব্দটি 'আল্লার' প্রতিশব্দরূপে মুসলমানেরা প্রায় সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন। এই সূত্রে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', 'অলক নিরঞ্জন' প্রভৃতি কথা স্মরণীয়। 'নিরঞ্জন' কিন্তু বৌদ্ধ-দেবতা'। মুসলমানেরা 'বৌদ্ধদেবতা' অর্থে যে শব্দটির ব্যবহার করেন নাই, এই কথা সুস্পষ্ট। শব্দটির মৌলিক অর্থ----নিঃ (নাই) অঞ্জন (কলঙ্ক) যাহার, সেই 'নিরঞ্জন'। আল্লা এক, পাক ও বে-আয়েব (নিষ্কলঙ্ক)—ইসলামের এই গুণান্বিত আল্লার একমাত্র প্রতিশব্দ 'নিরঞ্জন' ছাড়া অন্য কোন বাংলা শব্দ নাই বলিলেও চলে। এই কারণেই মুসলমানেরা সাহিত্যে 'আল্লার' প্রতিশব্দরূপে শব্দটিকে মধ্যযুগে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। মুসলিম্-সাহিত্যে ইহার ব্যবহার দেখিয়া মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কল্পনা অলীক, কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক।

(৩) **দুক্ষের বাসর**----মূলে অর্থহীন "দুক্ষে বাষ্কর" কথা আছে। আমার বিবেচনায় ইহার পাঠ "দুক্ষের বাসর" হইবে। বলাবাহুল্য--'বাসর' তদভব 'বাসর'<বাসহর<বাসঘর<বাসগৃহ নহে; ইহার অর্থ যে-ঘরে বর-কন্যা বিবাহ-রজনী যাপন করে। এই খানে 'দিবস বা দিন অর্থে' মূল সংস্কৃত

"বাসর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা এই অর্থে এখনও "বাসর" শব্দ ব্যবহার করি, যেমন—রবি-বাসর, শ্রাদ্ধ-বাসর, বিবাহ-বাসর ইত্যাদি।

(৪) নেচাবর--ইহা হিন্দী শব্দঃ মূল-শব্দ "নিছাবর।" ইহার অর্থ উৎসৃষ্ট-বস্তু, বিবাহের উপঢৌকন। নিছনি<নির্মঞ্ছিকা— তুলনীয়।

(৫) রহিমন্নিচা---নামটি আরবী ; ইহার মূলরূপ رحيم النساء = রহীমু-'ন্-নিসা।

(৬) করতার—ইহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে। সংস্কৃত 'কর্তা' বহুবচনে 'কর্তারঃ'>করতাব (শ্রেষ্ঠার্থে)। মধ্যযুগীয় মুসলিম্ বাংলা-সাহিত্যে "করতাব" শব্দের 'রব্ব' رب বা 'প্রভু' অর্থে ব্যবহার প্রচুর।

(৭) দুক্ষ--বানান ও উচ্চারণ লক্ষণীয়। "দুক্ষ" বানান মধ্যযুগীয় উচ্চারণ সম্মত। ইহার বাংলা উচ্চারণ--'দুক্খ', সংস্কৃত 'দুঃখ' নহে। তাই এই সময়ে শব্দান্ত্য ও শব্দ-মধ্যবর্তী 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ 'ক্খ' এবং শব্দাদ্য 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ ছিল 'খ'। এই সময়ের শব্দের বানানে দেখা যায়-'অক্ষয়', 'রক্ষা' প্রভৃতিতে 'ক্ষ' যেরূপ, 'দুক্ষ', 'খমা' প্রভৃতিতেও সেইরূপ।

(৮) নিধি--সংস্কৃত শব্দ ; অর্থ--ভাণ্ডার, নিধান।

(৯) বিমন--'অন্যমনস্ক' অর্থে নহে ; 'অসন্তুষ্ট' অর্থে। বি (বিশ্লিষ্ট)+মন অর্থাৎ মন বা প্রবণতা বা স্নেহ বিশ্লিষ্ট হইয়াছে এমন।

(১০) কৈলু-করিলাম বা করিলুম>কইলুঁ>কৈলু।

(১১) অনাথ--'অভিভাবকহীন' বা 'এতীম' অর্থে নহে; 'নাথ' অর্থাৎ স্বামিহীন' অর্থে।

(১২) মিত্রের--'বন্ধুর' অর্থাৎ লেখিকার স্বামীর।

(১৩) হন্তে--হইতে ; সং$\sqrt{}$ভূ হইতে 'ভবতঃ' ; প্রাঃ হন্ত>হন্তে।

(১৪) গুরু—বৃহস্পতি। তিনি দেবতাদের গুরু ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। এইজন্য "জ্ঞানে গুরু" বলিলে মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানী দেবগুরু 'বৃহস্পতি অথবা বৃহস্পতির তুল্য' বুঝায়।

(১৫) ওখার—সং উৎসার>উখার>ওখার=প্রবাহ বা প্রস্রবণ।

(১৬) কৃতি—কাজ। শুদ্ধ পাঠ ‘কীর্তি’ হইলেও ক্ষতি নাই।

(১৭) আঘ্রান—অগ্রহায়ণ>আঘন ‘আঘ্রান’ শব্দ অর্দ্ধ-তৎসম।

(১৮) পক্ষ—পঞ্চদশ। ‘পক্ষদিন’—পঞ্চদশ দিবস।

(১৯) চিন—চিহ্ন>চিন।

(২০) সান—ইসারা। তুলনীয়—‘হাতসানি’>হাতছানি। (সং সংজ্ঞা> প্রা: সান্না>সানা>সান=ইঙ্গিত।)

(২১) হুর—আরবী حور =‘হুর’—অপসরা।

(২২) পুষল—সং পৌষ>পুষ+অল (প্রত্যয়)।

(২৩) ছাই—সং ক্ষারিকা>ছাই—ভস্ম, তুচ্ছ পদার্থ। তুল: ক্ষত্রিয়>ছত্রী; ক্ষার>ছার।

(২৪) দৈব নিয়োজিত—ভাগ্যের লিখন, কপালের লিখা।

(২৫) আন্ধিয়ারি—হিন্দী ‘আন্ধি’+‘আরি’ (প্রত্যয়)—অন্ধকার। ব্রজবুলি চণ্ডে শব্দটি ব্যবহৃত।

(২৬) দুগ্ধের জননী—স্তন্যদান করিয়া যে মা পালিয়াছেন। —ইহার অর্থ ‘স্তন্যদানকারিণী জননী’। বিশেষণে ষষ্ঠী; যেমন ‘প্রাণের বন্ধু’।

(২৭) আশ্রা—সং আশ্রয় (অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ)।

(২৮) বিরস—‘রসহীন’ অর্থে নয়। ‘রুষ্ট’, ‘নিরানন্দ’, ‘বিষন্ন’ অর্থে ব্যবহৃত।

(২৯) নিবান্ধবী—স্বজন বা আত্মীয়বিহীনা। ইহা স্ত্রীলিঙ্গের রূপ।

(৩০) টুক-টুক—টুকরা-টুকরা, খণ্ডবিখণ্ড।

(৩১) খোয়া—সং-কুহা>খোয়া—কুয়াসা।

(৩২) উভরায়—উচ্চৈস্বরে। প্রা: উভ<উচ্চ+রা<রাঅ<রাব+য় (অধিকরণে)

(৩৩) কলঙ্কিণী—বিনয়ে ব্যবহৃত।

পরিশিষ্ট—প্রথম পর্যায় আত্মবিবরণী

টীকা

(১) শুধরিঅ, শুধরিও>মূল সং’ শুদ্ধ’ √শুধ্ হইতে বাংলা √শুধ্‌রা =শুদ্ধ করা,—ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ‘শুধরি অ=শুদ্ধ করিও

(২) রাষ্ট--প্রসিদ্ধ, প্রচারিত। 'রাষ্ট্র' শব্দের অর্ধ-তৎসমরূপ। রাষ্ট্র >রাষ্ট।

(৩) উকতি—অর্থ, কথা, মানে। 'উক্তি'>উকতি (স্বরভক্তিতে)।

(৪) তিরী—রমণী, মহিলা। সং স্ত্রী>(আদ্যবর্ণ-লোপে তিরী) ত্রী> (স্বরভক্তিতে) তরী>(স্বরসঙ্গতিতে) তিরী, তিরি।

(৫) করিল--করিলাম। মূল-সং√কৃ=বাং√কর্+ইল, করিলুম> করিলু।

(৬) মেখল--গ্রামের নাম। এই গ্রাম চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত।

(৭) মোহন্ত—অন্যরূপ 'মহান্ত ; অর্থ মঠাধ্যক্ষ। কিন্তু এখানে শব্দটি মঠাধ্যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শব্দটি পরে মুসলমানের (গোলাম হোচন) বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহা 'হিন্দু-মোহন্ত' নহে। এইখানেও শব্দটি বিশেষণ। সুতরাং ইহার অর্থ কিছুতেই মঠাধ্যক্ষ হইতে পারে না প্রকৃতপক্ষে শব্দটির গঠন এইরূপ—:

মহা+মন্ত=মহামন্ত, মহাঅন্ত>মহান্ত>মোহন্ত (তুলঃ বুদ্ধিমন্ত, সত্যবন্ত, জ্ঞানবন্ত) অর্থ—'মহাজন বা খ্যাতনামা ব্যক্তি, অনেক বড়।

(৮) পঞ্চবাণ—কামদেব, মদন [পঁঞ্চ (পাচ) বাণ (পুষ্পবাণ) আছে যাহার 'পঞ্চবাণ ; দ্বিগু সমাস বহুব্রীহি অর্থে ব্যবহৃত—দ্বিগু-বহুব্রীহি সমাস।]

(৯) গুনি—গণনা করিয়া, ভাবিয়া। মূল---সং√গুণ্—বাং√গুন্। ইহার অসমাপিকা ক্রিয়ার দাঁড়ায় 'গুনি'।

(১০) গুণালয়— গুণের আলয় অর্থাৎ গুণবান।

(১১) বুধশালী—'বুধ' গ্রহের নাম, অর্থে নহে। 'বুধ'=জ্ঞানী, পণ্ডিত। এই 'বুধ' শব্দের পরেই আবার বিশেষণীয় প্রত্যয় 'শালী' যোগ করা হইয়াছে। সং-বুদ্ধি=বোধি, বুধী (প্রা:)—বুধ+শালী (তুল:)।

(১২) ছিরীযুত—শ্রীযুক্ত। ছিরী (স্বরভক্তিতে)<শ্রী+যুক্ত>যুত। [পূর্বে মুসলমানেরাও নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করিতেন। শেরশাহের মুদ্রায় "শ্রী শেরশাহস্য" এবং ইসা খাঁর এক কামানে বাংলা হরফে "শ্রী ইছা খাঁ" দেখা যায়। প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে 'শ্রী' বহুল ব্যবহৃত। জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে 'শ্রী' লেখার প্রথা বহু প্রাচীন। এই 'শ্রী' ভাগ্যবান অর্থে অথবা আদরে ব্যবহৃত হইত। হিন্দুরা এখনও এই শব্দ নামের পূর্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাংস্কৃতিক বিবর্তনে, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের অত্যধিক স্বকীয় সাংস্কৃতিক-চেতনার ফলে, তাঁহারা এখন (১৯৫৬) আর এই শব্দটি নামের পূর্বে ব্যবহার করেন না।]

(১৩) কল্পতরু—স্বর্গে অবস্থিত কাল্পনিক বৃক্ষ ; ইহার কাছে গিয়া কল্পনায় যাহাই চাওয়া যায়, তাহাই মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে। মুসলিম পৌরাণিক উপাখ্যানেও বিহিশ্‌তে এমন একটি বৃক্ষের অস্তিত্বের কল্পনা দেখা যায় ; ইহার নাম—“তুবা”=طوبي

(১৪) অখণ্ডিত উপনীত—যাহার যুক্তি খণ্ডন করা যায় না অর্থাৎ অকাট্য এবং যিনি গুরুর নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন। ‘উপনয়ন’ শব্দের বিশেষণ ‘উপনীত’ অর্থাৎ অধ্যাপনার জন্য যাহাকে গুরুর বা আচার্যের নিকট আনা হইয়াছে।

(১৫) ভকত—সং ভক্তি>ভকতি (স্বরভক্তিতে)।

(১৬) আন—সং-অন্য>অন্ন>আন।

(১৭) নৌক—না হউক>নাহৌক>নাঔক>নৌক।

(১৮) করৌক—করা+হউক>করৌক>করাক।

(১৯) খেম—ক্ষমা কর। সং ক্ষমা>খমা>খেমা---অনুজ্ঞায় সং--√ক্ষম্ =বাং--√খেম্+অ=ক্ষমা কর, মাফ কর।

(২০) আহালে কোরেশ--আরবী “আহ্‌ল-ই-কুরৈশ” কুরৈশ-কুল।

(২১) ইমাম—ইমাম হুসৈন

(২২) দাসীর নন্দন—হজরত মুয়াবিয়ার দাসীর পুত্র নামে কুখ্যাত এজীদ। প্রকৃতপক্ষে এজীদ দাসীর পুত্র ছিলেন না।

(২৩) মুঙ্গের---বিহার প্রদেশের ‘মুঙ্গের’ একটি মুসলমান-প্রধান শহর। ইহার খ্যাতি প্রাচীন। ইহাতে একটি প্রসিদ্ধ দরগাহ-ও আছে।

(২৪) ফিরিঙ্গী—শব্দটি পর্তুগীজ ‘ফ্রান্সিস্‌’ (Francez) শব্দ হইতে গৃহীত ; ইহার দ্বারা যে-কোন ইউরোপীয় জাতি বুঝায়।

(২৫) লাঘবে—‘লাঘব’ শব্দের মূল অর্থ ‘লঘুতা’, ‘হ্রাস’, ‘অল্পতা’। ইহার গৌণ অর্থ ‘অপমান’, ‘অগৌরব’।

(২৬) চারি খান্দান---‘চৌধ্য খান্দান’ বা চৌদ্দ খান্দান যেমন সুফীদের মধ্যে দেখা যায়, ঠিক তেমনই “চারি খান্দান”-ও প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। এই ‘চারিখান্দান’ এইরূপ :--চিশতীয়া, নক্‌শবন্দীয়া, সুহ্‌রবর্দীয়া, কাদিরীয়া।

(২৭) আওল ফকির—আউলিয়া>ঔলিয়া>আওল+ফকির অর্থাৎ ঔলিয়া ও দরবেশ (ফকির) দুই-ই ছিলেন। আকুল>আউল>আওল (?) ; তুলঃ—'আউল-বাউল'।

(২৮) তত্ত্বজ্ঞান—মারিফৎ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

(২৯) বিঘটিত—'বিবটন' শব্দের বিশেষণ ; অর্থ বিপর্যয়, ধ্বংস। সুতরাং "বিঘটিত" শব্দের অর্থ---বিপর্যস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিলয়গ্রস্ত।

(৩০) কুরীত—(সং---কু+রীতি) দুঃসময়, দুর্দিন।

(৩১) সুব্যভার—ভাল আচার। সং--সু+ব্যবহার>ব্যভার (ব+হ=ভ, লক্ষণীয়)

(৩২) কাল—মৃত্যু, মরণ।

(৩৩) শুদ্ধি—সংশোধন। 'না পাই যে শুদ্ধি'—'সন্ধান' অর্থে ব্যবহৃত।

(৩৪) আরতি—সংস্কৃত 'আর্তি'>আরতি (স্বরভক্তিতে) ; অর্থ—কাতরতা, বিনীত প্রার্থনা।

(৩৫) গীম—সংস্কৃত গ্রীবা ; প্রাকৃত 'গীম' ; অর্থ—গলা।

(৩৬) এতিম—পিতৃহীন (يتيم), অনাথ বালক-বালিকা।

(৩৭) দোরসিও—দোরস্ত করিও, শুদ্ধ করিয়া দিও। ফার্‌সী 'দুরস্ত্ (درست)>দোরস্ত>দোরস+ইও (অনুজ্ঞার প্রত্যয়)=দোরসিও।

(৩৮) বিকি—সংস্কৃত 'বিক্রয়'>বিক্রি (অর্ধ তৎসম)>বিকি।

(৩৯) দস্তখত—ফারসী "দস্ত+খত"=(دستخط)=সহি, স্বাক্ষর।

(৪০) ফেরেব—ফার্‌সী "ফরীব্"(فريب)প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি, প্রতারণা।

(৪১) মালিকি—আরবী "মালিক"+ফার্‌সী "ই" = "মালিকী" (مالكى)=স্বত্ব, অধিকার।

পরিশিষ্ট—দ্বিতীয় পর্যায়—দোরদানা-বিলাপ্

টীকা

(১) খাঁড়া—সংস্কৃত 'খড়্গ'>খাঁড়া ? প্রাক খাণ্ডা>খাঁড়+আ=খাঁড়া। তুলনীয়:—"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"।

(২) শহীদ—আরবী (شهيد) যে-লোক যে-কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করিতে গিয়া প্রাণ হারায় অথবা যে-লোক অন্যায়ভাবে অপরের হাতে নিহত হয় অথবা যে-লোক কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়, তাহাকে "শহীদ" বলে।

(৩) আগু – অগ্র>অগ্‌গ>আগ+উ=আগু।

(৪) দোর্‌দানা—ফার্‌সী নাম “দুর্‌-ই-দানা (دردانه)=মুক্তাখণ্ড।

(৫) বাটোয়ার—যে রাহাজানি করে, যে পথে ডাকাতি করে। শব্দটির গঠন এইরূপ :—বর্ত্ম>বট্ট>বাট+ওয়ার=বাটোয়ার। (হিন্দী—পথে দাঁড়াইয়া পথিকের কাছ হইতে শুল্ক আদায়কারী,—অর্থ বিকৃতে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে ‘যে রাহাজানি করে’=লুটেরা। তুলঃ ‘পাটোয়ার’।

(৬) জাদু—আদরার্থে শিশুসন্তানের সম্বোধন। ইহা মূল ফার্‌সী ‘জাদহ্‌’ (زاده)=জাত (অর্থাৎ ঔরসজাত বা গর্ভজাত) অর্থে আদরে ‘জাদা’+উ (প্রত্যয়)=“জাদু” রূপে ব্যবহৃত।

(৭) দোসর—সং-দ্বিসর>দোসর=দ্বিতীয়টি অর্থে।

(৮) ছার—সং-ক্ষার>ছার=তুচ্ছ পদার্থ, ভষ্ম। তুল:–ক্ষত্রিয়>ছত্রী। ক্ষ=ছ।

(৯) পাসরা—সং-প্রস্মর>পাসর=ভুলিয়া যাওয়া।

(১০) ছুরি – সং-ক্ষুরিকা>ছুরিকা>ছুরি=চাকু, কাটার ছোট অস্ত্র।

(১১) করাত—করপত্র>করপত্ত>করপাত>করআত>করাত=কাট ফাড়িবার অস্ত্র। এখানে ‘শাণিত ছুরিকা’।

(১২) পয়গাম্বরী মুছিবত—مصيبة پيغمبري=নবীদিগকে প্রদত্ত মুছিবত বা কষ্ট। মুস্‌লিম উপাখ্যানে দেখা যায়, নবীদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা বহু কষ্ট দিয়াছিলেন। তাঁহারা অম্লান-বদনে এই সমস্ত কষ্টকে আল্লার অর্থাৎ প্রভুর দান বলিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। এইস্থলে তৎপ্রতি ইঙ্গিত আছে।

(১৩) পতিঙ্গা—চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ইহা এখন উড়ো-জাহাজের ঘাটিতে পরিণত। ইহার বর্তমান নাম ‘পতেঙ্গা’। শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ‘পতঙ্গ’ হইতে বলিয়া মনে হয়।

(১৪) নহর – আরবী نهر=স্রোতস্বিনী, ঝরা, নদী।

(১৫) পরিন্দা জানোয়ার—ফারসী ‘পরিনদহ’—উড়ন্ত বা পালকবিশিষ্ট +ফা-জানওয়ার – জীব; উড়ন্ত পক্ষী।

(১৬) জহুরী—আরবী “জওহরী” جوهري=মণিমুক্তার ব্যবসায়ী।

(১৭) লোহার—লৌহকার>লোহআর>লোহার=যে লোহার কাজ করে।

(১৮) পরিচ—সংস্কৃত "পরিচয়" শব্দের সংক্ষেপ।

(১৯) সোহাগ—সং-সৌভাগ্য >সোহগ্গ >সোহাগ=আদর, প্রেম।

(২০) অচিন জোড়ায়—এমনভাবে জোড়াইয়া দেয় যে, কোন্ জায়গায় জোড়ানো হইল, তাহা চিনা যায় না।

(২১) বিদ্ধানাশি—মূল শব্দ "বিদ্ধানাশ" এখনও চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হয়। ইহার উৎপত্তি 'বদ্ধনাশ (যেমন 'বদ্ধ পাগল')> বিদ্ধনাশ (চট্টগ্রাম অপভ্রংশ) >বিদ্ধানাশি। 'বিদ্ধা'< বদ্ধ=সম্পূর্ণ অর্থে।

(২২) ফাঁফর—হতবুদ্ধি, জ্ঞানহারা। "ফাফর" শব্দটি দেশী।

(২৩) কৈতর—কবুতর। শব্দটি ফারসী কবুতর >কউতর >কৈতর> কৈতর (চট্টগ্রামী অপভ্রংশ)।

(২৪) সমে—সং-সঙ্গ+এ=সঙ্গে>(মধ্যবাং) সম্বে>সম্‌হে>সমে =সঙ্গে, সাথে, একত্রে।

(২৫) বৃন্দাবন—বৈষ্ণবের তীর্থস্থান। মুসলমানেরা এই শব্দটিকে চিরকাল 'আমোদোদ্যান' অর্থে সাহিত্যে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং, ইহার অর্থ—প্রমোদোদ্যান।

(২৬) রূপের মুরারী—রূপবান শ্রীকৃষ্ণ। এখানে—অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী।

(২৭) কাঁচা গীম—প্রাচীন বাংলায় "কাঁচা" শব্দের রূপ "কাঞ্চা"; ইহা প্রাকৃত রূপ হইতে পারে। এই প্রাকৃত "কাঞ্চা" শব্দের মূল অজ্ঞাত। বিশিষ্ট অর্থে "কাঞ্চা গ্রীবা"> কাঁচা গীম—এই স্থলে 'কাঁচা' অর্থে 'সুন্দর'; 'তরুণ'। তুলনীয়—'কাঁচা সোনা,' 'কাঁচা ছেলে' ইত্যাদি।

(২৮) বিচারিলু—বিচারিয়া দেখিলাম। বাং√ বিচ্‌রানো=খুঁজিয়া বা অন্বেষণ করিয়া দেখা; তল্লাস করা।

(২৯) বিসরিলা—ভুলিলা, (বিস্মরিত>বিসঁরিঅ) ক্রিয়া—বিস্মর +ইলা>বিসরিলা।

(৩০) মহামন্ত—মহা+মন্ত=মহামন্ত>মহাঅন্ত>মহান্ত>মোহন্ত= অনেক বড় বা বিখ্যাত। ইতঃপূর্বে বারংবার "মোহন্ত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (আত্মবিবণীর ৭ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)।

(৩১) ছিরীমতী—"শ্রীমান" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'শ্রীমতী'। শ্রী>ছিরী (স্বরভক্তিতে) তুলনীয়:—'কাজের ছিরী' নাই। (আত্মবিবরণীর ১২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)।*

---

* ২৬-৬-৬৫ তারিখে প্রবন্ধটির মূল অংশ বাঙলা-একাডেমীর সভায় পঠিত।

ফজলুল হক সেলবর্সী

জন্ম—১৮৯৫ (১৮৭৩-১৯৬১)

জনাব ফজলুল হক সেলবর্সী বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা মুজাহিদ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার সেল্‌বরস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট তখন আসাম-প্রদেশের একটি মুসলিমপ্রধান উন্নত জেলা। জগতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি আপন বলিতে কেহ নাই, এমন কি অর্থ-বিত্ত, বাড়িঘর প্রভৃতি আপনার বলিতেও কিছুই নাই। তিনি এখন (১৯৫৬) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-শহরেই জাতির মঙ্গল চিন্তায় আত্মসমাহিত ও একান্তই বিষয়-নির্লিপ্ত জীবন যাপন করিতেছেন। ঢাকা শহরের জনারণ্যে অজ্ঞাতবাসে তাঁহার কপর্দকহীন জীবন-দীপ নিবু-নিবু। অদৃষ্টের এই পরিহাস কি নির্মম কি অরুন্তুদ।

বিদেশী ইংরেজী-শাসনের পতন ঘটাইয়া দেশকে স্বাধীন এবং তৎসঙ্গে খ্রীষ্টানদের কবল হইতে বিশ্ব-মুসলমানদের মুক্তিদান করাই ছিল, সেল্‌বর্সী সাহেবের যৌবনের একমাত্র স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তিনি যৌবনেই ‘মুজাহিদের’ পুণ্যব্রত গ্রহণ করেন। ইসলামে ‘মুজাহিদ’ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি মনে প্রাণে সেই জেহাদী মনোবৃত্তির বিকাশ ও কর্মক্ষেত্রে তাহার রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে, তিনি দুর্মদ-যৌবনের দুরন্ত-বেগ বক্ষে ধারণ করিয়া অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের ন্যায় দেশের ও তৎসূত্রে বিশ্বের মুসলমানদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন নারীর পাণিগ্রহণ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা পালনে তাঁহাকে যে অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার ও জীবন-ব্যাপী দুঃখ-দুর্দশা বরণ করিতে হইয়াছে, তাহা তিনি আজ পর্যন্ত (১৯৫৬) বিনা ওজরে হাসিমুখেই সহ্য করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই অসাধ্য সাধনের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

বলিতে কি, তাঁহার ন্যায় আদর্শবাদী লোক বাংলা-ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে বিরল,—শুধু বিরল নয়, একরূপ নাই বলিলেও চলে। এই আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়াই তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-রাজরোষে পতিত হন এবং সানন্দে দুই বৎসরের জন্য কারাবরণ করেন। এই আদর্শের অপূর্ব মহিমায় আকৃষ্ট হইয়াই তিনি 'খিলাফৎ আন্দোলনের' সময় মুসলমানের পক্ষে পরাধীন ভারতে বাস করা অসমীচীন মনে করিয়া, স্বাধীন মুস্‌লিম-রাজ্য আফগানিস্তানে 'হিজরৎ' করেন এবং তথায় দীর্ঘদিন বাস করিয়া পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিবার পথে সীমান্তপ্রদেশের 'শবকদর' নামক স্থানে “ফ্রণ্টিয়ার কন্‌স্টিবুলারী'র হাতে গ্রেফতার হন। ফলে, পেশোয়ার ক্যান্‌টন্‌মেণ্টে এক আলো-বাতাসহীন নির্জন-প্রকোষ্ঠে দুই মাস যাবৎ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাঁহাকে আটক থাকিতে হয়।

অতঃপর যে দীর্ঘদিন ধরিয়া চরম দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহার অমর-আদর্শদীপ্ত জীবন অতিবাহিত হয়, সে দিনের বর্ণনা করিতে গেলে আমীর হামজার এক বিরাট দাস্তান রচনার প্রয়োজন। তথাপি, তিনি আপন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাই দেখিতে পাই, ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব-পর্যন্ত, তিনি এই আন্দোলনের সহিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বিজড়িত। পরিশেষে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার স্বপ্ন সফল হইল; স্বাধীন-দেশের স্বাধীন-পাকিস্তানে মুসলমানেরাও দাসত্বের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়া আজাদী লাভ করিলেন। কিন্তু, এই অঘটন ঘটাইতে গিয়া তিনি জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইলেন। তাঁহার চিরকৌমার্য-ব্রত যেমন ঘুচিল না, সংসারে সংসারী সাজিবার সাধও তেমন মিটিল না। তবে, তিনি এখন স্বাধীন মুস্‌লিম্‌ রাজ্যের স্বাধীন নাগরিক,—ইহাই তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট জীবনের পরম ও চরম সান্ত্বনা।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী ফজলুল হক সেলবর্সী সাহেব যে একজন আদশবাদী স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিক, তিনি তাঁহার জীবন দিয়াই তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমকে প্রধানতঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তখনও সাংবাকদিতা কোন অর্থকরী বৃত্তি নহে। তবে, সংবাদ-পত্র যে জাতিকে জাগাইবার একমাত্র না হইলেও একটি প্রধান উপায় এই সত্য যে কতিপয়

শিক্ষিত মুসলমান তখন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেলবর্সী সাহেব অন্যতম। তাই, অর্থের কথা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা না করিয়া, জীবিকার সংস্থানের কথা এক মুহূর্তের জন্যও না ভাবিয়া, কেবল স্বজাতি ও স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগের একটি আদর্শভিত্তিক সম্ভাব্য উপায়রূপে তিনি সাংবাদিকতাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, আমাদের দেশের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সাংবাদিকগণের বৈষয়িক-নীতি তাঁহার সাংবাদিকতায় কখনও অনুসৃত হয় নাই এবং তিনি জীবনে কখনও আপন আদর্শকে অর্থ, অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহের নিকট বিসর্জন দিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ এই কারণেই- কোন সংবাদপত্রকে তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। আবশ্যক হইয়াছে, সাংবাদিকতা ছাড়িয়া আন্দোলন করিয়াছেন, বক্তৃতা দিয়া জাতিকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, রাজদ্রোহের মহা অপরাধে হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছেন, এমন কি পরাধীন মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া স্বাধীন দেশে হিজরৎ করিতেও কসুর করেন নাই। ইহার ফাঁকে ফাঁকেই বারংবার তিনি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যেইমাত্র কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে, কথা নাই, সাংবাদিকতা ত্যাগ করিয়াছেন। এমন করিয়া তিনি অন্যূন সাতটি সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইতে হইতে সাংবাদিক জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সংবাদপত্রগুলির নাম ও তারিখ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। দৈনিক নবযুগ—সম্পাদক, ১৯২০ সাল।
২। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী—সম্পাদক, ১৯২৪ সাল।
৩। দৈনিক সুলতান—সম্পাদকীয় বিভাগ, ১৯২৭ সাল।
৪। সাপ্তাহিক আল্-মুসলিম—প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ১৯২৯ সাল।
৫। দৈনিক তক্‌বীর—প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ১৯৩৭।
৬। সাপ্তাহিক যুগভেরী—ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৪৩।
৭। সাপ্তাহিক মুসলিম—ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৪৬।

বাংলার নির্যাতিত ও অধঃপতিত মুসলমানদের জীবনে এই সংবাদপত্রগুলির প্রভাব গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। ইহাদের মধ্যদিয়া সেলবর্সী সাহেব মুসলমানদের মধ্যে যে নবজাগরণের সুত্রপাত করেন, তাহাতে পাকিস্তানলাভের পথ বিশেষ সুগম হইয়াছে।

লব্ধ, প্রতিষ্ঠ-সাংবাদিক সেলবর্সী সাহেব যে মহান-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাংবাদিকতায় হাত দিয়াছিলেন, সেই একই আদর্শের অনুসরণে তিনি সাহিত্য-সাধনায়ও ব্রতী হন। ফলে, তখনকার মুস্‌লিম-বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে তিনি কবি ও প্রবন্ধকার হিসাবে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তাঁহার বহু অগ্নিগর্ভ কবিতা ও প্রবন্ধ মাসিক "আল্‌-ইসলাম", মাসিক "সওগাত", মাসিক "মোসলেম ভারত", "ইসলাম দর্শন" প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে নিয়মিতমাসিকভাবে প্রকাশিত হইয়া বিদগ্ধ মুস্‌লিম্‌-বঙ্গের হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হয়। এখনও মনে পড়ে, ১৩২৩ সালের কার্তিক সংখ্যার মাসিক "আল্‌-ইসলাম" পত্রিকায় যখন নিখিল-ইসলামবাদিতার Pin-Islamism স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ইকবালের "চীন ও আরব হামারা" নামক সুবিখ্যাত কবিতার বাংলা অনুবাদ সেলবর্সী সাহেব প্রকাশ করেন, তখন মুসলিম-বঙ্গের ঘরে ঘরে সমবেত কণ্ঠে তান উঠিয়াছিল—

"আরব আমার, ভারত আমার,
চীনও নহে গো আমার পর;
জাহান-জোড়া মুসলিম আমি
সারাটি জাহানে বেঁধেছি ঘর।
আন্দালুসীয়ার কুসুম কাননে,
সজীব স্পেনের হসিত আননে,
বাঁধিয়াছিনু গো আমারি ঘর;
আজি—নীরব সমাধি মথিয়া পবনে
উঠিছে কাহার আকুল স্বর।"

স্বজাতি ও তাহার অতীত গৌরবের প্রতি প্রাণভরা দরদ না থাকিলে এমন চমৎকার মূলানুসারী অনুবাদ যেমন সহজ হইত না, কবিতায় বেশ ভাল হাত না থাকিলেও এমন প্রাঞ্জল কাব্যানুবাদ আত্মপ্রকাশ করিত না। সেলবর্সী সাহেবের পরে আরও কেহ কেহ ইকবালের এই কবিতাটির বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু, আজ পর্যন্ত তাঁহাকে কেহই অনুবাদের কৃতিত্বে হার মানাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

পরাধীনতার গ্লানিতে যে-কবি মর্মাহত হইয়া জীবন বিনিময়েও স্বাধীনতা লাভের কঠোর পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে-কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া স্বাধীনতা লাভের মধুর স্বপ্ন দেখা তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। কবি

সেলবর্সী সে-স্বপ্ন যেমন নিজে নিজে দেখিয়াছেন, কবিতার মাধ্যমে তেমন অপরকেও দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন,---ইহাই তাঁহার ক্ষুদ্র-পরিসর কাব্য-সাধনার প্রধান কৃতিত্ব। তাঁহার এমন একটি প্রসিদ্ধ কবিতা 'সেন্ট হেলেনা'। কবিতাটি ১৩২৭ সালের মাঘ মাসে "মোসলেম ভারত" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবি সেন্ট-হেলেনা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়ানের দিবা-স্বপ্নের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া নিজের মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চিত্র যেমন করুণ, তেমনই হৃদয়স্পর্শী। স্বপ্নটি এইরূপ :—

"সুনীল বারিধীর জলরাশি অনন্তবিস্তৃত ও তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। এহেন অতল জলধি-বক্ষ ভেদ করিয়া "সেন্ট হেলেনা" যুগ যুগ ধরিয়া সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝড় ঝঞ্ঝায় তাহার উচ্চ শির কখনও অবনমিত হয় নাই; অবিরাম তরঙ্গের নিষ্করুণ আঘাতেও সে সমুদ্র-বক্ষে ঢলিয়া পড়ে নাই। তাহার পার্বত্য বক্ষে ''উইলোব বনে উন্মাদ সামুদ্রিক বায়ু কি যেন সতত খুঁজিয়া বেড়ায়। একদা দিবাবসানে-

ক্লান্ত দিনেশ পশ্চিমে নামে
রঞ্জিত করি জলধি-কায়,
দূর নীলিমায় পক্ষ মেলিয়া
লক্ষ বলাকা ভাসিয়া যায়।
উর্মি-প্রহত একটি চূড়ায়
অভাগা বন্দী বসিয়া একা,
পাষাণ-মূরতি দৃষ্টি খুঁজিছে
দূর ফ্রান্সের ধূসর রেখা।

হঠাৎ বিগত রজনীর সুখ-স্বপ্নের মত বন্দীর বিগত জীবনের অসংখ্য সুখ-দুঃখের চিত্র একের পর এক তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। চলচ্চিত্রের মত শৈশবের খেলার সাথীদের সহিত জন্মভূমি "কর্সিকা" মিলাইয়া গেল, কৈশোরের আলো-ছায়ার সহিত নিরুদ্দেশের পথে অভিসার ধীরে ধীরে থামিয়া আসিল, যৌবনের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন-সঙ্গিনীর মধুময় স্মৃতির সহিত জগজ্জয়ী দুরাশার ছবি ক্রমেই বিলীন হইল, প্রৌঢ়ের বিশ্বত্রাস সেনাপতির অপূর্ব চিত্রের সহিত সহস্র কর্ম-কোলাহল আস্তে আস্তে নিস্তব্ধ হইল। তারপর মনে হইল—

ওয়াটার্লু-নিশি কবে সে পোহাল
জীবন যামিনী হইল ভোর,
চির-স্বাধীনতা মুক্তি গরিমা
চিরতরে ওরে লভিল গোর।

এই সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জন্মভূমি ফরাসী দেশ হইতে তাঁহার বন্দীনিবাস সেন্ট-হেলেনা অবধি সাগর-মেখলার ন্যায় এক অপূর্ব সেতু বাঁধা হইল। এই ঐন্দ্রজালিক সেতু বাহিয়া ফরাসী দেশের বীর-পুত্রগণ তাঁহার সম্মুখে জমায়েত হইলেন। তাঁহারা কোষবদ্ধ তরবারি রাখিয়া দিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"ঋতুরাজ বিনে আঁধার কুঞ্জ
স্বভাব ধরেছে রুক্ষ্ম বেশ।
হায় নেপোলিয়াঁ কাঁদে ফরাসিয়াঁ
দুশমন মা-র টানিছে কেশ।

উঠ উঠ বীর, খোল তরবার,-
এ জগৎ নহে ধ্যানের ঠাঁই,
মায়ের শিকল কাটিবে ফরাসী
জননী তোমাবে ডাকিছে তাই।"

সহসা বন্দী উঠিল শিহরি
সুখের স্বপন ফুরাল হায়।
হেরিল উর্মি কখন কাঁদিয়া
ঢেলে গেছে বারি সারাটি গায়।

বীরের অশ্রু সিঞ্চিল ধরা
টুটিল নিমেষে ধ্যানের পুর,
উদাস-পবন "উইলো"—কুঞ্জে
গেযে গেল সেই ব্যথার সুর।

সেলবর্সী সাহেব কবি ও সাহিত্যিক দুই-ই। কিন্তু, তিনি গ্রন্থকার নহেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতে তাঁহার লেখাগুলি সংগ্রহ করিলে, ইতিমধ্যেই কয়েক খণ্ড মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করা যাইত। তিনি জীবনে

কখনও সে-বিষয়ে একান্তভাবে মনোযোগ দেন নাই। কারণ, গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইবার জন্য তিনি সাহিত্য-সেবা করেন নাই। সাহিত্য-সেবার মধ্য দিয়া দেশের ও জাতির সেবা করাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের বাণী প্রচার করিয়াই তিনি মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, গ্রন্থ লিখিয়া বা প্রচার করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন, এমন ধারণাও তাঁহার আদর্শের সহিত খাপ খায় নাই। এই সমস্ত কারণেই গ্রন্থকাররূপে তাঁহার প্রতিভার বিচার করা চলে না। এতৎসত্ত্বেও, তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার নাম "শহীদে আজম"। ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। ইহার সহিত তাঁহার জীবনের আদর্শের সামঞ্জস্য আছে। ইহাতে তিনি শিখদের সহিত মুসলমানদের জেহাদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই জেহাদে ইসমাইল শহীদ প্রভৃতি যে-সমস্ত মুসলিম নেতা শাহাদৎ বরণ করেন, তাঁহাদের আদর্শই সেলবর্ষী সাহেবকে বিংশ শতাব্দীতে মুজাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

সেলবর্ষী সাহেব নিজের জীবন দিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ, তাঁহার কার্যকলাপ ও তাঁহার মনীষা একদিন যাঁহাদিগকে স্বাধীনতা লাভে প্রেরণা দান করিয়া দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাঁহারাই আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক, এমন কি অনেকেই দেশেরও কর্ণধার। কয়জনের জীবনে দেশের এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য হয়? যে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক নিজের জীবনে দেশের স্বাধীনতা দেখিয়া যাইতে পারেন, তিনি নিশ্চয় ভাগ্যবান। বোধ হয়, এই কারণেই একান্ত দুঃস্থ, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়-জীবন সায়াহ্নে উপনীত হইয়াও, সেলবর্ষী সাহেব এযাবৎ এক শান্ত সমাহিত জীবন-যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জাতি ও দেশের প্রতি তাঁহার যে কর্তব্য ছিল, তিনি তাঁহার সামর্থ্যানুসারে তাহা সমাধা করিয়াছেন; তাঁহার প্রতি দেশ ও জাতির যে কর্তব্য আছে, দেশ ও জাতি তাহা কখন সম্পন্ন করিবে,---সে সম্বন্ধে অবহিত হইবার সময় ও সুযোগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

চির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক ও দিশারী সেলবর্ষী সাহেব ১৯৬১ সালে ৮৮ বৎসর বয়সে মরদেহ ত্যাগ করেন। দেশ কখনও তাঁহার এই ত্যাগের মর্যাদা দান করে নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য।।

নজরুলের কাব্যে তারুণ্য

এই পর্যন্ত কবি নজরুলকে নানা জন নানাদিক হইতে নানাভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবির যেই দিক্‌কে আমরা একটা বিশিষ্ট দিক বলিয়া মনে করি, সেই তারুণ্য-বিকাশের দিক হইতে কবিকে এই পর্যন্ত বড় কেহ দেখেন নাই বলিলে, সত্যের নিতান্তই অপলাপ করা হয় না। বলা বাহুল্য, কবির এই দিক্‌কে একেবারে বাদ দিতে গেলে তাঁহাকে অযথা পঙ্গু করিয়া তাঁহার প্রতি যে অপরিমিত অবিচার করা হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার মত অন্যদিক, এই কবিতে এখনও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া মনে হয়। এই পর্য্যন্ত কবির বাহ্যিক, অন্তর্নিহিত জীবনের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতি, প্রতিভা-বিকাশের ধারা, এবং কথাশিল্পী হিসাবে ভাব-প্রকাশ ভঙ্গীর প্রতি যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টি দিতে পারিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আমাদের সহিত এই বিষয়ে সম্পূর্ণই একমত হইবেন।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, বিগত কয়েক বৎসর হইতে নজরুলের অন্তর্জ্জীবন ও প্রতিভা সুর-শিল্পীর যেই রসঘন মনোরম বীথি ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে সাহিত্যরাজ্যে তাঁহার নবীন দিগ্বিজয়ের অভিযান আশাতীত গৌরব অর্জ্জন করিলেও, এই কয়েক বৎসরের কর্মতৎপরতার প্রতি একটু নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, তাঁহার তারুণ্য-বিষুবিয়সের অগ্ন্যুৎদ্‌গার সম্প্রতি নির্বাপিত হইয়া, ইহার ভস্মরাশির উপর এখন এক পুষ্পোদ্যান সৃষ্টির বিরাট ও মনোজ্ঞ আয়োজন করা হইতেছে। তরুণের এক হাতে প্রলয়-বিষাণ বাজে, আর হাতে সৃষ্টির বাঁশরী স্ফুরিত হয়। সুতরাং নজরুলের প্রলয়-বিষাণ থামিয়া সৃষ্টির বাঁশী বাজিতেছে ; ইহাতে কবিকে দোষ দেওয়া চলে না। আজ আমরা কবিকে জ্বালাময় তারুণ্যের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা করিব : এ দিক হইতে দেখিবার সময়ও আসিয়াছে। কেননা কবির বিশ্বগ্রাসী জ্বালা আজ স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কবিকে আজ যেই ভাবে দেখিব, তাঁহার প্রতিভাকে যেই ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব, তাহা রসায়নাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরিয়া নহে। ইহা কবির তারুণ্য-জ্বালা-বিমুগ্ধ কোন তরুণের উপলব্ধি ও অনুভূতি মাত্র। সুতরাং আমাদিগকে কেহ যেন গোড়ায় ভুল করিয়া না বসেন। সুরস্রষ্টা ও শিল্পী হিসাবে কবির যেই নব নব প্রতিভা প্রকাশ পাইতেছে, এখনও তাহার অবসান হয় নাই; তাহা আজ বাঙালী মাত্রই উপভোগ করিতেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনা সেই দিক হইতে নীরব থাকিবে।

এই পর্যন্ত আমরা জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সাহিত্যোদ্যান পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং প্রত্যেকের সৃষ্ট সাহিত্যে একটি নির্বাক মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। আমাদের মনে হয় এই নির্বাক মূর্তি যেই সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা উপবন নহে, কাব্য নহে, সাহিত্য নহে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে---যে শিল্পী ইহাকে যেমন করিয়া গঠন করে ইহা তেমন ভাবেই শোভা পায়; এবং শিল্পীর সৌন্দর্যানুভূতি ও শিল্পজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ইহাকে কখনও যেমন সুন্দর পুরুষের মূর্তিতে শোভা পাইতে দেখিয়াছি, তেমনই সুন্দরী রমণীর মূর্তিতেও আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। কবি নজরুলের কাব্যেও আমরা এইরূপ একটি নির্বাক মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করি, এবং এই নির্বাক মূর্তি ইহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই জন্য কবিকে আমরা একটি বিশিষ্ট শিল্পী বলিয়া মনে করি।

কবি নজরুলের কাব্যে যেই নির্বাক মূর্তির সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সৌষ্ঠবময় তরুণের মূর্তি। এই তরুণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কখনও বা বিস্মিত কখনও বা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার এক চক্ষে বজ্রের জ্বালা আর এক চক্ষে স্নিগ্ধতা, এক হস্তে মঙ্গল-ধ্বজা আর হস্তে জগজ্জয়ী সর্বনাশা করবাল। ইহার এক পদতলে বিশ্বের দুঃখ-দুর্দশা ও নরকের অগ্নি মথিত হইতেছে, আর এক পদতলে শস্য-শ্যামল ধরিত্রীর সৃষ্টি হইতেছে। ইহার বক্ষে অপরিমিত তেজ, ললাটে সত্যের দীপ্তি, ও শীর্ষে মণ্ডলাকৃতি দেবজ্যোতিঃ শোভা পাইতেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই তরুণ দেশে-দেশে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং অনাগত ভবিষ্যতের বক্ষে এই তরুণ অনঙ্কুরিত বীজ সদৃশ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যুগে-যুগে

বার বার নববেশে নূতনভাবে, অভিনব মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিবে। এই তরুণ শুধু জাগিতে জানে, ঘুমাইতে জানে না, বাঁচিতে জানে, মরিতে জানে না, আসিতে জানে, ফিরিয়া যাইতে জানে না ;—ইহা যে “অজয়, অমর, অব্যয়, অক্ষয় পুরুষোত্তম সত্য।” যখনই আমরা এই তরুণের সম্মুখীন হইয়াছি, তখনই ইহার সম্মুখে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল মনে করিয়াছি এবং ভয়ে ও ভক্তিতে ইহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়াছি।

নজরুলের কাব্যে উন্নত দর্শন খুঁজিতে যাওয়া ঠিক নহে। আমরা নজরুলকে দর্শনের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করি নাই। তাঁহাকে ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক রূপেও পাইতে পারা যায় বলিয়া মনে করি না। কবি এই বিষয়ে বেশ সচেতন; তিনি “ভবিষ্যতের নবী” নহেন বলিয়া একস্থলে স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি “বর্তমানের কবি”,—,আমাদেরই কবি—অর্থাৎ তরুণ-বঙ্গের তরুণ-কবি। তাই বলিয়া, তাঁহাকে ইংরেজ কবি Byron (বাইরন)-এর সঙ্গেও তুলনা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। তরুণ বঙ্গ দর্শনিক চাহে তত্ত্ব না, Mysticism বা মর্মবাদও তাহার কাম্য নহে; সে চায় অগ্রপথিক, সে চায় অগ্রগমন, সে চায় মরণ দিয়া জীবন বরণ। তাহার কাছে মূক ও চিন্তাশীল দার্শনিক যতখানি প্রিয় নহে, মহাপ্রলয়ের মহানকীব ততখানি প্রিয় ও ততখানি আপনার। কোন তরুণ দর্শনকে লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিবার অবসর তাহার কোথায়? তাহার ভিতরের প্রেরণা, অন্তরের ব্যঞ্জনা, আগে চলার স্বাভাবিক অভিলাষ, সর্বোপরি তাহার হৃদয়ের সচেতন সাত্বিক আত্মা তাহাকে স্বতঃই জাগ্রৎ, চলচঞ্চল ও উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখে। তরুণের সচল, স্বাধীন আত্মা যখন চলিতে চায়, তখন বাধা আসিয়া তাহার চলার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলে, সে কুলুনাদিনী উদ্দাম পার্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাহা পায়ে ঠেলিয়া “উল্লাসে ছুটিতে চায়, ভুধরের হিয়া টুটিতে চায়।” চলাতেই তাহার সুখ, আপনাকে সর্বাধিক সঞ্চারিত করাতেই তাহার আনন্দ। দিকে-দিকে দেশে-দেশে আপনাকে বিস্তার করিতে গিয়া নিজের প্রকাশকে ব্যক্ত ও মুক্ত করিতে, যত বাধা, যত বিপত্তি, যত ঝঞ্ঝা তরুণ তাহার তেজোদীপ্ত বক্ষে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লয়, তাহার দুর্দম আনন্দে “তাথৈ” নাচে পশ্চাতে ফেলিয়া যায়। কবি নজরুল তরুণের কবি। তাই, তরুণের সুপ্ত হৃদয়ের আচমকা জাগরণ, তরুণের অকস্মাৎ

আত্মপরিচয়ের বিস্ময়-বিহ্বলতা, স্বয়ংপ্রকাশের, আত্মস্ফুরণের, অহংসঞ্চারের পূর্ণ বেদনা যখন "বিদ্রোহী"র মূর্তিতে তাঁহার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিল, তখন তিনি প্রেরণা-প্রদীপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।"

কবি আজ সত্যই উন্মাদ; কেননা তিনি আজ তাঁহারই মধ্যে চিরতরুণের আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছেন। কস্তুরীর জন্মলাভে মৃগ যেমন উন্মাদ হয়, আপন গন্ধে আত্মভোলা হইয়া পর্বতে প্রান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়, তারুণ্যের প্রতীক কবি আত্মপ্রকাশের বেদনায়, আত্মসঞ্চারের ব্যথায় আজ সত্যই উন্মাদ। কবির আজ সমস্ত বাঁধ খুলিয়া গিয়াছে; তাঁহার পাষাণ-প্রাচীর আজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে; তাই কবি আজ কোন বাধা মানিবেন না, কোন বিপদ গ্রাহ্য করিবেন না, তিনি আজ "তাথিয়া তাথিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল" নাচিয়া ফিরিবেন। কিন্তু কবিকে যদি ,"আপনার তালে মুক্ত জীবনানন্দের" মত নাচিয়া চলিতে হয়, নিশ্চয় কোন মহালক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া, কোন মহামন্ত্রকে বক্ষে লইয়া আত্মোদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। কবি তাহাও করিয়াছেন। তিনি যে মহান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া তদভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ভাষায়,—

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত,
যবে—উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।"

ইহাই কবির মহামন্ত্র, ইহাই কবির লক্ষ্য। ইহাকে শুধু কবির লক্ষ্য ও মহামন্ত্র বলিলে চলিবে না—ইহা তরুণের সঞ্চারোন্মুখ আত্মার আত্মপ্রকাশ, অসুন্দরের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিপক্ষে, তরুণ্যের চিরজাগ্রৎ, চির উদ্বুদ্ধ ও চিরদিপ্ত আত্মার বিজয়-অভিযান ঘোষণার মহা-কারণ। কবিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন,—

"আমি---অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি---অরুণ খুনের তরুণ বিধির দর্পহারী।"

সত্যই তরুণ তাহার স্বাভাবিক তারুণ্য শক্তি বলে বলীয়ান বলিয়া নিকৃষ্ট বিধির দর্প, অসুন্দর ও অসত্য বিধানকর্তার অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিবার অধিকার দাবী করিতে পারেন।

কবি জানেন, তাঁহার লক্ষ্য পেঁছাইতে হইলে, শত শত বাধা, সহস্র সহস্র সংস্কার, পর্বতপ্রমাণ অসত্য ও মিথ্যাকে অবহেলায় অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ; তাই তিনি নিজেকে যাবতীয় বাধা, সংস্কার, মিথ্যা ও অসুন্দরের বহু উর্ধ্বে স্থাপন করিয়া আপনাকে বীর---মহাবীর রূপে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিলেন,

"বল বীর---বল উন্নত মম শির!
শির---নেহারি আমারি নতশির হিমাদ্রির!
বল বীর---
বল---মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি,
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি,
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর, ---
আমি---চিরউন্নত শির!"

এমন করিয়া কবির ললাটে যে "রুদ্র ভগবান" জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই অগ্নির দাবদাহে জগৎ পুড়িয়া মরিবে, মিথ্যা, গ্লানি, অন্ধকার ভস্ম হইয়া যাইবে ; জগৎ জ্বলিয়া পুড়িয়া সত্য হইবে, আনন্দময় হইবে,---ইহাই কবির চলচঞ্চল তরুণের আশা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা। কিন্তু এই "চির দুর্দম, চির দুর্বিনীত, নৃশংস মহাবিদ্রোহী" যতদিন না জগতের অসত্য, অসুন্দর, মেকী বিদূরিত হয়, ততদিন কি করিবে? তদুত্তরে এই মহাবিদ্রোহী বলিয়া দিলেন,---"আমি দাবানল দাহ দাহন করিব বিশ্ব।" তাহা হইলে কি তিনি শুধু বিশ্বকে দাহন করিয়া চূর্ণ করিয়া, ধ্বংস করিয়া,

"তাথিয়া তাথিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল মথিয়া" ফিরিতে চাহেন? তিনি কি শুধু তূর্য নিনাদ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া গাহিয়া চলিবেন,—

"আমি —দুর্ব্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।"

এই উচ্ছৃঙ্খলকে লইয়া কি করা যায়? এ যেন জগতকে এক মুঠায় গ্রাস করিবার পণ করিয়া বসিয়াছে। না, তাহা নহে; তাহার ধ্বংস-লীলার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি লীলাও চলিবে; কবি আমাদিগকে সেই আশ্বাসও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আমি—শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া কভু বিপুল-ধ্বংস-ধন্যা।"

এমন ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলা অকৃত্রিম বন্ধুর মত হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে বাংলা-সাহিত্যে আর দেখি নাই। নজরুলের তারুণ্যের মধ্যে এই দুই বিষম গুণ এমনইভাবে মিশিইয়া গিয়াছে যে, উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী প্রীতি-দায়িনী ও প্রেরণা-সঞ্চারিণীরূপে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাই ইহা একদিক হইতে আমাদিগকে যেমন বিস্মিত ও বিমোহিত করে, অপর দিক হইতে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করে।

তরুণের জাগরণকে যাঁহারা শুধু বিপ্লব, আর তাহাদের অভিযানকে তাহাদের অগ্রগমনকে যাঁহারা শুধু ভাঙ্গন-যন্ত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভুল করিয়া থাকেন। সত্য বটে, তরুণ জগতের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করে, কিন্তু ন্যায় সত্য ও সুন্দরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে কে? শক্তি যেমন ভাঙ্গার বিষাণ বাজাইতে জানে, তেমনই সুন্দর সৃষ্টির আগমনী-গানও গাহিতে জানে। শক্তি যাহার নাই সে ভাঙ্গিতেও পারে না, গড়িতেও শিখে না। তরুণ অফুরন্ত শক্তির অনন্ত উৎস; তাই সে একদিকে যেমন ভাঙ্গন-যন্ত্র, অপর

দিকে তেমন স্রষ্টা। যেই তরুণ শুধু ভাঙ্গিতে জানে, গড়িতে জানে না, সে প্রকৃত ও পূর্ণ তরুণ নয়,---সে বিশ্বের অভিশাপ, সে উচ্ছৃঙ্খল। কবি নজরুলের মধ্যে যেই তরুণ জন্ম লাভ করিয়াছে, সেই তরুণ শুধু বিশ্বের অভিশাপ নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সে বিশ্বের আনন্দসুন্দর স্রষ্টা ও বটে। এই তরুণ একহাতে ভাঙ্গে, আর হাতে মাধুর্য ও প্রেম দ্বারা জগতকে মধুময় করিয়া তোলে। আমরা আর একজন তরুণ কবির বিষয় জানি, যিনি একদা জগতে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন---তরুণ শুধু ভাঙ্গিতে জানে না, সে জগৎকে নূতন করিয়া সুন্দর করিয়া গঠন করিতেও জানে। এই কবি বিশ্ববিখ্যাত শেলী। জগতের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তিনি একদিন জগতের বর্তমান সমাজ ও চিন্তা বিপ্লবের আগমনী গান করিয়াছিলেন। তাঁহার Prometheus unboud বা "মুক্ত প্রমেথিউস্" এই বৈপ্লবিক-আগমনী-গানের বিজয়-স্তম্ভ। তাঁহার Alastor Quin Male প্রভৃতি কবিতাতেও বিপ্লবের বিষাণ মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার West Wind বা "পশ্চিমা ঝঞ্ঝা" নামক কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে, তিনি বিষদভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, "পশ্চিমা-ঝঞ্ঝা" শুধু পুরাতনকে ধ্বংস করে না, সজীব বীজমালাকেও দিকে দিকে ছড়াইয়া দেয়। ইহা একদিকে যেমন Destroyer বা ধ্বংসকারী, অপরদিকে তেমনই Preserver বা রক্ষাকারী অর্থাৎ স্রষ্টা। কবি নজরুলের তরুণও শ্রাবণ-প্লাবনের ন্যায় কভু ধরনীকে পলি দ্বারা বরণীয়া কভু বিপুল ধ্বংসে উচ্ছন্না করিয়া থাকে। তাঁহার তারুণ্যের সৃষ্টির দিক তিনি নিম্নলিখিত গানে সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:---

"চল্, চল্, চল্,
ঊর্দ্ধে গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল;
চলরে চলরে চল্।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত,
আম্‌রা আনিব রাঙ্গা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

* * *

তাজা বতাজার গাহিয়া গান,
সজীব করিব মহাশ্মশান,

* * *

আমরা গড়িব নূতন করিয়া
ধূলায় তাজমহল।

তাঁহার তরুণেরা "উষার দুয়ারে আঘাত করিয়া রাঙ্গা-প্রভাত আনিবার জন্য", "তাজা বতাজার গান গাহিয়া মহাশ্মশানকে সজীব করিবার জন্য" এবং নিকৃষ্টতম "ধূলার মধ্য হইতে নূতন করিয়া বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল রচনা করিবার জন্য" "শহীদী ঈদের সেনা"-রূপে সাজিয়াছে। তাহাদের মাথার উপরে বাজ ডাকিতেছে, পদতলে ধরণী মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইতেছে, তাহারা ধরণীর মহাশ্মশানকে সবুজ ও সজীব করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দৃশ্য কি সত্যই বিস্ময়কর ও মনোরম নহে। ইহা কি মরা গাঙ্গে বান ডাকায় না, মরা প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করে না?

তরুণ সুন্দরের উপাসক, অমৃতের পুত্র। সুন্দর যেখানে প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানে অসত্য ও অসুন্দর থাকিতে পারে না। সামঞ্জস্য যেখানে নাই, সহস্র বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াও আনন্দ যেখানে পলাইয়া বাঁচে, দানবীয় প্রভাব যেখানে মানবীয় প্রভাবকে জড় ও নির্জ্জীব করিয়া দেয়, চিরসুন্দরের প্রকাশ তথায় অসম্ভব। সুন্দর যেখানে প্রকাশিত হইতে পারে না, অমৃতের পুত্র তরুণ তথায় বাঁচিতে পারে না। কেননা অসুন্দরের সহিত তাহার বিরোধ অনিবার্য। এমন এক সুন্দরের রাজ্যে তরুণের বাস,—যেখানে সকলেই সমান, যেখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খ্রীস্টান কি বৌদ্ধ নাই, প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব নাই, সকলই সবুজ, সকলই আনন্দ, সকলই মধুর। তাই তরুণ যেইখানে অসুন্দর, অসামঞ্জস্য ও নিরানন্দকে দর্শন করে, সেইদিকেই প্রাণের আবেগে দুর্দম প্রেরণায় অভিযান ঘোষণা করে। তরুণের কবি জাগ্রত-বসন্তের প্রথম কোকিল নজরুল তাহাই করিয়াছেন; তাঁহার তরুণের রাজ্যে ভেদাভেদ নাই; তথায় মানুষের চেয়ে সুন্দর ও মহীয়ান আর কিছুই নাই; মানুষের বেদনা ও আর্তনাদ তাঁহার সুন্দর দৃষ্টির সম্মুখে যতখানি বিসদৃশ ও অসুন্দর, তেমন আর কিছুই নহে। তাই কবি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া ব্যথাতুর চিত্তে ঝঙ্কার দিয়াছেন,—

"নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান'
উচ্চ কণ্ঠে উচ্চার আজ
"মানুষ মহীয়ান'।"

অন্যত্র দেখিতে পাই:—

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্মনীতি,
সব দেশে সবকালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি!"

এই যে মানুষের বেদনায়, মানুষের দুঃখে ও ভেদাভেদে ব্যথিত কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ, তাহা একবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিছুদিন পূর্বে রুষ রাজ্যেও তাহা মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে; আজ হঠাৎ দীপ্ত ও ভাস্বর মূর্তি পরিগ্রহণ করিয়া তাহা বাংলার বুকে নজরুলের মুখ দিয়া জ্বলন্ত ভাষায় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবি আজ যেই দিকেই মুখ ফিরাইতেছেন, সেইদিকেই দেখিতেছেন, অসুন্দর ও অসত্যের বিভৎস লীলা। চতুর্দিকে শোষণের দুর্বার রথ-চক্র মানুষকে নিষ্পেষিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, নীচ স্বার্থের কৌতুক মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করিতেছে। ব্রাহ্মণ আজ পূজা-আহ্নিকে লাগিয়া যায় জীবিকার জন্য, মোল্লা মস্‌জিদে আজান দেয় অর্থের খাতিরে; ধর্ম আজ প্রাণহীন, সত্য-সুন্দর ভগবান আজ নির্বাসিত। তাই, কবির মধ্যে লুক্কায়িত তরুণটি অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মাদ হইয়া কবির কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে:—

"হায়রে ভজনালয়
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃণা করি,
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নেও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল, মুর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ;—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"

এই যে মানুষকে মহীয়ান করিয়া দেখিবার দৃষ্টি, মানুষের জন্য উচ্ছল সমবেদনার স্ফূরণ, তাহা এখনও থামে নাই। তরুণের কবির নিকট মানুষ কখনও হেয় বা ঘৃণ্য নহে; কিন্তু তাই বলিয়া সুন্দর ও সত্যের উপাসক তরুণ, মানুষের পাপকে মানুষের অসৌন্দর্যকে কখনও বড় বলিয়া গ্রহণ করে নাই এমন কি আমল পর্যন্ত দেয় নাই; সে যে তাহা করিতে পারেও না। মানুষ যে তাহার কাছে মহীয়ান ও গরীয়ান তাহা সত্য, মানুষের দুঃখ ও বেদনা, মানুষের বিষাদ ও আর্তনাদ তাহার কাছে একটুও মিথ্যা নয়,—কিন্তু তাই বলিয়া সে মানুষের পাপকে প্রশ্রয়, মিথ্যাকে সমর্থন এবং অসুন্দরকে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিতে পারে না। তরুণ্যের কবি নজরুলের "পাপ", "বারাঙ্গনা," চোর-ডাকাত" "মিথ্যাবাদী" প্রভৃতি কবিতায় তাহা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল কবিতায় কখনও পাপী, বারাঙ্গনা বা চোরডাকাত প্রভৃতিকে তাহাদের পাপের জন্য প্রশ্রয় দিয়া বড় করিয়া দেখান হয় নাই। কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা এই,—পাপী পাপ করুক, বারাঙ্গনা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকুক, চোর-ডাকাত সুন্দরের বিনাশ করুক, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার তুমি কে? সত্য সুন্দর ভগবান তাহাদিগকে ঘৃণা করেন না, আল্লাহ তাহাদিগকে অত্যাচারিত বা বিনাশিত করেন না,---তুমি তাহাদিগকে ঘৃণা কর কোন্ অজুহাতে? তাহাদের কর্মকে ঘৃণা কর, মানুষ হিসাবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। তাহাদের কাজকে ঘৃণা করিতে হইবে বলিয়া যে ব্যক্তিটিকেও ঘৃণা করিতে হইবে, এমন কোন কথা কোন শাস্ত্রে লিখিত নাই। যদি কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, কবি সে শাস্ত্রকে বিশ্বের কল্যাণকামী নৈতিক আদর্শসূত্র হিসাবে মানিতে রাজি নহেন।

এই প্রসঙ্গে কবি আরও বলিতেছেন, আমরা নিশ্চয় পাপীদের পাপকে ঘৃণা করি ও চিরদিন করিব, কিন্তু আবরণতলে অনুষ্ঠিত তাহাদের চেয়েও বেশী পাপীর পাপকে অথবা স্বয়ং পাপীকে ঘৃণা করি না। ইহার কারণ কি সমাজের সংস্কার নয়? তাঁহার মূল বক্তব্য হইল,—পাপকে ঘৃণা করিতে শিখ, তাহা ভদ্রবেশেই হউক বা অভদ্র বেশেই হউক; কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিওনা। এই স্থলে কবির যুক্তি কি সুন্দর তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার "মানুষ" শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"মস্‌জিদে কাল শিরনী আছিল,—অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে,—বাবা আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন'।
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা,—ভ্যালা, হল দেখি লেটা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে। নমাজ পড়িস্ বেটা?'
ভুখারী কহিল,—না বাবা', মোল্লা হাঁকিল,—'তাহলে শালা,
সোজা পথ দেখ্।' গোস্ত রুটি নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা!
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে,—
'আশীটা বছর কেটে গেল আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু!
তব মসজিদে-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।"

"পাপ" নামক কবিতায় তরুণের বাণী কি বজ্র কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। এখানেও কবি পাপকে প্রশ্রয় দেন নাই। কবি বলিয়াছেন,—হে জগৎ, পূর্বে তোমার নিজের পাপ সংশোধন করিয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ হও; তারপব পাপের বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিও। পাপকে দূরীভূত কর প্রেমের দ্বারা, মিথ্যাকে বিতাড়িত কর সৌন্দর্যের দ্বারা, তরুণের নিকট ইহা কবির মহাবাণী। কবি নিম্নলিখিত রূপে তরুণদিগকে এদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে অনুরোধ করিয়াছেন,—

সাম্যের গান গাই,
যত পাপী তাপী সব মোর বোন্ সব হয় মোর ভাই,
এ পাপ মুলুকে পাপ করেনিক কে আছে পুরুষ নারী?
আমরা ত ছার;—পাপে পঙ্কিল, পাপীদের কাণ্ডারী!
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ যে টল মল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল।
আদম হইতে শুরু ক'রে এই নজরুল তক্ সবে;
কম বেশি করে পাপের ছুরিতে পুণ্য করেছে জবে।

বিশ্ব পাপস্থান,
অর্ধেক এর ভগবান আর অর্ধেক শয়তান।
ধর্মান্ধরা শোনো,
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো।"

"চোর ডাকাতে"ও কবির সেই একই বাণী:—

"কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে,
চারিদিকে চলে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।
চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্মরাজ,
জিজ্ঞাসা কর বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ।"

তারপর "বাবাঙ্গনা" কবিতায় কবির যে অমর বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহা জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম প্রচারকদিগের বাণীর নীচেই স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা দেখিতে পাই, যিশুখ্রীষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন, নিজের পাপের জন্য নিজেই দায়ী; তাহা অপরকে স্পর্শ করিতে পারে না। তারপর কোরান শরীফেও সেই বাণী প্রচারিত হইয়াছে। মাত্র সেই দিনের কথা, ষোড়শ শতাব্দীতে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব জগাই মাধাই-এর মত দুরাচার ও বারমুখী প্রভৃতি বাবাঙ্গনার মত দুরাচারিণী স্বৈরিণীকে, পাপের জন্য ঘৃণা না করিয়া প্রেমের দ্বারা জয় করিয়া মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সহস্র সহস্র সংস্কারজর্জর এই দেশে ধর্মের বাণী কতদূর কার্যকরী তাহা চক্ষের সম্মুখেই বর্তমান। তরুণ চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে, ধর্মের বাণী আজ কেবল ধর্ম-গ্রন্থে ও মিশনারীর মুখে পর্যবসিত; কর্মক্ষেত্রে চক্ষের সম্মুখে তাহার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ধর্ম আজ নির্জীব ও সংস্কার যন্ত্রণায় ক্লীব। তাই, তরুণ আজ আবার ধর্মের বাণীরই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বালতেছে,—হায় আজ এক মানুষের পাপের জন্য অপর মানুষ দায়ী হইবে কেন? মানুষের সম্বন্ধ পাপের এবং তৎসূত্রে ঘৃণার উদ্রেক করিবে কেন? আজ পাপীর কাজকে ঘৃণা না করিয়া পাপীর ব্যক্তি-টুকুকে ঘৃণা কারিবারই বা কারণ কি? তাই, কবির মুখ দিয়া তরুণ ঘোষণা করিল,—

"কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুথু ও গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা সম সতী মায়ে।

নাই হ'লে সতী তবু ত তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদেরি মত তারা আমাদেরই জ্ঞাতি,
আমাদেরি মত খ্যাতি যশমান তারাও লভিতে পারে,
তাঁদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।"

কবি নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষকে কি মহা আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছেন। মানুষকে এত বড় আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনাইবার একমাত্র অধিকারী যে-তরুণ, তার মান-অপমান জ্ঞান নাই, সে সংস্কার-বিজ্ঞতায় অন্ধ; তাই তরুণ বলিতে পারে,---মা বারাঙ্গনা! তোমরা ছোট নও, সমাজের অন্ধ সংস্কারই তোমাদিগকে ছোট করিয়াছে, পিশাচ সাজাইয়াছে, নতুবা সমাজভুক্ত অপরাপর লোকের ন্যায়, তোমাদের মধ্যেও রক্ত-মাংসবিশিষ্ট মনুষ্য হৃদয় বর্তমান আছে; তোমরা মানুষ; আবার তোমরা মানুষ হও। তোমরা মনে করিও না, তোমরা চির নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত এবং তোমাদেরসন্তান-সন্ততি চিরতরে ডুবিয়াছে। মানুষ হও, তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে মানুষ কর, তোমদিগকে ঘৃণা করিবে কে?

আমরা বলিয়াছি, তরুণ মাত্রই প্রাণ চঞ্চল; সে স্থানু নহে; সে বসিয়া থাকিতে পারে না। সে চলিবে,—সে অভিযান করিবে,---অভিযানেই তাহার আনন্দ। কিন্তু তরুণের এই অভিযানে সেনাপতি সাজিবেন কে? অভিযানোন্মুখ তরুণ তাই কবির কণ্ঠে ঘোষণা করিল,---

"অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া জানেনা সন্তরণ,
কাণ্ডারী আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম্',---ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী, বল্‌,---ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার।"

কবির বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সাম্যবাদী তরুণের, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সেই ব্যক্তিই উপযুক্ত,---যিনি হিন্দু চিনেন না, মুসলমান জানেন না, চিনেন শুধু মানুষ আর মানুষ।

কিন্তু তরুণের এই বিজয়দৃপ্ত পথ কুসুমাস্তৃত নহে; পদে পদে তাহাকে আহত ও ব্যর্থ হইতে হইবে; তাহার এই দুর্নিবার জয়যাত্রায়, মধ্যে মধ্যে

নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় মুর্ছিত হইয়া পড়িতে হইবে। এ ক্ষেত্রে তরুণ কি করিবে? তরুণের কবি নজরুল মাতৃমন্ত্র-দীক্ষিত তরুণের অগ্রনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে "সান্ত্বনার" মধ্য দিয়া, তরুণদিগকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন,—

"আজ্‌কে প্রাতে যে ঘুমাল কাল্‌কে প্রাতে জাগ্‌বে সে।
এই বিদায়ের অস্ত আঁধার উদয়-উষায় রাঙ্‌বে রে।
শোকের নিশির শিশির ঝ'রে,
ফল্‌বে ফসল ঘরে ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগ্‌বে ফুলের রাগ এসে।
যে মা সাঁজে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙ্‌বে সে।

* * *

মরা বাঁশের বাজ্‌বে বাঁশী কাটুক না আজ কুঠার তার,
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশী হয়ত বাজ্‌বে এই হেথায়!"

এ যাবৎ কোন বাঙালী কবির মুখে এহেন আশ্বাসবাণী আর শুনি নাই। বিরাট বাঙালী জাতির শোক সন্তপ্ত ম্রীয়মাণ হৃদয়ে যেই কবি আসিয়া আশার ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া আমাদিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহার সবল ও তেজঃপ্রদীপ্ত আত্মার নিকট মাথা আপনিই প্রণত হইয়া পড়ে। এহেন মহা আশার ভবিষ্যদ্বাণী একবার আমরা শেলীর কাছে শুনিয়াছিলাম—

কবি নজরুল তরুণকে শুধু আশার বাণী শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি তরুণের এমন এক সাত্বিক জায়গায় ঘা দিয়াছেন, তরুণ যদ্‌দ্বারা আপনিই উদ্বুদ্ধ হইবে। তিনি তরুণকে বলিয়াছেন,—

"আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজয়, অমর, অক্ষয়, আমি অব্যয়।"

তরুণ শুধু জ্বালা নয়, উচ্ছৃঙ্খল নয়, তাহার ভিতর দিয়া চিরতরুণ দীপ্তি পাইতেছে। চিরতরুণ কালে-কালে যুগে-যুগে তরুণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে অজয়, অমর, অক্ষয়। সে যে অবিনাশী রূপ লইয়া বাঁচে, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না,—মুর্ছিত হইয়া পড়িবে কিরূপে?

তরুণের ভিতর দিয়া চিরতরুণ এমন করিয়া প্রকাশ পায় বলিয়াই, তরুণের রাজ্য সাম্যবাদীর রাজ্য। তাই আমরা তরুণের কবি নজরুলের কাছে একটি বিশ্বজনীনতার সন্ধান লাভ করি। তাহাতে "অবিনাশিনী চণ্ডীর" রূপ যেমন শোভা পায়, নিষ্কাম বিশ্রামবর্জ্জিত "খুনিয়ারা ইসলামের" রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। তাই কবির কাছে মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী কারবালার শহিদদিগের অথবা চির সুন্দরের পদে ইব্রাহীমের (আঃ) আত্মসূত কোরবানীর চিত্র যেমন সুন্দর ও মনোরম বলিয়া বোধ হইয়াছে, ঠিক তেমনই "অবিনাশিনী" রণচণ্ডীর চিত্রও সমভাবে সুন্দর ও মনোরম বলিয়া বোধ হইয়াছে; মনে হয় "মহরম" ও "কোরবানীতে" কবি যে সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, "রক্তাম্বর ধারিণী মা" বা "আগমনীতে"ও সেই একই সত্যের সন্ধান এবং সেই একই শিবের পরশলাভ করিয়াছেন। তাই কবির হাতে সকলের চিত্র সমভাবে সুন্দর হইয়া ফুটিতে পারিয়াছে। চিরসুন্দরের উপাসক তরুণের নিকট ধর্মের নামে ভণ্ডামির, সত্যের নামে জুয়াচুরির কোন মূল্য নাই। সকল ধর্মের সত্য এক; এবং সকল ধর্মের লক্ষ্য বা কেন্দ্র একখানে গিয়াই মিশিয়াছে। তরুণের কবি নজরুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শ্যেন পক্ষীর মত ঠিক স্থানের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া সকল ধর্মের ভণ্ডামির গোড়ায় আঘাত হানিয়াছেন। তিনি ভাবেন নাই, এমন কি ভাবিতেও পারেন নাই যে, ইহাতে ধর্মধ্বজাবাহীরা হাহাকার করিবেন। তিনি চির-আনন্দ; চির-তরুণের মত কাজ করিয়া যাওয়াই তাঁহার লক্ষ্য। কে কি বলিবে বা কি করিবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাঁহার কোথায়? কবির "মহরম" ও "রক্তাম্বর ধারিণী মা'র দুই স্থান তুলনা করিলেই, আমরা এই বিষয়ে বেশ বুঝিতে পারিব। "মহরমের" এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,-

"বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
'হুসিয়ার ইসলাম ডুবে তব সূর্য।"

জাগো, উঠ মুস্লিম্, হাঁকো হাইদরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে লাল হ'য়ে যাক।

হাসানের মত নিব পেয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের।

O O O

সখিনার শ্বেতবাস দিব মাতা কন্যায়,
কাসিমের মত দেব জান রুধি অন্যায়।

O O O

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইস্‌লাম!
লোহুলাও নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।"

আর "রক্তাম্বর ধারিনী মা"য় বলিতেছেন:---

"মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভঃ তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে,
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ
ভাঙো মা ভোলার ভাঙো নেশা,
পিয়াও এবার অশিব গরল,
নীলের সঙ্গে লাল মেশা!
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব নাশিনী চণ্ডীরূপ,
দেখাও মা অই কল্যাণ করই
আনিতে পারে কি বিনাশস্তূপ।"

এই দুই স্থানের বাহিরের রূপ ছাড়িয়া দাও, শব্দান্তরালের আভ্যন্তরীণ কথাগুলি নিবিষ্ট মনে তুলনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে ভিন্ন এবং বাহ্যতঃ বিষমধর্মী পাত্রকে আশ্রয় করিয়া উভয় কবিতা স্ফূর্ত ও মূর্ত হইলেও উভয়ের অন্তর্নিহিত ভাব ও প্রেরণার মধ্যে এতটুকুও তফাৎ নাই।

নজরুলের কবি-প্রতিভা

''নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির নাম 'প্রতিভা' হ'লে স্বীকার করতে হ'বে প্রতিভার রূপভেদ আছে। সত্যই মানুষের প্রতিভা নানান জাতের ও নানান্ পদের হয়ে থাকে। এ-দিক থেকে ভাব্‌লে দেখা যায়, নজরুলের প্রতিভা হচ্ছে মূলতঃ কবি প্রতিভা। এই প্রতিভাও আবার এমন যে, যাকে বলে নিতান্ত অসাধারণ। নজরুল-প্রতিভার অসাধারণত্বটুকু কোথায়, তা ঠিক বুঝতে পারা যায় তখন, যখন আমরা বাংলার কাব্য-জগতে তাঁর অতর্কিত আবির্ভাবের কথা চিন্তা করি।

১৯১৮ ইংরেজীর কথা; সবে বিশ্বের-প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সদ্য যুদ্ধ-ফেরৎ নজরুল কোল্‌কাতায় আস্তানা গাড়লেন, ভবিষ্যতের নবী'-না-হ'য়ে 'বর্তমানের কবি' হবার আশায়। তখন বাংলা-সাহিত্যে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের যুগ। কাব্যে, গাথায়, কথায়, নাটকে, উপন্যাসে, গানে—বাংলা সাহিত্যের যে দিকেই তাকানো যেত, সে-দিকেই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে বড় একটা দেখা যেত না। তিনি তখন বিশ্বের স্বীকৃতি লব্ধ, বাঙালীর গৌরব—চারিদিকে তাঁরই জয় জয় কার।

এমন 'রবীন্দ্র-যুগে' নজরুলের আবির্ভাব, এটিই হচ্ছে বিশেষ ক'রে ভাব্‌বার বিষয়। রবীন্দ্র যুগের বাংলা-সাহিত্যে খুব কম কবি জন্মান নি। এদের মধ্যে প্রতিভারও যে নেহাৎ অভাব ছিল, তা' বলা চলে না। এতৎ সত্ত্বেও একমাত্র ছন্দের ক্ষেত্রে কবি সত্যেন দত্ত ছাড়া আর সব গেলেন তলিয়ে। আশা করা দূরে থাক, কেউ কখনও ভাবতেও পারেন নি যে, 'রবীন্দ্রনাথের যুগে' তাঁর চরম খ্যাতি ও অলৌকিক প্রতিভার-মধ্যাহ্ন সময়ে, তাঁর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্থান কোন কবি কখনও দাবী করতে সাহস পাবেন। অথচ নজরুল তেমন স্থান যে শুধু দাবী না ক'রেই পেয়ে গেলেন তা নয়, লোকে আপনা থেকেই তাঁকে সে-স্থান দিয়ে দিল স্বেচ্ছায়,—যেন একদিনে,

মাত্র একটি কবিতাতে। এটি আমাদের বয়সের সকলেরই জানা-কথা, চোখের সামনে ঘটে যাওয়া একটা তিলিস্‌মাৎ। এঁকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

কি ক'রে এমনটি সম্ভব হ'ল, এ-কথা যখন আজও ভাবি, তখন কেবল বিস্ময়ে আত্মহারা হ'তে হয়। বাংলা-সাহিত্যে 'রবীন্দ্রনাথের যুগ'—এ কি যেমন-তেমন কথা! বাংলার লোক রবীন্দ্রনাথকে যেন লাভ করে ছিল বহু পুণ্য ফলে; বিশ্ব-বিখ্যাত কবি, অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, অতল স্পর্শী তাঁর বাণী, বিশ্বজনীন তাঁর ভাব ও অপার্থিব তাঁর প্রেরণা; তিনি হচ্ছেন বাংলার সাহিত্যিক ও কবির জীবন্ত আদর্শ ও পুণ্যতীর্থ; তাঁকে অনুকরণ-অনুসরণ না ক'রে কলম ধরে কার সাধ্য? বাংলার এই যে মানসিকতা—একে নজরুল কিছুতেই সহ্য করলেন না, রুখে দাঁড়ালেন অসম-সাহসে। কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর-প্রতিভার কাছে গিয়ে নজরুল মনে মনেও একটি বার বললেন না,—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥"
(গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ)

নজরুল যদি রবীন্দ্র-প্রতিভার কাছে এমন ক'রে মাথা নত করতেন, অথবা রবীন্দ্রনাথের চরণ ধূলা মাথায় নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন, তাতে আর কিছু হ'ত কিনা বলতে পারিনে। তবে তাঁর এ-কাজ যে সময়-উপযোগী হ'ত,—নেহাৎ নিয়ম মাফিক হ'ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, নজরুল সে-ধাতের কবিই নন। তিনি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:—

"আমি—অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল,
আমি—দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খল!
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি—আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ!"

এই যে নজরুলের যৌবন-দীপ্ত ঘোষণা, এই যে জীবনের জয়গান, এ'কে তাঁর ঔদ্ধত্যের দম্ভোক্তি বা অহঙ্কারের বৃথা আস্ফালন ব'লে অনেকে মনে করলেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি ছিল তার উল্টো। এ ছিল তাঁর 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' উল্লসিত প্রতিভার স্ফূরণ, বজ্র-নিনাদ সৃষ্টির পূর্ববর্তী বিদ্যুল্লতার চোখ-ঝলসানো বিকাশ। তারই অপূর্ব অভিব্যক্তি হ'ল কবির 'বিদ্রোহীর' সৃষ্টিতে। 'মোসলেম ভারত' নামক কবি মোজাম্মেল হকের মাসিক পত্রে ছাপার অক্ষরে এ-সৃষ্টি-প্রথম রূপ নিলে। চারদিকে লোফালুফি শুরু হ'ল, 'প্রবাসী' প্রভৃতি নানা মাসিক-পত্রিকায় 'বিদ্রোহীর' উদ্ধৃতিতে কারও কাছে এ অদ্ভুত সৃষ্টির কথা অজানা রইল না।

'বিদ্রোহী'র—মুক্তক-মাত্রাবৃত্ত-ছন্দের কল্লোল-রোল সাথে ক'রে নিয়ে এসেছিল মহাসাগরের ঝড়ের দোলা, আর জাগিয়ে দিয়েছিল বাংলার পিক-কুহরিত কাব্যকুঞ্জে মহাযুদ্ধের কামান-গর্জন। অকস্মাৎ রাবীন্দ্রিক ঢঙে নৃত্যপরায়ণা কাব্য-সুন্দরীর কেটে গেল তাল, থেমে গেল কণ্ঠের উদাস করা মৃদু-মধুর গুঞ্জন-ধ্বনি। বাংলা-সাহিত্য-রসিক কাব্যামোদীরা শুনতে পেলে—"

"ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে ;
প্রলয় রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।"

রাবীন্দ্রিক ভাব-বিহ্বল বাংলার পিলে চম্‌কে গেল; মনে হ'ল এযে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। চোখ কপালে তুলে গগন পানে চাইতেই, সে দেখতে পে'লে উদয় অচল শিখরে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে; আর চারদিক থেকে জোর্‌ছে রব উঠছে:—

"ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড় ।।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু পারের সিংহদ্বারের ধমক হেনে ভাঙল আগল।

মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে,
মহাকালের চণ্ডরূপে—
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।

ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।।"

সত্যই বাংলা-সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ভয়ঙ্করের আবির্ভাব,—একটি ধূমকেতুর আত্মপ্রকাশ। তাই ধূমকেতুর উদয়ের মতোই এই ঘটনা একান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। লোকের বিশ্বাস, ধূমকেতু স্রষ্টার একটি অলক্ষুণে সৃষ্টি; কেননা সে সাথে ক'রে নিয়ে আসে দুর্ভিক্ষ, দুর্বিপাক ও মহামারী। সে যে তার সাথে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাও নিয়ে আসে, আর অনাগত সুন্দরের আগমনী-গানও গে'য়ে যায়, তার কথা কেউ বড় একটা-ভাবতে চায় না। বাংলা-সাহিত্যে নজরুল শুধু ধূমকেতুর-মতো-আবির্ভূত হ'য়ে সকলকে তাকলাগিয়ে দিলেন না, 'ধূমকেতু' নামে কাগজ বের ক'রে ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপটায় প্রলয়-নাচন নেচে চললেন। মানুষ তাঁর এই অদ্ভুত ও আকস্মিক তাণ্ডব নৃত্য দেখে অবাক হ'ল। কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'ধূমকেতু'কে আশীর্বাদ করলেন,

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।

অলক্ষণের-তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।।"

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়,—কবি রবীন্দ্রনাথ কবি নজরুলকে আশীর্বাদ করছেন একটি প্রলয়ঙ্কর 'ধূমকেতু' রূপে। এই ধূমকেতুটি আমাদের জাতীয় দুর্দিনের দুর্গ-শিখরে অগ্নির সেতু রচনা ক'রে জাতীয় মুক্তির রাজপথ দেখিয়ে দেবে; এঁকে দেবে জাতীয় দুর্দিনের অন্ধকার নিশীথিনীর বিশাল-কপালে অলক্ষণের তিলক-রেখা; আর তাই দে'খে জেগে উঠবে অর্ধমৃত জাতি। এর সাথে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে আশীর্বাদ করলেন পরাধীন জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা কবিরূপে নয়, বরং পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে।

রবীন্দ্রনাথের মতো এমন একটা বিরাট প্রতিভা তাঁর গগনস্পর্শী প্রতিভার পর্বত-শিখরে ব'সে একটি শিশু-প্রতিভার গতিবিধি লক্ষ্য করছেন, আব যেন "বেঁচে থাকো---জীতে রহো" ব'লে ওপর থেকে তার শিবে পুষ্পবৃষ্টি করছেন, এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা সাহিত্যেব ক্ষেত্রে কখনও ঘটেছে ব'লে আমার জানা নেই।

মোদ্দা কথা, কবি রবীন্দ্রনাথের-পাশে কবি নজরুল ইসলাম ভাস্বর হ'য়ে দেখা দিলেন। এতে এক অপূর্ব দৃশ্যের মহিমময়ী মূর্তি ফুটে উঠল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যাকাশে তাঁর কাব্য-কলাব শুভ্র-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাজাল বিস্তার ক'রে যে সৌন্দর্যের মদির-মায়া ছড়িয়ে রেখেছিলেন, একই আকাশে তারই পাশে নজরুল তাঁর ধূমকেতুর জ্বালা ও ঝলা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এ বল্লে আমায় দেখ, ও বল্লে আমায় দেখ। বাংলাভাষীবা-কাকে রে'খে কাকে দেখে, ভাব্‌তে লাগলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার শুভ্র-স্নিগ্ধ কৌমুদী-ধারায় স্নাত ও মাতোয়ারা হয়ে যাঁরা এদ্দিন বল্‌তেন,—

"এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে-মরণ স্বরগ-সমান।

(দ্বিজেন্দ্র লাল)

তারাই ধূমকেতুর উদয়-পানে তাকিয়ে তার ঝলায় ঝলসিত হ'য়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে আবেগ ভরে ব'লে ফেললেন, না, না, তা' হয় না। এ-মরণে কোন পৌরুষ নেই, জৌলুস নেই, সার্থকতা নেই। সুতরাং

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।।"

—(রবীন্দ্রনাথ)

এ-হচ্ছে একটা জীবন্ত হৃদয়ের স্পর্শ—মানুষের মাঝে মানুষের মতো বাঁচার আকাঙ্ক্ষা; অন্য কথায়, একটা নবীন প্রাণের জীবন্ত-ছোঁয়ায় 'আব্-ই-হায়াতের' সন্ধান লাভ। এতে জাতির মরবার মোহ কেটে গেল, বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ল। সে দরাজ গলায় নজরুলের কণ্ঠে সুর তুল্লে :—

গাহি তাহাদের গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

* * *

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিক্ দিগন্ত জুড়ে,
জীবনোদ্বেগে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মাণিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি, পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।

গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে।
যাহাদের কারাবাসে,
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে।
গাহি তাহাদের গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।"

মো.টর উপর, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবে জাতি আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পে'ল, 'তাজা বতাজার' গান গেয়ে 'নব-নবীনের' চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'ল। রবীন্দ্রনাথ জাতির 'মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা, আর নির্জিত বুকে আশা ধ্বনিয়ে তোলার তাগিদ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক, তাঁকে দিয়ে তা সম্ভবপর হ'য়ে উঠেনি। এবার তার ভার পড়ল বাংলার চারণ-কবি নজরুলের ওপর। তিনি 'বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান ফেনিয়ে উঠার' দৃশ্য দেখে ব'লে ফেললেন:—

"রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়ে দেশ হ'তে আজ দেশান্তরে;
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধকারার বন্ধ ঘরে।।"

সুতরাং, আর 'রবির' ভাষায় কবির মতো ব'সে থাকা চলে না; ভাবনা-চিন্তায়, আশা-নিরাশায় হিসাব-নিকাশে দিন কাটানোও যায় না। এত হিসাব নিকাশে লাভই বা কি? যখন—

"পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি,
যুগের হুজুগ কেটে গেলে ;
মাথার উপরে জ্বলিছেন 'রবি'
রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত
লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

এমন একটা ধারণা নিয়ে 'মরণ বরণ পণ' গ্রহণ ক'রে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন নজরুল। বিদেশী 'বিধির বিধান' ভাঙ্গার অভিযান শুরু হ'ল; 'বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশা-বাঁশী' লাগ্‌ল। তাতে বাঁশীরই ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা ছিল বেশী ; কেননা 'বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের'। হ'ল ও তাই। নজরুল কারাবরণ করলেন, অনশন ব্রত গ্রহণ করতেও কসুর করলেন না। তাঁর 'অগ্নিবীণায়' দীপক রাগিণী বেজে উঠ্‌ল, 'বিষের বাঁশীতে' সুর সংযোজিত হ'ল, সর্বোপরি দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। এই সময়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত" নামক নাটিকাটি শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলাম---স্নেহভাজনেষু" ব'লে নজরুলকে উৎসর্গ করলেন। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে বিশ্ব-কবি কর্তৃক জাতীয় জাগরণের উদগাতারূপে বাংলার কবি নজরুলের গৌরবময় স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের এ-স্বীকৃতিতে শুধু নজরুল যে উৎরে গেলেন তা নয়, কবি রবীন্দ্রনাথও বাঁচ্‌লেন। এতে কারও মহিমা যেমন ক্ষুণ্ন হ'ল না, খ্যাতিও তেমনি ম্লান হ'ল না। মনে হ'ল, একজন আর একজনের পরিপূরক মাত্র। এ-ও কম বিস্ময়ের কথা নয়।

অতঃপর, কবি নজরুল নির্যাতীত, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির হ'য়ে কবিতা ও গানে, ধারণা ও ধ্যানে, কথা ও কাজে যে অনল উদ্‌গীরণ শুরু করলেন, তার কাছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গার, আর ধূমকেতুর দিগন্ত-জোড়া ধূম্রজালও হার মানল। এ-সময়ের নজরুল ছিলেন মহাবিদ্রোহী নজরুল। তাঁর দুর্দান্ত বিদ্রোহ পরিচালিত হচ্ছিল একদিকে সেকেলে

কুসংস্কার, প্রাচীন চিন্তাধারা ও আগেকার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আর অন্য দিকে বিদেশী শাসনের কঠোর বন্ধন মুক্তির অনুকূলে। 'যারা তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছিল', কবির 'রক্ত লেখায়' অচিরে তাদের সর্বনাশ ডেকে আনল। তারা দিব্যচক্ষে দেখতে পেলে---

"মহামানবের মহাবেদনার আজি মহা উত্থান;
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।"

ধূমকেতুধর্মী মহাবিদ্রোহী নজরুল যেমন ভয়ঙ্কর, তেমন সুসংস্কারক বটে। গড়ার জন্য ভাঙার, সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। নজরুলও ধ্বংসের প্রয়োজন ব'লে বোধ করেছিলেন সৃষ্টির জন্য। তাই তাঁর 'এক হাতে ছিল রণ-তূর্য' এবং 'আর হাতে ছিল বাঁকা বাঁশের বাঁশরী।' তিনি জাতিকে শুধু ভাঙার গান শুনালেন না, তার কাছে বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন,----

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নতুন সৃজন বেদন!
আসছে নবীন জীবনহরা! অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বেয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

জাতি নজরুলের আগমনে জয়ধ্বনি করল। চির-সুন্দর চির-নবীন মোহনবেশে মধুর হে'সে সৃষ্টির উল্লাস বুকে নিয়ে নেমে এল। নতুন জীবন লাভ করল জাতি, স্বাধীন হ'ল দেশ। আমাদের এ-স্বাধীনতায় কবির দান কতখানি, তা এখন যাচাই ক'রে দেখার সময় এসেছে।

এ-ভাবেই জাতীয় জীবনের উদ্গাতারূপে নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা-সাহিত্যের মোড় ফিরে গেল।

নিত্য নতুন চিন্তায়, নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা-সাহিত্য চল-চঞ্চল হ'য়ে উঠল। এমনটি সম্ভবপর হয় কেবল যুগ-প্রবর্তক কবিদের

ধারা। তাই, আমি মনে করি, নজরুল ইসলাম বাংলার একজন 'যুগ-প্রবর্তক কবি'। তিনি বাংলা সাহিত্যের-রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হ'য়ে শুধু নতুন যুগের সম্ভাবনা নিয়ে এলেন এমন নয়, 'রবীন্দ্র-যুগের' মধ্যেই 'নজরুল-যুগের' প্রতিষ্ঠা করলেন। দিন যতই বে'ড়ে চললো, ততই 'রবীন্দ্র যুগের' সঙ্কোচন ও 'নজরুলযুগের' সম্প্রসারণ শুরু হ'ল। কার্যতঃ দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর যুগের প্রভাব বাংলা-সাহিত্য থেকে-একরূপ বিদায় নিয়েছে; আব তার সাথে বে'ড়ে চলেছে কবি নজরুলের প্রভাব।*

---

*রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে-৮/৫/৫৭ তারিখে প্রচারিত। মাহেনও, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (পৃ: ৫—৮) আষাঢ়, ১৩৬৪ থেকে গৃহীত।

বাউল-গান পরিচিতির মূল সূত্র *

"বাউল গান" সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেরই খুব পরিষ্কার ধারণা আছে। সম্ভবতঃ ইহার কারণ, এই জাতীয় গানগুলি বঙ্গের নানা অঞ্চলে নানা ভাবে পরিচিত। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, বঙ্গের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট "বাউল" নামটি পর্যন্ত বিশেষ পরিচিত নয়। তবে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও "বাউল" নামের সহিত পরিচিত; ইহার কারণ, "বাউল" নামক একটি সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের সংস্রব ব্যতীত আর কিছুই নহে। মোটের উপর "বাউল" নামটা এদেশের শিক্ষিত লোকেরাই সাধারণ লোকের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষিত লোকেরা যাহাকে "বাউল-গান" বলিয়া থাকে, তাহা বাংলাদেশে নানা নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, "বাউল" নামক বঙ্গের স্বনামখ্যাত সম্প্রদায়ের গানকে "বাউল-গান" বলা উচিত। কিন্তু, "বাউল-গান" বলিলে আমরা এই নামীয় সম্প্রদায়ের গানের সব গানকে ত বুঝিই না, বরং এই সম্প্রদায়ের বাহিরে রচিত আরও অনেক গানকে বুঝিয়া থাকি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অজ্ঞাতসারে আমরা "বাউল-গান" চিনিবার মত এমন এক সূত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি, যাহার মাপকাঠিতে মাপিয়া আমরা কতগুলি বিশিষ্ট গানকে এই নামে পরিচিত করি।

"বাউল" আখ্যাত কোন সম্প্রদায় পূর্ব বঙ্গে বড় দেখা যায় না। তবে এই জাতীয় যে সম্প্রদায়ের লোক আছে, এ অঞ্চলে ইহাদিগকে ফকির

---

* বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে, মৎপ্রণীত "বঙ্গে সূফী-প্রভাব" (প্রকাশক, মুহসিন কোং ৬৬।১-এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা,) নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। পৃঃ ১৮৭—২১৫ দ্রষ্টব্য।

নামে অভিহিত করে। ইহাদের গানের নাম 'মারফতী' বা "মুর্শীদ্যা গান।" উত্তর বঙ্গে বাউল গানগুলি সাধারণতঃ "দেহতত্ত্বের গান" নামে পরিচিত এবং পশ্চিমবঙ্গে এই গানগুলি "বাউল-গান" বলিয়া কথিত হয়। বাংলাদেশে এই গানগুলির সাধারণ নাম "ভাবের গান"; ইংরেজী ভাষায় এইগুলিকে Mystic songs বলা যাইতে পারে।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে বাংলাদেশের এই "ভাবের গান" চিনিবার মূল সূত্র কি? বাংলা দেশের এ জাতীয় গানকে যে মাপকাঠির দ্বারা আমরা অজ্ঞাতসারে চিহ্নিত করি, তাহা হইল "ভাবের মাপকাঠি"। প্রকৃতপক্ষেই এই ভাবই ইহার মূল সূত্র। বাংলার বাউল গানগুলি বাহ্যতঃ হেঁয়ালিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যবিহীন বলিয়া মনে হইলেও, ইহাদের ভিতরকার যোগসূত্র এক। যে ভাব লইয়া আমরা বাউল গান চিনি, তাহা প্রধানতঃ মর্মের; বৈরাগ্য, ঔদাস্য, সংসার-অনিত্যতা ও তত্ত্বের। মুখ্যতঃ এই কয়েকটি বিষয়ের এবং গৌণতঃ ইহার আরও একটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের সংমিশ্রণে বাউল গানের মধ্যে যে একটি অপূর্ব যোগসূত্রের সৃষ্টি হয়, তাহার অস্পষ্ট মাপকাঠিই আমাদিগকে বাউল গান চিনিবার পক্ষে সহজ করিয়া তোলে। সংক্ষেপতঃ, লোকে সচরাচর যাহাকে ভাবের, তত্ত্বের, মারফতের গান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাই "বাউল গান"। এই গানগুলির মূল প্রেরণা ও উৎস এক।

এইরূপ ভাব প্রাধান্য ব্যতীত, "বাউল গানগুলিতে" সুরেরও একটি যোগসূত্র ও বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা সুর-শিল্পী নহি বলিয়া, এই বিষয়ে কোন প্রকারের মাপকাঠি স্থির করিয়া দেওয়া বর্তমানে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাংলার 'ভাটিয়াল' সুর এই গানগুলিতে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে 'বাউল-গানের সুর যে 'ভাটিয়াল' সুর হইতে পৃথক, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। যেরূপেই হউক, বাংলার 'বাউল গানে' এই দেশের ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসে। ইহার সুর কথার তালে তালে আমাদিগকে যে অপূর্ব লোকে লইয়া যায়, তাহা আমাদিগের অপরিচিত ত নহেই বরং সুপরিচিত; এ যেন নৈদাঘ-মধ্যাহ্নে বাংলার উদাস-করা ঘুঘুর সঙ্গীত, বেতস-লতার অন্তবর্তী দোয়েলের শিশ। এ সঙ্গীতের তালে প্রাণের সুপ্ত বাসনা জাগরিত হয় না, লুপ্ত কামনা মাতিয়া উঠে না;

ইহা ক্ষুধিত আত্মাকে অনির্দ্দেশের সন্ধানে, অজানার লক্ষ্যে টানিয়া লইয়া যায়। আধুনিক যুগের সুর-শিল্পীদের মধ্যে যাঁহারা বাউল-গান রচনা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি, তাহারা কেবল প্রকৃত বাউল গানের সুরের নেশাটুকুতেই বাঙালীকে ক্ষণিকের জন্য ভুলাইয়া রাখেন; এই গানগুলির কথার মাদকতা পরিবেশন করার ক্ষমতা ইহাদের কাহারও নাই। কিন্তু বাংলার প্রকৃত বাউল গানগুলি "কথার মাদকতা" ও "সুরের নেশা" এই উভয়বিধ বস্তুর অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটায় বলিয়াই এতকাল এমন করিয়াই বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়া আসিয়াছে। নিম্নে আমরা এইরূপ কয়েকটি বাউল গানের নমুনা দিলাম,—

এস গুরু, এস গুরু যাই দুইজন পারে,
আমার একা যেতে ভয় করে,—
আমার একা যেতে ভয় করে,
এস গুরু যাই দুইজন পারে।

পারঘাটাতে দাঁড়িয়ে তিন জনা,
ওযে,—পারের সম্বল না থাকিলে পার যে করে না।
নায়ের মাঝি বলে আমায় পার করে নাও,—
ছয়জন দাড়ি মাল্লায় গোল করে,
এস গুরু যাই দুইজন পারে।
এই যে দেহ শ্মসান সমান,—
কে সে এসে বাঁশীর ফুকে গো, কর্‌লে ফুল-বাগান!!
আবার এই বাগানে ফুল ফুটেছে,
তাতে পঞ্চচাঁদ বিরাজ করে,—
এস গুরু যাই দুইজন পারে।

(২)

ভবের মায়ার তাল-বিতালে,—
আমার কাটল বেলা, ভাঙল মেলা,
দিন গেল হায় গোলে মালে।

এসো রে ভাই নদীর তীরে,
আমি কেঁদে বেড়াই গো ঘুরে ;
আমায়, পার করে না দুষ্ট মাঝি গো, মরছি গরম জ্বালায় জ্বলে।
দিন গেল হায় গোলেমালে,—
ভবের মায়ায় তাল-বিতালে।

ওপারের ঐ কালার বাঁশী এ পারেতে বাজে,
আমি—শুনি রে ভাই সেই সে বাঁশী মায়ার ঘুমের মাঝে ;
নদীর বুকে সেই না বাঁশী গো---
বেড়ায় ঘুরে, নাচায় ঢেউয়ে ঐ না তালে তালে,
আমার----দিন গেল হায় গোলেমালে।

(৩)

পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাওরে সোনার ময়না ॥
পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও !

আসিব পেয়াদা তবে নিবরে বান্ধিয়া,
স্ত্রীপুত্র ভাই বন্ধু উঠিব কান্দিযা রে—
সোনার ময়না পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও !

পলকের মাঝে সব হইয়া যাবে বন্ধ
বিবি তোমার বেওয়া হইব এতিম ফরজন্দ রে—
সোনার ময়না পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও !

মানুষের জীবন দেখ পৌষ মাইস্যা কুয়া,
পড়িয়া রইব খাকের তনু উড়িয়া যাইব শুয়া রে—
সোনার ময়না পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও!

অধীন এরফানে বলে দিন গেল গাঁইয়া,
এই জনম গোঁয়াইলাম আমি চোরের ছালা বইয়া রে—
সোনার ময়না পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও !

(৪)

মিছা ধাঁধাঁবাজি এ সংসার—
মনরে ভরসা কর কার?

তোমার ভাই বন্ধুজন, কেহ যে নয় গো তোর আপন,
মৈলে পরামর্শ করে বাঁটিয়া নিতে ধন,
দেহ কণ্ঠাগতে প্রাণ থাকিতে করিবে গৃহের বার
মনরে ভরসা কর কার?

তারা সঙ্গে দিবে কি?—
একটি মাটির কলসী, অষ্ট কড়া কড়ি দিবে, ভাঙ্গা এক চাটি
পাপে পুণ্যে যা কামাইছ সঙ্গে করি নেও তোমার
মনরে ভরসা কর কার?
নিয়ে নদীর পার, মুখে অগ্নি সংস্কার,
জ্ঞাতি কাষ্ঠ দিয়া সবে করবে গঙ্গা পার।
দ্বীজ শীতল বলে, ঠেকেছি গো এবার ফেরে;
গুরু যদি করে পার!
মনরে ভরসা কর কার?

(৫)

দিন ত গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে—
সাঁই পার কর আমারে।
আমি আগে যেয়ে ঘাটে রইলাম বসে,
যারা পিছে ছিল আগিয়ে গেল,—
আমি রইলাম পড়ে;
সাঁই পার কর আমারে।
যাদের হাতে কড়ি ছিল, তারা ত পার হয়ে গেল,
আমি দিন ভিখারী, নেইকো কড়ি, দেখ থলি ঝেড়ে,
সাঁই পার কর আমারে।

(৬)

এমন মানব-ঘরখানা, এমন মানব-ঘরখানা,
আর হবে না, আর হবে না
এমন মানব-ঘরখানা!

ঘরখানা কি পরিপাটি
তাতে—লাগিয়ে দুটি খুঁটি—
সাঁইয়ের নামে শক্ত বাঁধন দেনা রে মন,
ঝড়ে ফেলতে পারবে না;
আর হবে না আর হবে না এমন মানব-ঘরখানা।

মানব-মনের বড় জ্বালা,
তা শুনেছে ক্ষেপা কালা,
ও তার আটের দিকে প্রাচীর ঘেরা,
মধ্যে আজব কারখানা;
আর হবে না আর হবে না এমন মানব-ঘরখানা।

মুসলমান বাউলের গান

সংগ্রাহক—বাহাদুর আলী

বাংলার বাউল সম্প্রদায় চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। বাংলার মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার দুই তিন শতাব্দী পরে, হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এদেশে যে-ফল ফলিয়াছিল, বাউলেরা আজও তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য। কালের পরিবর্তনে বাউল-সম্প্রদায়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখন প্রকৃত পক্ষে বাউল সমাজ জীবন্মৃত।

বাউলেরাই বাংলার প্রকৃত মরমী সম্প্রদায়। প্রকৃত বাউলের উচ্ছ্বাসময়ী রাগিণীতে, এখনও ভাবুক হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠে। বাংলার বুক হইতে বাউল সম্প্রদায় বিদায় লইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাউলদের ধর্মপ্রবণ গানগুলি বাংলার আকাশে বাতাসে বহু যুগ ঘুরিয়া বেড়াইবে।

বাউলদের গানে হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির যুগল মিলন ঘটিয়াছে। একদিকে যোগ এবং বৈষ্ণবীয় ভাব ও পরিকল্পনা এবং অপর দিকে সুফী চিন্তা ও সাধন-পদ্ধতি মিলিয়া গিয়া বাংলার বাউল গানগুলি যেন হিন্দু ও মুসলমানের সাগর-সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে। সত্যই এই সাগর-সঙ্গমে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান স্নাত হইয়া ভগবৎ-সন্তুষ্টি ও সদর্শন লাভে তৎপর হইয়াছিল।

নিম্নে চারিটি বাউল গান দেওয়া হইল। গানগুলি পাবনা জেলার পৈলানপুরনিবাসী বাহাদুর আলী সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

গান-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম গানটি মুসলমান বাউল, দ্বারা রচিত। তাহাতে, মুসলমানী প্রভাব অত্যধিক। দ্বিতীয় গানটি যে হিন্দু বাউলের, তাহা নীলমণি মণিপুর ইত্যাদি যোগ-শাস্ত্রীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ব্যতীতও সাধারণভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ গান অধর হিরুচাঁদ নামক কোন বাউল কর্তৃক রচিত। গান দুইটি পাঠ করিলে মনে হয়, সে মুসলমান ছিল।

বাউলগানে সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠিতে পারে না, না উঠাই উচিত। কিন্তু যে ধর্মাবলম্বী লোক বাউল মত গ্রহণ করিয়া উদাসীনভাবে গান রচনা করিয়া বা গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, অলক্ষিতে সেই সম্প্রদায়ের কথা ও ধর্মের ভাব গানে ঢুকিয়া যায়। মুসলমানের রচিত গান হিন্দু বাউল এবং হিন্দুর রচিত গান মুসলমান বাউল নিঃসঙ্কোচে গাহিয়া বেড়ায়, ইহাতে কাহারও জাত যায় না। সংগ্রাহকের মতে, বর্তমান গান-চতুষ্টয় মুসলমান ফকির অর্থাৎ বাউল সন্ন্যাসীর দ্বারা গীত হইয়াছে। সুতরাং আমরা গানগুলি মুসলমান বাউলের বলিয়া শীর্ষদেশে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে গানগুলির স্বত্ব সাব্যস্ত লইয়া মামলার ভয় নাই, কারণ স্বয়ং বাউলগানই তাঁহাদের গানের স্বত্ব সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন।

বাউল-ফকিরী গান

এস. বাহাদুর আলী।

আদমকে চিনি নাই মনের ভুলে,—
আমি—দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই,

আদম বিনে কি আর মিলে।

আদম বস্তু কেমন ধন,
চিনে নেরে আপন মন,—
তত্ত্ব ধর্ম যতই যা করিলে।

আরশের ফেরেস্তাগণ,
খাস নূরেতে তার গঠন,—
খাস তনেতে সেজদা করাইলে।

দেহের পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ
খুঁজে হলেম তনু ক্ষীণ,
আমার দিন ত গেল নেহাত বিফলে।

কোথানে আছে মাবুদ,
বুঝে নেও আপন মাবুদ,
মালেক মজুদ মিলবে অজুদ—কূলে।

আপন ধন চিনে না যে জনা,
তারেই বলে দিনে কাণা,
তাই ঠিকানা পায় না কোন কালে।

ফকিরে কয়, কী যে করি,
এই দেহের ভাব বুঝিতে না পারি,
এখন আমি যাই বা সে কোন্ দেশে?

পেটের মধ্যে আজাজিল,
সেত বড় মুসকিল,
বাতেল করল যারে দরজালে।

২

তারে খুঁজে দেখ্‌না ঘরের ভিতরে,
জ্ঞানের অঞ্জন চক্ষে দিয়ে দেখনা চেয়ে
নীলমণি অন্তঃপরে।

আপের ঘর আতশে সার,
ওরে—আপ্ রয়েছে বাদের ঘরে।

যদি সে হেলে দুলে
ওরে—সেই খানেতে নড়ে চড়ে।

সে রূপ যে দেখেছে,
সেই ভুলেছে,—

ওরে—তোর ভব বন্ধনা
যায়. যায়, যায় গো ছিঁড়ে।

উর্ধ্ব, ঘর, উর্ধ্ব শহর
ওরে—সে উর্ধ্ব লহর।

জানি—রয়েছে ঐ উর্ধ্ব-মানুষ,
উর্ধ্ব ঘরের ভিতরে।

ও তার—উপর-তালায় খোদ মহাজন,
দেখ, দেখ মন, বসতি তোর মণিপুরে।

৩

আমার পর কি এত দয়া হবে—
অযোগ্য যে হই আমি চরণের ছায়া চাই—
সাঁই গো।
আমার পর কি এত দয়া হবে।
বাঞ্ছা আছে তব রূপ দমে দমে চাই—
সাঁই গো।
তোমার পানে যেবা চায়,
রিপু ছয় তার বাদী হয়,
রিপু শান্ত করব বলে, তোমারই চরণে—
সাঁই গো।
তুমি চালাও কিস্তী রাহায়,
দিনত গেল হায়রে হায়,

নূরের সায়রে কিস্তি উজানে ধাইবে—
সাঁই গো।

অধর হিরু চাঁদ কয় ভবেশ তাই
আমি যেন আর ভুলি না তাহারে সাঁই,

আমার বাঞ্ছা আছে গোলাম হব চরণে,
সাঁই গো।

৪

শ্রীচরণ কি সহজে তুই পাবি।
মনে প্রাণে ঐক্য হয়ে তুমি হওগো গুরুর দাসী।

দূর করনা মনের কালি,
রিপু ছয়জনাকে দেওগো বলি,

তোমার হবেই হবেই কার্যসিদ্ধি,
তোমার খুলবে জ্ঞানের আঁখি

ছয় রিপুকে বাধ্য কর,
কামকে জ্ঞান অঙ্কুশ মার,

জ্যান্ত মরা হতে পারলে,
তবেই তুমি হবে খাঁটি।

তুমি সার কর গো গুরুর চরণ
যদি অধর ধরা ধরিবি।

নবনূর

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা ; সেই ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাস ; বাংলা ১৩১০ সনের বৈশাখ ; তখনও আমাদের অনেকের জন্ম হয়নি। সেই অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে মুসলিম-বঙ্গে 'নবনূর' নামক মাসিক পত্রের আবির্ভাব ঘটে। নানা কারণে বাংলা দেশের মুসলিম-সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-মাসিক পত্রিকাখানি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। ব্যাপারটিকে ভালো রকমে বুঝতে হ'লে, যে-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় বাংলার মুসলিম সমাজে 'নবনূর' প্রকাশিত হ'য়েছিল, সর্বাগ্রে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

আমরা জানি, আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের রূপায়ণে উনবিংশ শতাব্দীর দান অপরিমেয়। এ-শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটে। তার ফলে, বাংলা-ভাষার সাবেকী ধরনের পুরানো গদ্য ও পুরানো পদ্য-রীতি দ্রুত বিবর্তিত হতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই এক নতুন বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য দেশে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই নাম হচ্ছে 'আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য'।

বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের এ-বিবর্তনে বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার দান খুব কম নয়। এ-ক্ষেত্রে খ্রীস্টান মিশনারীরাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের দেখানো পথেই সাংবাদিকতার দিকে প্রথম এগিয়ে এলেন বাংলার হিন্দু-সমাজ। কেননা, শাসক-সম্প্রদায় ইংরেজদের সাথে তখন বাংলার হিন্দুদের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।

রাজ্যহারা মুসলমান-সম্প্রদায় তখনও তাঁদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর। এ-দেশকে তাঁরা শুধু 'দারুল হরব্' বা 'যুদ্ধক্ষেত্র' ব'লে

ঘোষণা ক'রে ক্ষান্ত হয়নি, শাসক-সম্প্রদায় ইংরেজদের সাথে তাঁদের পুরোদস্তর অসহযোগ চলছে। 'সিপাহী-বিপ্লব' নামে পরিচিত 'স্বাধীনতা-সংগ্রামের' পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম সমাজের এ-অবস্থার বিশেষ কোন রদবদল হয়নি। অতঃপর, শেষবারের মতো ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে' পরাজয় বরণ ক'রে বাংলার মুসলমান স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নরাজ্য থেকে নেমে এলেন কঠোর বাস্তবতার মর্ত্যলোকে। আস্তে আস্তে ইংরেজদের সাথে বাংলার মুসলমানদের সহযোগিতা শুরু হ'ল—তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যস্থতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

এ সময় থেকেই বাংলার একদল মুসলিম তরুণ ভাবতে শিখ্‌লেন, ইংরেজী শিক্ষার অস্বীকৃতি সমাজের পক্ষে একটি আত্মঘাতী নীতি ; অতএব মারাত্মক। তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হ'লেও, চিন্তা ছিল বলিষ্ঠ, বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ় এবং যুক্তি ছিল বাস্তবধর্মী। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও, আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার মধ্য দিয়ে জাতিকে জাগাবার জন্যে তাঁরা এগিয়ে এলেন উল্কার মতো। মীর মশাররফ হোসেনই (১৮৪৮-১৯১১) ছিলেন এঁদের পথিকৃৎ। ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলিম ছাত্রের সহযোগিতায় মীর সাহেব 'আজিজ-উন্‌-নাহার' নামে একটি মাসিক পত্র বের করেন। এযাবৎ যদ্দূর জানতে পারা গেছে, 'আজিজ-উন্‌-নাহার'ই মুসলিম পরিচালিত সর্বপ্রথম মাসিক পত্র। বলা বাহুল্য, পত্রিকাখানি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'আজিজ-উন্‌-নাহার' প্রকাশের পর থেকে নিয়ে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে 'নবনূর'-এর প্রকাশ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান প্রায় ৩০ বছর। এ ত্রিশ বছর ধ'রে বাংলার মুসলমানদের 'আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা' যে-যে খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে সংবাদিকতার দান খুব কম নয়। তার মধ্যে বিশেষ ক'রে মাসিক পত্রিকাগুলোর দানই সব চাইতে বেশী। বাংলার মুসলমান এ-সময়ের মধ্যে খুব কম ক'রে হ'লেও আট-নয়টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তন্মধ্যে 'সম্মিলনী' (১৮৮৭), 'মিহির' (১৮৯১), 'আখবারে ইসলামিয়া' (১৮৯২), 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯৬),

'হাফেজ' (১৮৯৭), 'কোহিনূর' (১৮৯৮), 'প্রচারক' (১৮৯৯), 'ইসলাম' (১৮৯৯), 'লহরী' (১৯০০), প্রভৃতিই হ'লো বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য।

এই যে এতগুলো মাসিক-পত্র, এর কোনটিই বেশী দিন টেকেনি ; জল-বদ্‌বুদের মতো এক এক টি ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর অল্প দিনের মধ্যেই আত্মগোপন করেছে। মোটের ওপর, পত্রিকাগুলো ছিল স্বল্পায়ু বা ক্ষণস্থায়ী। অধিকন্তু, পত্রিকাগুলোর প্রচারও ছিল অনিয়মিত। তাই দেখতে পাই, দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ ক'রে 'নবনূর' জোর গলায় ঘোষণা করেছে,—

> "আনিয়মিত প্রচার ক্ষণজীবী মুসলমান মাসিক-পত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। ভগবৎ-প্রসাদে 'নবনূর' সে লক্ষণ বিশিষ্ট নহে বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারে। বিধির বিধান অন্যরূপ না হইলে, সে তাহার বর্তমান বিশেষত্ব বজায় রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।"

'নবনূর' যে প্রাণপণে সে-চেষ্টা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৌনে চার বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, নানা কারণে 'নবনূর'-এর প্রচারও বন্ধ হ'য়ে গেল দীর্ঘদিন ধ'রে নিয়মিত প্রচারের দিক থেকে মুসলমান-পরিচালিত মাসিক-পত্রিকার ক্ষেত্রে এভাবে 'নবনূর' একটা দলিল বা রেকর্ড সৃষ্টি করল। এ অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য মুসলিম সমাজ 'নবনূর-এর কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

আমরা আগেই বলেছি 'নবনূর' যখন প্রকাশিত হয়, তখন মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনের যুগ। কিন্তু তিনি তখনও বাংলার মুসলিম-সমাজের কাছ থেকে সে-স্বীকৃতি লাভ করেন নি। তার প্রধান কারণ হ'ল, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা-সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-স্রষ্টার সংখ্যা তখনও মুসলমানদের মধ্যে নিতান্ত নগণ্য ছিল। প্রথম বর্ষের 'নবনূর'-এর প্রথম সংখ্যায় বাংলার মুসলমানদের এ সাহিত্যিক দীনতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এই সংখ্যায় 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব 'সূচনা' শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছেন,—

> "যেই সমাজে 'আখবারে ইসলামিয়া,' 'ইসলাম', 'মাসিক মিহির', 'হাফেজ,, 'কোহিনুর' এবং 'লহরী,' জন্মের কিছুকাল পরেই অকাল-মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সেই সমাজে আবার এই

> প্রয়াস? 'ইসলাম প্রচারক' প্রবীণ সম্পাদকের অধীনে থাকিয়াও যেই সমাজে উন্নতির আসন লাভ করিতে পারিতেছেন না, সেই ঘোর নিদ্রাতুর সমাজের বক্ষে আবার এই ক্ষীণ আলোর ক্ষণিক বিকাশের কি প্রয়োজন? অনেকে হয়তো আমাদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে আমরা কেবলমাত্র একটি কথা বলিতে পারি, মাতৃভাষার সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্যই আমরা বাহিরের পূর্ণালোকে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাদের অন্য সাধ নাই, অন্য লক্ষ্যও নাই।"

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলা-ভাষাকে মাতৃভাষারূপে স্বীকার ক'রে 'নবনূর'-এর মধ্য দিয়ে তার সেবা করাই এ মাসিক-পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ শুধু নিদ্রাতুর নয়, একেবারেই সংজ্ঞাহীন। তার সর্বাঙ্গে জীবনের কোন লক্ষণ নেই। তাকে জাগিয়ে দিতে হ'লে সমাজে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-স্রষ্টার প্রয়োজন এবং তার জন্য চাই সম্পূর্ণ সাহিত্য-ধর্মী মাসিক-পত্রের প্রকাশ। এমন একটা জোর তাগিদ 'নবনূর' পত্রিকার পরিচালকগণ অনুভব করেছিলেন। এ তাগিদকে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ব'লে উল্লেখ করতে পারি। তাই দেখতে পাই 'নবনূর'-এর পরিচালকগণ লিখছেন,—

> "সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হয় এবং যদি কখনও মুসলমান জাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহা সাহিত্য-চর্চার শক্তি দ্বারাই হইবে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একখানা ভাল মাসিকের অভাব দর্শন করিয়াই আমরা এই দুরূহ কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। ভাল কি মন্দ করিয়াছি বুঝিবার অবসর পাই নাই। 'নবনূর' যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্য-চর্চার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন।"—(নবনূর, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সূচনা, ১৩১৬)

মোটের উপর, মুসলিম সমাজ-কল্যাণই ছিল 'নবনূর' পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান উপায়রূপে বেছে নেওয়া হয়ে-

ছিল সাহিত্য-সাধনাকে, আর সাহিত্য-সাধনার প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল 'নবনূর-এর মতো একখানা উন্নত শ্রেণীর সাহিত্য-মাসিকীর প্রকাশকে। তখন বাংলার মুসলিম-সমাজের সাহিত্য-জীবন অবনতির যে-স্তরে নেমে এসেছিল, তাকে সেখান থেকে হাত ধ'রে টেনে উঠাবার শক্তি একমাত্র যুবসমাজ ছাড়া আর কারও ছিলনা। 'নবনূর'-এর পরিচালকগণ এ-সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় মুসলমানদের এ সাহিত্যিক অবনতির প্রতি যেমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, ঠিক তেমনই যুবসমাজের শক্তির স্বীকৃতিও রয়েছে। এ সংখ্যায় 'নবনূর'-এর পরিচালক লিখেছেন,—

> "বর্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদের সাহিত্য বলিয়া কিছু আছে কিনা, ভাবিবার বিষয়। যাহা নাই, তাহার সৃষ্টি ও স্থায়িত্ব বিধান করাই আমাদের উন্নতিশীল যুবক সম্প্রদায়ের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। আমরা তাঁহাদের নিকট অনিবার আশা আকাঙক্ষাময় দৃষ্টিপাত করিতেছি, যদি কখনও আমাদের সাহিত্য উন্নত হয়, তবে তাঁহাদের হস্তেই হইবে।"

আমাদের এ সাহিত্যিক দীনতা ঘুচিয়ে সমাজকে উন্নত করে তোলার প্রেরণা থেকেই 'নবনুর'-এর জন্ম হয়। এ প্রেরণা যেমন যুবজনসুলভ উদ্দীপনাময় চলচঞ্চল ছিল, ঠিক তেমনই ছিল নিখাদ সোনার মতো অনাবিল। তার পিছনে সামাজিক স্বীকৃতি বা আর্থিক প্রত্যাশার মতো কোনো রকমের ক্ষীণতম বিবেচনাও কাজ করেনি। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতিরূপে 'নবনূর' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মরহুম সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) সাহেব যে ভাষণ দান করেন, তাতে এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি রয়েছে। এবিবৃতিতে তিনি বলেছেন—

> "লাভের জন্য 'নবনূর'-এর প্রচার হইয়াছিলনা, প্রচার হইয়াছিল আমাদের শিক্ষিত তরুণদের মনে জাতীয় ভাবধারা বিকাশের উদ্দেশ্যে। আপনারা হয়তো জানেন না যে "নবনূরের' সম্পাদক কি লেখক কেহই 'নবনূরের' তহবিল হইতে পারিশ্রমিক বাবদ কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সে ছিল সম্পূর্ণরূপে আমাদের ভালবাসার কাজ।

আমরা সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে, “নবনূর প্রকাশের পশ্চাতে যে প্রেরণা কাজ করেছিল, তার মূল উৎস ছিল কোলকাতার কড়েয়া মহল্লাবাসী তরুণ যুবক মোহাম্মদ আসাদ আলী। তিনি ‘নবনূর’ এর স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না, ধনবান কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিও যে ছিলেন, তেমনও নয়। তবে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে সাহিত্য রসিক। তাই সেদিন তাঁর তরুণ প্রাণে জেগেছিল সাহিত্য সেবার মধ্য দিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তোলার অদম্য প্রেরণা। এ প্রেরণাটি তিনি আরও তিনজন যুবকের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), কাজী এমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) ও মুহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ (১৮৮০-১৯৪৫?)

এ চারজন তরুণ নিয়ে যে সংঘটি গঠিত হ’ল, তাই ‘নবনূর’এর প্রকাশ ও পরিচালনায় প্রাণ সঞ্চার করে। সৈয়দ এমদাদ আলী ‘নবনূর’ পত্রিকার সম্পাদনের মতো গুরুভার তুলে নিলেন নিজের কাধে। তখন তার বয়স পঁচিশ বছরের বেশী নয়। তার ওপর তিনি ছিলেন পূর্ব বঙ্গের ঢাকা জেলার অধিবাসী। কোলকাতার মত শহর থেকে তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে একরূপ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় একখানি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদন কত বড় দুঃসাহসের কাজ, তার কথা ভাবাও আজ আমাদের পক্ষে কঠিন। ‘নবনূর’ এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সৈয়দ সাহেব এ-সম্বন্ধে যে-উক্তি করেছেন তার থেকে এর কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ স্থানে আমি তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

‘বিগত বৎসর এমন দিনে বিধাতার অনুকম্পা ও আশ্রয়ের উপর একমাত্র নির্ভর করিয়া ‘নবনূর’ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে দর্শন দিয়াছিল। তখন কেহ কল্পনায়ও ভাবিতে পারেন নাই যে, ইহার সামান্য পরিচালকগণের চেষ্টা বিন্দুমাত্র সফল হইবে। অনেকে তাহাদের কার্য যুবজনসুলভ ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র বলিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিলেন। আজ আমরা সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি. কারণ তাঁহাদের সেই ঘৃণা মিশ্রিত উক্তিই বিগত বৎসর আমাদিগকে কর্মে অধিকতর প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। বলিতে গেলে তাহারাই আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সাফল্যের জন্য গৌরব উপভোগ করিবার পাত্র।”

বলতে বাধা নেই একই পথের পথিক, একই ভাবের ভাবুক এবং একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মাত্র চারটি যুবকের একনিষ্ঠ সাধনায় এমন অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই মুসলিম সমাজে 'নবনূর' এক অপূর্ব সাহিত্যিক উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল। ফলে কাব্য. উপন্যাস, প্রবন্ধ ইতিহাস. দর্শন সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে লেখা নিয়ে এগিয়ে এলেন বহু লেখক। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁদের অনেকজন হচ্ছেন কায়কোবাদ, শেখ ফজলুল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ, মতীয়র রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ওসমান আলী, শেখ জমির উদ্দীন, মোয়াজুদ্দীন আহমদ, আজিজুন্নেছা, মিসেস আর, এস, হোসেন। তাঁদের সাধনা আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উন্নত করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে, এদিক থেকে ভাবলে দেখা যাবে, মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে 'নবনূর' পত্রিকার দান একক না হ'লেও অপরিসীম।

নবীন প্রতিভার রূপ

ষড়্‌ঋতু বিলাসিনী চট্টলার অমর সন্তান, সতত চঞ্চলা প্রকৃতির অশান্ত-শিশু, বাণীর বরপুত্র নবীনচন্দ্র সেনের জন্মের শতবার্ষিকী (১৯৪৬) তিথি বাংলার সর্বত্র উদ্‌যাপিত হইতেছে। ইহা শুধু আনন্দের কথা নহে, দেশের দিক হইতে ইহা একটি বিশেষ আশার বিষয়ও বটে। যে-দেশ তাহার চিন্তাবীর, ধ্যানবীর বা কর্মবীরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জানে না, অথবা যে-দেশের চিন্তাবীর, ধ্যানবীর বা কর্ম-বীরের আদর্শ সে-দেশের ভাবী বংশধরদিগকে কোন প্রেরণা দান কিংবা কোন নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, সে-দেশ মৃত ও হতভাগ্য এবং সে-দেশের ভবিষ্যৎ একান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় চিন্তাবীর ও ধ্যানবীর যে-দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে-দেশ ধন্য এবং সে-দেশের অধিবাসী গৌরবান্বিত।

এই অসাধারণ বঙ্গ সন্তানটির জন্ম শত বার্ষিকী (১৯৪৬) তিথিতে সর্বাগ্রেই মনে হইতেছে, ইহার অসাধারণত্বটি কোথায়, কোন্ অবারিত গুহায় নিহিত? যদি বলি, তিনি 'প্রতিভা' বলে আর পাঁচজন হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অসাধারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। যাহাই ভাতিমান বা দীপ্তিযুক্ত অর্থাৎ উজ্জ্বল, তাহার নাম প্রতিভা হইলে, ইহার স্বরূপ নির্ণয় আবশ্যক হইয়া পড়ে। কেননা, প্রতিভা বহুবিধ রূপ লইয়া আমাদের কাছে ধরা দিতে পারে। নবীনচন্দ্রের প্রতিভার মোটামুটি রূপটি কি?

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার আশ্রয় লইতে হয়। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যকে সংক্ষেপে পরিচিত করিতে গিয়া কোন উদ্ভট সমালোচক বলিয়াছিলেন,—"কাব্যেষু মাঘঃ, কবিঃ কালিদাসঃ" অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে মাঘের 'শিশুপাল-বধ' নামক কাব্যই শ্রেষ্ঠ এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে একমাত্র কালিদাসই কবি। মাত্র চারিটি শব্দে কি অদ্ভুত সমালোচনা, অথচ

কেমন জাজ্বল্যমান সত্যকথা ! একমাত্র সংস্কৃত-ভাষাতেই এমন ভাবঘন কথা সম্ভবপর হইতে পারে, অন্যত্র বোধ হয় সম্ভবপর নয়। কবি শ্রেষ্ঠ না হইলেও, তাহার কাব্য শ্রেষ্ঠ হইতে কোন বাধা নাই এবং কাব্য শ্রেষ্ঠ না হইলেও কবি শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন,---ইহাই এই সংস্কৃত কথাটির প্রকৃত মর্ম ।

কথাটি নিতান্তই Paradoxical বা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও একান্তই সত্য। নানা কারণেই অনেক সময় কাব্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, যেমন অলঙ্কার প্রয়োগ, শব্দযোজনা, ছন্দবৈচিত্র্য, পরিশ্রম, বিশালত্ব, বিষয়বস্তু এবং পারিপাট্য প্রভৃতি। তাহাতে কবি যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণিত হয় না। কবিকে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার স্বভাব-প্রদত্ত প্রতিভার ভুবনমোহিনী মায়ায় পাঠককে বিমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিতে হয়। ইহাকে যদি কবিত্ব-শক্তি বলিয়া নাম দিতে চাহেন, দিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই শক্তি, এই প্রতিভা, এই কবিত্ব জ্ঞানের নহে, মস্তিষ্কের নহে, ভব্যতা বা শালীনতার নহে,---ইহা স্বভাব-প্রদত্ত প্রাণের শক্তি ও হৃদয়ের ক্ষমতা। এক কথায় ইহার নাম প্রাণবত্তা। এই প্রাণবত্তার জন্যই কবিকে কবি বলিতে হয় এবং এই প্রাণবত্তার অভাবসত্ত্বেও অন্য উপকরণ উপস্থিত থাকিলে কাব্যকে 'কাব্য' না বলিয়া উপায় নাই। পুরুষ মানুষও যখন সাজগোজ করিয়া রমণী সাজিয়া নারীকণ্ঠে আলাপ করেন--তাহা নাট্য-মন্দিরেই হউক, আর নাট্যশালার বাহিরেই হউক---তাহাকে নারী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কাব্য সম্বন্ধেও এই উপমা অনেকখানি সত্য। কিন্তু, কবি সম্বন্ধে একথা মোটেই খাটে না। তিনি যেন একজন নারী,---রঙ্গমঞ্চেই হউন, আর তাহার বাহিরেই হউন, তিনি যেন প্রকৃতি প্রদত্ত রূপবতী ভুবনমোহিনী নারী। এই হিসাবেই শিশুপালবধের ন্যায় শ্রেষ্ঠ কাব্য লিখিয়াও মাঘ সংস্কৃত-সাহিত্যে কবি স্বীকৃতি লাভ করেন নাই ; অথচ কালিদাস "মেঘদূত" ও "ঋতুসংহার"-এর ন্যায় খণ্ড-কাব্য লিখিয়াও সংস্কৃত-সাহিত্যের একজন কবি।

বাংলা সাহিত্যেও নবীনচন্দ্রের অবস্থা একেবারেই এইরূপ। বিভিন্ন সময়ে রচিত 'অবকাশ রঞ্জিনী', ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের রচনা 'পলাশীর যুদ্ধ', ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের 'রঙ্গমতী, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের 'রৈবতক', ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের 'কুরুক্ষেত্র', ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের 'প্রভাস', ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের অমিতাভ" ও 'ভানুমতী' এবং যীশুখ্রীস্ট প্রভৃতি তাঁহার কাব্য, কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ কিনা কিংবা

পারে কিনা যাঁহারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা আর যাহা কিছুই বলুন, একথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে,---নবীন সেন একজন কবি। তাঁহার কাব্যমালা পাঠ করিতে করিতে পাঠককে হৃদয়-মনে উপলব্ধি করিতে হয় নবীনসেন একজন ভাবাকুল ব্যক্তি, দরদী বন্ধু, প্রাণবন্ত গায়ক ; ব্যাকরণ, ছন্দ, ভাষা ও অলঙ্কারের বন্ধন উপেক্ষা করিয়া বহু পদস্খলনের মধ্যদিয়াও কি এক মোহিনী মায়ায় বিহ্বল ও বিমুগ্ধ করিতে করিতে স্বভাবের এই শিশুটি আমাদিগকে হাসাইয়া, কাঁদাইয়া, ভাবাকুল ও উৎফুল্ল করিয়া এমন এক স্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতেছেন, যেখান হইতে মর্তের মরলোক আর সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে না। ইহাই তাঁহার প্রধান পরিচয় এবং শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। ইহাতেই তিনি বাংলা-ভাষার কবি, বাঙালা দেশের কবি, বাঙালী জাতির কবি। তিনি বাংলা জাতীয়তাবাদের কবিও বটে। 'পলাশীর যুদ্ধই' (১৮৭৬) ইহার প্রধান নিদর্শন। এক সময়ে বাঙালী তাঁহাকে, বাংলার 'বায়রন' নামে পরিচয় দিতেন।

নবীন সেন একজন 'কবি',---শুধু কবি নহেন, একজন স্বভাব কবি, একজন প্রকৃত কবি। এইরূপ 'কবি' হওয়ার ফলেই, তিনি কি ভাষা কি বিষয়বস্তু, সর্বত্রই সরল ও প্রাঞ্জল ; তাহার মধ্যে কোথাও জটিলতা অস্পষ্টতা বা পাণ্ডিত্যের বালাই নাই। একমাত্র প্রাণবত্তাই তাঁহার সম্বল ও সম্পৎ বলিয়া তাঁহারই দেশের পার্বত্য নদী খরস্রোতা কর্ণফুলীর ন্যায় উদ্দাম ও উচ্ছল কলভঙ্গে, সুখে বিহ্বল ও দুঃখে অধীর অবস্থায় এক তীর ভাঙ্গিয়া, অন্য তীর গড়িয়া আপন মনে স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছেন। এইজন্যই করুণ রাগিণী গাহিতে গাহিতে এই কবি একদিকে যেমন তাহার সুরে সুর মিলাইয়া এক হইয়া গিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিতে পারেন, অন্য দিকে তেমন উৎফুল্ল ভাব ও হাস্যরস জন্মাইতে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ফেলিতে পারেন। এইজন্যই, তিনি শুধু অনুভূতিরই অধিকারী,—উপদেষ্টার গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে অক্ষম। তাই, রাখাল-শিশুর আনন্দময় আত্মবিস্মৃত ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়া একমাত্র এই কবিই বলিয়া উঠিতে পারেন,--

"হাস হাস হাস শিশু, নহে দিন দূর ;
সংসার সাগর পারে বসিয়া যখন

বিষাদ তরঙ্গমালা
গণিতে গণিতে কালা
হইবে প্রফুল্লমুখ,—জানিবে তখন,
নির্ম্মল শৈশব ক্রীড়া সুখের স্বপন।”

ইহা কবির নিজের কথা, উপদেশ নহে; তাহার আপন অনুভূতির সহজ ও সরল অভিব্যক্তি। ইহাতে কোন তত্ত্ব বা তথ্য নাই সত্য; কিন্তু ইহা যে মানুষের হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলিতে গোপনে ঝঙ্কার দিয়া যায়—মানুষকে কাঁদাইয়া দেয়।

নবীন সেনের ভাবাকুলতা ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতাই নাকি তাঁহার একটি বড় দোষ। এই কবি যখন ভাবাকুলতায় তন্ময় ও বিহ্বল এবং উচ্ছ্বাস প্রবণতায় উন্মাদ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না; তিনি নাকি বক্তব্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া যান। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ নবীন চন্দ্র সারল্য বশে কোথাও আত্মগোপন করেন নাই, এমন কি আত্মগোপন করিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু, যাঁহারা তাঁহার ভাবাকুলতা ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে দোষের বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ইহাই তাঁহার একটি প্রধান গুণ। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার এই দোষ, তথা গুণের জন্যই তাঁহারা তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের মতে এই দোষেই মানুষ কবি হয়, এই দোষেই মানুষ প্রাণবত্তার পরিচয় দেয়। এই দোষেই নবীন সেনও অনন্ত এবং অফুরন্ত প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়া কবি হইয়াছিলেন। যিনি হৃদয়হীন কোথা হইতে তাঁহার মধ্যে কোমল ভাব দেখা দিবে এবং যিনি প্রাণহীন, কোথা হইতে তাঁহার মধ্যে উচ্ছ্বাসের বন্যা বহিয়া যাইবে? প্রাণ দিয়া প্রাণ মাতাইতে হইলে, হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় করিতে হইলে প্রাণ ও হৃদয় দানের যে নৈসর্গিক শক্তি ও স্বাভাবিক ক্ষমতার আবশ্যক হয়, তাহা না হইলে কখনও কেহ ‘কবি’ হয় কি? নবীন সেন কবি ছিলেন, নিজের প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ মাতাইবার, নিজের হৃদয় দিয়া পরের হৃদয় জয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিকট অফুরন্ত ছিল। তাই তাঁহার অনন্ত কোমল হৃদয় প্রবল উচ্ছ্বাসভরে যত্রতত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, শত শত দোষত্রুটির মধ্য দিয়াও তাহার কাব্যগুলি প্রাণের লীলায় চঞ্চল ও

লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যগুলি হইতে ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসময় অংশগুলি বাদ দাও, তখন সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে, "তবে কবি নবীন সেন 'কবিই' নহেন।" উদাহরণ স্বরূপ "পলাশীর যুদ্ধ" হইতে মোহন লালের উচ্ছ্বাসময় উক্তি, বিশেষ করিয়া ইহার মধ্য হইতে এই জাতীয় অংশগুলি,—

"কোথায় ভারতবর্ষ!—কোথায় বৃটন!
অলঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপী কলেবর;
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য দেখেনা বৃটন;
পবনের গতি কিংবা কল্পনার রথ
কোন কালে এতদূর করেনি গমন।
আকাশ কুসুম কিংবা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।
সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়;
কখনো হইবে কিনা জানে ভবিষ্যৎ।"—

যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে "পলাশীর যুদ্ধ" আর পলাশীর যুদ্ধই থাকে না; ইহা অন্য আর একটা কিছু হইয়া দাঁড়ায়। অথবা এই কবির "প্রভাস" হইতে,—

নির্মল আনন্দরাশি,   নির্মল আনন্দহাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু। আনন্দ নির্মল
জলরাশি; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল;
অপরাহ্ণ বসন্তের শুক্লা চতুর্দশী।
আনন্দ রবির কর,   আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর!
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।
নীলিমায় নীলিমায়,   মহিমায় মহিমায়,

মিশাইয়া পরস্পরে মহা আলিঙ্গন।
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন।"

—যদি এই জাতীয় অংশগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া যায় তবে 'প্রভাসে' কবি নবীন চন্দ্রকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যের অবস্থাই এইরূপ। কাব্যগুলিতে কবি যেন হৃদয়ের আবেগ ও প্রাণের প্রবাহ খুলিয়া দিয়াছেন, আর সেই প্রবাহ উচ্ছ্বাসভরে বেগবান মূর্তিতে রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুখপানে তরতর বেগে বাধা-বন্ধনহীন অবস্থায় ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এই জাতীয় প্রাণবত্তা, উচ্ছ্বাস ও ভাবাকুলতার জন্যই নবীন সেন 'কবি,'—একজন স্বাভাবিকভাবে প্রাণবন্ত ও হৃদয়বান 'কবি'। তাই সৌন্দর্য তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিত, আনন্দ তাঁহার পূর্ণ সত্তাটিকে দোলাইয়া নাচাইয়া মাতাইয়া দিত, শোক তাঁহাকে একেবারেই অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাঁহার প্রত্যেকটি কাব্যের যেখানে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, সেইখানে তিনি মাতিয়া উঠিয়াছেন, যেখানে তিনি অভিভূত, সেইখানেই তিনি বিশাল, সুন্দর ও মহিমমণ্ডিত।

যে অফুরন্ত প্রাণবত্তা নবীন চন্দ্র সেনকে আজীবন মাতাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। দেশপ্রেম নবীন প্রতিভার মুখ্য অবলম্বন। যৌবনে প্রতিভা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবালুতার মধ্যদিয়া যেই কবি 'কীর্তিনাশা'র তীরে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন,—

কীর্তিনাশা! বৃথা নাম বৃথা অভিমান;
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্তি নাশিতে তোমার?"—

সেই কবিই পরিণত বয়সে 'প্রভাসে' তাহার স্বদেশবাসীর নিকট প্রেমরাজ্য স্থাপনের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহার দেশানুরাগের বীজ "পলাশীর যুদ্ধ' 'রঙ্গমতী' 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রের' ভিতর দিয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বর্ধিত হইয়া 'প্রভাসে' আসিয়াই মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। কবি আজীবন এই দেশানুরাগের অবলম্বন পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার জীবনে ইহাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রেরণা। ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে কবির কাব্যগুলিকে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতে হইবে।

"পলাশীর যুদ্ধ" ও 'রঙ্গমতী'তে কবির দেশানুরাগ সে প্রকৃতির নহে। "পলাশীর যুদ্ধ" ও 'রঙ্গমতী'র দেশানুরাগ একান্ত বেদনাপ্রধান ও অনুভূতিতীব্র বলিয়া জ্বালাময় ও সৃষ্টিমূলক। এইজন্য এই দুই দুইটি কাব্যে কবি মুখ্যতঃ স্রষ্টা। বিশেষ করিয়া "পলাশীর যুদ্ধে" হৃদয়বান কবি দেশের প্রতি তাকাইয়া দেশের দুঃখ দুর্দশায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং দেশের পরাধীনতাকেই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। দেশের পরাধীনতার মর্মঘাতী দুঃখ কবির নয়ন-সমক্ষে একটি অরুন্তুদ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে; আর তিনি তাহা দেখিয়া অশ্রুর মুক্তাপুঞ্জে এক মনোমোহন মালা গাঁথিয়াছেন। যে-দেশে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে বাস করেন, যে-দেশের ভাগ্য এই উভয় সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত, সে-দেশের জন্য কবির যে অশ্রু ঝরিয়াছিল, তাহা কাহারও একার নহে। তাই এদেশের মীরমদন ও মোহনলাল স্বদেশ ও স্বজাতিভক্ত হিসাবে কবির ধ্যানে আদর্শ দেশপ্রেমিক রূপে ধরা দিয়াছিল। তাই, কবির কন্ঠে হিন্দুযোদ্ধার জন্য যেমন---

"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার;
স্ব-কুলে দিলিরে ঢালি, এমন কলঙ্ককালি।
শৃগালের কাজ, হয়ে সিংহের কুমার!"

শুনা গিয়াছে; ঠিক তেমনি মুসলমান যোদ্ধার জন্য

"পঞ্চশত বর্ষ পূর্বে যে জাতি দুর্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন;
তাহাদের সন্তান কি এই কুলাঙ্গার
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন?"

ইত্যাকার অনুশোচনাও শোনাও গিয়াছে। কবি কাহারো একার জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন নাই এবং সেই অশ্রুর মুক্তাপুঞ্জে মালা গাঁথেন নাই। তাই হিন্দু মুসলমাননির্বিশেষে বাঙালী কবি নবীন চন্দ্রের অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়াছেন, কবির অশ্রুর মালা সুতীব্র কণ্টকহারের ন্যায় গলায় পরিয়াছেন।তাহা বাঙালীর সুকোমল শয়নেও দুঃস্বপ্নের মতো সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, বর্শাফলকের ন্যায় তাঁহার কোমল বক্ষকে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া বিদ্ধ করিয়াছে। অন্য সময়ে না হউক, আজ বাংলার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

স্বদেশ প্রেমকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল, "পলাশীর যুদ্ধে" কবির প্রধানতম লক্ষ্য। ইহাতে তিনি দেশের দুঃখ-দুর্দশায় অভিভূত হইয়া কাঁদিয়াছেন এবং তাহার স্বদেশবাসীকেও কাঁদাইয়াছেন। ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর কবির ছিল না। 'রঙ্গমতীতে'ও কবি নিপীড়িত ও নিগৃহীত জাতির দুঃখে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া কাঁদিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার মনোরম স্বপ্ন দেখিয়া তৎপ্রতি প্রলুব্ধ হইয়াছেন। ইহারই ফলে 'রঙ্গমতী'র বন্য স্বাধীন প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি বিহ্বল চিত্তে ছন্দোবন্ধন, কাব্যশাস্ত্রের বিধান প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন ও মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানেও কবি প্রধানতঃ স্রষ্টা। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাঁহার এই সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টি জন্মলাভ করিতেছে।

অতঃপর 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' কবির প্রতিভা মুখ্যতঃ দ্রষ্টার প্রতিভা। এখানে কবি মৌনী, ধ্যানী ও প্রেমিক। এখানেই তাঁহার কবিত্বময় সুদূর প্রসারী দৃষ্টিপথে, তাঁহার হতভাগ্য দেশের ভাবী সুখ-স্বপ্ন ও কল্পনার ইন্দ্রজালে মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এ-স্বপ্ন 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রে' বিধৃত ধর্মরাজ্য স্থাপনের এবং 'প্রভাসে' বিধৃত প্রেমরাজ্য স্থাপনের" মধুর কল্পনা। দেখা যায় কবির ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনাটি তাঁহার প্রেমরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাই, কবির 'প্রভাস' নামক কাব্যখানি "রৈবতক" ও 'কুরুক্ষেত্রে'র পরিণতি মাত্র। এইখানে মনে রাখিতে হইবে, কবি 'ধর্মস্থাপনে'র জন্য কৃষ্ণ, অর্জুন কি সুভদ্রার আমদানী করেন নাই। 'ধর্মস্থাপন' তাঁহার স্বপ্ন নহে, ধর্মরাজ্য স্থাপনই তাঁহার স্বপ্ন। ধর্ম ও ধর্মরাজ্যে প্রভেদ অনেক—ধর্ম একবস্তু এবং ধর্মরাজ্য অন্য ব্যাপার। ধর্মের জন্য জগতে বহু অবিচার অত্যাচার ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে; কিন্তু ধর্মরাজ্যে অবিচার অত্যাচার নাই; নিপীড়ন উৎপীড়ন স্থান পায় না। দেশের দুঃখ-দৈন্য ও পরাধীনতায় একদিন যেই কবির প্রাণে শ্রাবণ-বাদল বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, সেই কবির কল্পনায় অত্যাচার ও অবিচারের কালিমা অনুলিপ্ত ধর্মস্থাপনের কথা আসিতে পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে আসেও নাই। এই জন্যই কবি-কল্পিত কৃষ্ণ, অর্জুন ও সুভদ্রা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের কৃষ্ণ, অর্জুন ও সুভদ্রা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। ইহারা কবি কল্পনার উপলক্ষমাত্র, হিন্দুধর্মের প্রচারকবেশী বাহন কি প্রতীক নহেন। এই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলিম

অধ্যুষিত ভারতবর্ষে কোন সাম্প্রদায়িক কল্পনা কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে,—কবি তাহা করেনও নাই।

একবার এই দৃষ্টি লইয়া দেখ, নিবিষ্ট ও সংবুদ্ধ চিত্তে কবির "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" ও 'প্রভাসে' অঙ্কিত চিত্রের প্রতি তাকাও, দেখিবে কবির মনে যে-ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখা দিয়াছিল, সে-স্বপ্ন কোন বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অভিব্যক্তি নহে; তাহা আর্যানার্য তথা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বজাতীয় ভারতবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মরাজ্য। এই রাজ্যে এক ভগবান, এক ধর্ম তথা এক মানবধর্ম এবং এক মানব জাতিরই বাস। এই ধর্মরাজ্যের অবসান ঘটিয়াছে 'প্রভাসে'র প্রেমরাজ্যে। এই প্রেমরাজ্যে শত্রুমিত্র আর্যানার্য, ধনী-নির্ধন প্রভেদ নাই। এই প্রেম কোন বিশিষ্ট ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রবণতার ভারে নিপীড়িত হইয়া স্বকাম বা সঙ্কীর্ণ নহে;—ইহা নিষ্কাম অসীম ও উদার।

কবির এই স্বপ্ন এখনও সফল হয় নাই। আজিকার এই পৃথিবীব্যাপী দুর্যোগ ও দুর্ভোগের দিনে কবির জন্মের শতবৎসর পূর্ণ হইল। জগৎ আজ নূতন জন্ম লাভ করিতেছে নবীন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। কবির এই শুভ জন্মতিথিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীও নূতন জীবন লাভ করুক, নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হউক;—ইহাই আমরা আজ সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

সামাজিক পটভূমিকায়
প্রাক-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্য

সামাজিক পটভূমিকায় ফেলে প্রাক-বঙ্কিম বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই আজকের বিষয়। বঙ্কিমের আগেকার বাংলা-সাহিত্য বল্‌তে, সেই যুগের বাংলা-সাহিত্যকেই বুঝায়, যে-যুগের বাংলা-সাহিত্য তার আধুনিক মূর্তি গ্রহণ করে নি, অথচ নতুন যুগের নয়া-চেহারা নেবার জন্য বাংলা-সাহিত্য তৈরী হচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের আবির্ভাবের প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের থেকে এ আয়োজন শুরু হ'য়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ ক'রে ১৮৯৪ সালে মারা গেলেও, তাঁর যুগ আরম্ভ হ'য়েছিল তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে, অর্থাৎ ১৮৬৪ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী" বা'র হ'বার পর হ'তে। এই ১৮৬৪ সালটি বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মনে ক'রে রাখ্‌বার মত বছর।

এইমাত্র বলা হ'ল, এ-সময়ের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগেই বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের আয়োজন চলে আস্‌ছিল। মোটামোটি এই ১৮০০ সাল থেকে নিয়ে ১৮৬৪ সাল অবধি সময়কে বাংলা-সাহিত্যে নতুনের প্রস্তুতি কাল বলা যে'তে পারে। সাহিত্যের এ-যুগটি সত্যিই বিচিত্র ও কৌতুকাবহ। কৌতুকরসের মূল উৎসটি লুকিয়ে আছে,—এর নতুন ও পুরানো আদর্শের মধ্যে। দেশ থেকে তখনও সাহিত্যের পুরোনো আদর্শ লোপ পায়নি, অথচ মূলতঃ রাষ্ট্রীয় এবং তৎসূত্রে নানা শিক্ষা-সংক্রান্ত ও ঘটনা-বহুল এক নতুন সাহিত্যিক আদর্শ মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে শুরু করলে। বাংলা-সাহিত্যের এই পুরোনো ও নতুন রূপের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দানের চেষ্টা করা যা'ক।

এই সময়কার গোড়ার দিকে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের পুরোনো আদর্শ ছিল বেশ জোরালো। তবে, তার অন্তর্নিহিত সত্তা-শক্তি ক্রমেই যে ক্ষীণ

হ'য়ে আস্‌ছিল, তা'তে কোন সন্দেহ নেই। এ পুরানো সাহিত্যিক ধারা গতানুগতিক পদ্য-রীতি অবলম্বন ক'রেই বয়ে যাচ্ছিল। তখনও বাংলার এই প্রাচীনপন্থী পদ্য সাহিত্যে নতুনের ছোঁয়াচ লাগেনি। এ-সাহিত্যে প্রকৃত নতুন রূপ দেখা দিয়েছিল, ১৮৬০ সালে কবি মধুসূদন দত্তের "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য প্রকাশের সময় থেকে। বাংলার এ-সময়কার প্রাচীনপন্থী পদ্য-সাহিত্যকে মোটামুটি এ কয়টা শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখানো চলে; যেমন—

(ক) দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য।
(খ) রামায়ণ, কৃষ্ণায়ন ও পৌরাণিক আখ্যানবিষয়ক কাব্য।
(গ) বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ও ধর্ম্মবিষয়ক কাব্য।
(ঘ) ভারতীয় ও বৈদেশিক উপাখ্যানমূলক কাব্য।
(ঙ) ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ও পৌরাণিক কবিতা।
(চ) আখড়াই, কবিওয়ালা, পাঁচালী ও যাত্রা গান।

এই ছয়টি ভাগের মধ্যে একমাত্র আখড়াই, কবিওয়ালা, পাঁচালী ও যাত্রা গানের ভাগটিকে ছে'ড়ে দিয়ে গানের আর কোন ভাগই নতুন নহে; এগুলোর সব ক'টিই প্রাচীনের জের। তবে, এগুলোতে কিছু কিছু নতুন বিষয়বস্তু যে নেই, তা নয়। এই ধরুন, ১৮৩১ সালের লেখা রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাম রামায়ণ"। ইহা প্রাচীন কাব্য ধারার একটি অভিনব ও বৃহত্তম রামায়ণ। ১৮৪৫ সালের লেখা জগৎমোহন মিত্রের "মনসা-মঙ্গল", ১৮৪৯ সালের লেখা রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাধা-মাধবোদয়", ১৮২৫ সালের দিকে লেখা কৃষ্ণদাস বাবাজীর "ভক্তমাল", এর কাছাকাছি সময়ে রচিত জগন্নাথ দাসের "ভক্ত চরিতামৃত", কিংবা ১৮০৭ সালের লেখা কমলাকান্ত দাসের "পদরত্নাকর" প্রভৃতিব মধ্যে বিষয়-বস্তুর দিক থেকে কিছু কিছু নতুন জিনিস রয়েছে। মনসা, চণ্ডী, শিব, গঙ্গা, ধর্ম্ম প্রভৃতির মত প্রাচীন-বাংলা-সাহিত্যের অবলম্বনস্বরূপ প্রধান প্রধান দেবদেবীর সীমা ছাড়িয়ে আরও বহু নতুন দেবদেবী ও এই সময়কার ব্রতকথা ও পাঁচালীর মধ্য দিয়ে বাংলা-সাহিত্যে এসে পড়েছিল: সুবচনী, শনি, সূর্য এবং লক্ষ্মী এক্ষেত্রে একরূপ নতুন। অনেকগুলি পুরাণও এ-সময়ে কাব্যে অনূদিত হয়েছে। উপাখ্যানের দিক থেকে ও কিছু কিছু নতুন জিনিস বাংলায় এসেছে। এ-প্রসঙ্গে কালীপ্রসাদ কবিরাজের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বত্রিশ সিংহাসন" নামক কাব্য দু'টি, উমাচরণ মিত্রের "গোলে বাকাওলী"-কাব্য

এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের (১৮০৭-১৮৭৪) Gay's Fables এর কাব্যানুবাদ প্রভৃতির কথা তুল্‌তেই হয়। ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়ে বাংলার লোক কবিতা লিখেছে, বিস্তর। এ-সমস্ত সাহিত্যে কিছু নতুন জিনিস থাক্‌লেও, তা' প্রাচীন-সাহিত্যের বিগত যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারে নি।

এসময়কার হাজার রকমের পুরানো বস্তুর জগা-খিচুড়ি থেকে এক একটি ক'রে কয়েক রকমের গান দেখা দিলে। সেই নতুন ধরনের কাব্য আর গাল-গল্প লোককে ভাল রকমে তৃপ্তি দিতে পারে নি। বিশেষ করে, লোকের জীবন-সংগ্রাম আগের চাইতে কঠিন হ'য়ে উঠায়, তার আর সাবেক কালের অবসর থাক্‌ল না। সেই জন্য বসে বসে বড় বড় পুঁথি পড়ার এবং তার রসগ্রহণ করার সময়ও এ'ল কমে। লোক নতুন কিছুর প্রতীক্ষায় থাক্‌লো ত বটেই, তার সাথে সাথে খুব কম সময়ে সাহিত্য-রস উপভোগ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করলো কম নয়। তারি ফলে, বাঙালীর মধ্যে আখ্‌ড়াই গান, কবিগান, পাঁচালী গান এবং যাত্রাগান একে একে লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠলো। এগুলি এ সময়ে বাঙালীকে যে-ভাবে মাতিয়ে রেখেছিল, তখনকার কোন সাহিত্য তেমনটি পারে নি। সাময়িক চাহিদার ফলে এসব গানের জন্ম হ'য়েছিলো ব'লে, কেউ তখন এগানগুলিক রক্ষা করে নি। কিন্তু হালে তার প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়েছে—এখন এসব গানের কিছু কিছু সংগ্রহ চলেছে। এতে আমরা আজ আখ্‌ড়াই-গানের সব চাইতে বড় কবি রামনিধিগুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) কবিগানের শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা রামবসু (১৭৭৯-১৮৩০), বাংলার সব চাইতে ভালো পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৭৪২-১৮৩৯) এবং নামজাদা যাত্রাগান লেখক কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮০৬-১৮৫৮) প্রভৃতির সাথে পরিচিত হ'য়ে উঠেছি।

বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ধারা যখন এভাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে আস্‌ছিল, তখন তার পাশেই আর এক নতুন ধারা জন্ম নিচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই, এই ধরুন, ইংরেজী ১৮০০ সাল থেকেই বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের, নবীন আদর্শের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর মূলে ছিল,—কয়েকটি বড় বড় ঘটনা। এগুলির মধ্যে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে উদ্ভাবিত বাংলা মুদ্রাযন্ত্র, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, রাজা

রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাব, এবং বঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির নাম না ক’রে উপায় নেই। বাংলা মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবিত না হ’লে বাংলা-ভাষার বর্তমান উন্নতি হতোই না। (Wilkins) নামক রে’খে একজন মিশনারী সাহেব ইংরেজী ১৭৭৮ সালে পঞ্চানন কর্মকারকে সাথে রে’খে হুগলীতে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র বসালেন ; এই মুদ্রা যন্ত্রেই এই বছরে (Halhead) সাহেবের “বাংলা ব্যাকরণ” ছাপা হ’লো। এই হুগলী ছাপাখানার আগেকার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না বটে, তবে এতে যে ভবিষ্যতের পথ খুলে গেল, তাতে সন্দেহ নেই। ১৭৯৮ সালে শ্রীরামপুরে পাদ্রীসাহেবদের ছাপাখানা বসলো। হুগলীর Wilkins -এর ছাপাখানাটিই এবং শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র গোড়ায় বাংলা-সাহিত্যের ভাবী অদৃষ্টকে শুভ-গ্রহের মতো প্রভাবিত করেছে। এখান থেকেই পাদ্রিদের চেষ্টায়পুরোনো ও নতুন আদর্শের বহু বাংলা বই ছাপা হয়ে দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

শ্রীরামপুরে পাদ্রী সাহেবদের ছাপাখানা বস্‌বার সাথে সাথেই কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের আয়োজন চল্‌লো এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজ চালু হ’লো। বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি বিধানেব তাগিদেই যে কলেজ বস্‌লো, তা নয়। তবে, পরোক্ষে এতে ক’রে বাংলা-সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনার গোড়া পত্তন- হ’যে গেলো। এ সময়ে বিলেত থেকে যে-সব সিভিলিয়ান আমাদেব দেশে আস্‌তেন, তাঁদেবকে দেশীভাষা শেখাবার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। এতে দেশ-শাসনেব পক্ষে ইংবেজদের অসুবিধা হ’তো, বিস্তর। এ-অসুবিধাটুকুনকে দূর করতে গিয়েই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্ম। এ-কলেজে দেশীভাষা বিভাগেব প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরামপুরের পাদ্রী William Carrey। তিনি নিজে বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনায় মন দিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে দেশীয পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা গদ্যে বই লেখার ব্যবস্থা করা হ’ল। কেরী ও তাঁব সহকর্মীদের আগে আমাদের দেশে যে গদ্য-রচনা ছিলো না, তা নয। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, সরকারী দলিল পত্রাদিতে তাঁদের বহু আগের থেকে গদ্যে বাংলা লেখার রেওয়াজ চলে আস্‌ছিলো। কিন্তু এ গদ্যকে সাহিত্যের ভাযা বলে কেউ তখনও স্বীকার করে নি ;—এ-ভাষা যে সাহিত্যের ভাষা হ’তে পারে, সে কথা লোকে ভাব্‌তেও পারতো না। পাদ্রী কেরী এবং তাঁর বাঙালী সহকর্মীরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা প্রথম আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যখন গদ্য রীতির ভিতর দিয়ে বাংলা-ভাষার নতুন জীবনের সঞ্চার হচ্ছিল, তখন দৈবক্রমে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাব হ'ল। তিনি সাহিত্য সাধনা হিসাবে বাংলা-ভাষার উন্নতির জন্য কিছু যে করলেন, তা' নয়; —তবে তিনি ধর্ম-সাধনা করতে গিয়ে প্রধানতঃ বাংলা গদ্যের আশ্রয় নিলেন। এতে বাঙালীর ভাব প্রকাশে বাংলার গদ্য লেখাও যে একটি বিশেষ উপায়, তা প্রমাণিত হ'য়ে গেলো। ১৮১৪ সালে ৫০ বৎসর বয়সে তিনি কোলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বাস করতে লাগলেন এ সময় থেকে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মন দিলেন। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে এ সময় থেকে তার প্রায়ই বিচার করতে হতো। এ সব বিচার মৌখিক হ'ত না, লিখেই হ'ত। এর ফলে ১৮১৫ সাল থেকে নিয়ে ১৮২৩ সাল অবধি তিনি "বেদান্ত উপনিষদে "প্রবর্তক-নবর্তকের সংবাদ", "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার", "গোস্বামীর সহিত বিচার", "ব্রাহ্মণ সেবধি" এবং "পথ্য প্রদান" প্রভৃতি অনেক ধর্মসংক্রান্ত বই বাংলা গদ্যে রচনা করলেন। তাঁর বিপক্ষ দলও এ সময়ে গদ্যে বড়-ছোট অনেক বই লিখে, তাঁর মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করলেন। এর মধ্যে ১৮২৩ সালে লেখা পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের "পাষণ্ডপীড়ন" নামক গ্রন্থই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৯ সালে রাজা রামমোহন রায় "সংবাদ-কৌমুদী" নামক পত্রিকা বার করলেন; তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন কাগজ বার ক'রে তাঁর উত্তর দিতে শুরু করলেন। এমনি করেই ধর্মীয় কোন্দলকে আশ্রয় ক'রে রাজা রামমোহন রায় ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচিত গ্রন্থ ও প্রকাশিত পত্রিকার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য রচনার রীতি অনুশীলিত হ'তে থাকে। এ-সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডা বাংলা গদ্যকে জনসাধারণের মধ্যে আদরণীয় ও বরণীয় ক'রে তুলতে সাহায্য করে।

ভেতর বা'র দুই থেকে নতুন হ'য়ে বাংলা-সাহিত্য দেখা দিতে যা আবশ্যক হ'য়েছিল, তা' হল দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার ও দেশে বিশেষ করে কোলকাতায় ছোটখাটো ইংরেজী শিক্ষার নানা প্রতিষ্ঠান ছাড়া ১৮২৪ সালে স্থাপিত "সংস্কৃত কলেজ," যা পরে Presidency College-এ পরিণত হয়েছে, ১৮৩৬ সালে স্থাপিত হুগলীর মহসীন কলেজ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। এ সব

প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে লোকও পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে শুরু করলে। এ সময়কার নবীন পদ্য-সাহিত্যের প্রধান দিকপাল মধুসূদন সংস্কৃত কলেজের এবং আধুনিক ধরনেব বাংলা গদ্য কথা-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীর মহসীন ও কলিকাতার Presidency College-এর ছাত্র।

এই যে বড় বড় ঘটনা কয়টির নাম করা হ'ল, এর ফলে বাংলা-ভাষার নতুন আদর্শের সাহিত্য-সৃষ্টির আয়োজন সার্থক হ'য়ে উঠেছে। এ সাহিত্যের সব চাইতে বড় অবলম্বন গদ্যও এখন থেকে সাহিত্যের ভাষা হ'বার অধিকার লাভ করেছে; তবে তা একদিনে হয় নি। বাংলা-ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ তৈরি দিয়েই এ আয়োজনের শুরু এবং পাদ্রী সাহেবদেরকে দিয়েই তার হাতে খড়ি। ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত পাদ্রী Helhead সাহেবের "বাংলা ব্যাকরণই" বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বাংলা গ্রন্থ এবং ১৭৯৯ সালে মুদ্রিত Foster সাহেবের "বাংলা অভিধানই" প্রথম বাংলা শব্দকোষ। এর পরে, ১৮০১ সালে পাদ্রী উইলিযম কেরী তাঁর "বাংলা ব্যাকরণ", মিলার তাঁর "বাংলা অভিধান", এবং কেরী, মার্সম্যান ও হগটন পরপর ১৮২৫,১৮২৭ ও ১৮৩৩ সালে তাঁদের "বাংলা অভিধান" ছাপিয়ে এ আয়োজনকে বেশ খানিক দূব এগিযে দিলেন।

ব্যাকরণ ও শব্দকোষের পরেই দেখা দিল, গদ্যে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা। ১৮০১ সালের ছাপা "কথোপকথন" নামক গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকের মুখের ভাষা ধৃত ক'রে এক্ষেত্রেও আমাদেরকে পথ দেখালেন পাদ্রী কেরী। তাঁরই প্রেরণা, উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ মধ্য থেকে গোলোকনাথ বসু ১৮০১ সালে "হিতোপদেশ" রামরাম বসু ১৮০১ সালে "প্রতাপাদিত্য চরিত" ১৮০২ সালে "লিপিমালা" মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৮০২ সালে "বত্রিশ সিংহাসন", ১৮০৮ সালে "রাজাবলী" ও "হিতোপদেশ", ১৮৩৩ সালে "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" চণ্ডীচরণ মুন্সী ১৮০৫ সালে "তোতাইতিহাস" লে'খে গদ্যে বাংলা রচনার পথকে আরও একটু প্রশস্ত ক'রে তোল্লেন। এঁদের সংস্কৃত ও ফারসী শব্দবহুল বাংলা গদ্য মোটামুটি আড়ষ্ট হ'লেও জায়গায় জায়গায় বেশ প্রাঞ্জল, এ যেন ব্রীড়াবনতা গৃহবধূপথ চল্‌তে চল্‌তে এক একবার ভড়কে গিয়ে থেমে যাচ্ছেন, অথচ আলতো চরণে সুমুখ পানে ছুটে চলেছেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার রয়েছে,—এই সমস্ত বইয়ের প্রায় সব কয়খানিই অনুবাদ ; তবে তা গদ্যে, এই যা তফাৎ। "তোতা ইতিহাস" ফারসী "তুতীনামার" অনুবাদ এবং "হিতোপদেশ" ' বত্রিশ সিংহাসন" প্রভৃতি সংস্কৃতের অনুবাদ। এর পাশে পাশে ইংরেজীর অনুবাদও নেহাৎ কম হয় নি। ১৮০১ সালে কেরী বাইবেলের অনুবাদ করেছেন ১৮০৩ সালে তারিণীচরণ মিত্র "ইশফের গল্প" নাম দিয়ে Aesop's Fable এর অনুবাদ করেছেন, ১৮২০ সালে পাদ্রী Elerton সাহেব "মঙ্গল সমাচার" নাম দিয়ে মথি ও যোহনের Gospel অনুবাদ করেছেন। এই যে ফারসী , সংস্কৃত ও ইংরেজীর অনুবাদ শুরু হলো ; তা বঙ্কিমের পূর্বে পর্যন্ত জোরে চল্‌লো। এতে ভাষা সমৃদ্ধ হ'ল, গদ্যও সবল হ'য়ে উঠ্‌লো।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের পাদ্রী সাহেবদের আওতার বাইরে বাংলা-ভাষার নব্যগদ্য রীতির স্থান হ'ল ১৮১৪ সালের পর থেকে রাজা রামমোহন রায়ের বদৌলতে। সে-কথা একটু আগেই বলেছি। তখনও কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরানো যুগের পদ্যের প্রভাব বিশেষ কমে নি। সাহিত্যের এ অবস্থা পাদ্রী সাহেবেরাও বুঝেছিলেন। তাঁরা এ-সময়ে গদ্যের নতুন পথ ছেড়ে দিয়ে, পুরানো ধরনের পদ্যেব পথেও সময় সময় চল্‌তেন। দেখা যাচ্ছে পাদ্রী সাহেবেরা gospel বা সুসমাচারাদি খ্রীস্টানী বই কাব্যে রচনা করে বা করিয়ে নিয়ে, পুঁথিব আকারে তুলট কাগজে লিখিয়ে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারেব উদ্দেশ্যে লোকের ভেতর ছেড়ে দিতেন। ১৮৬৬ সালের লেখা এ জাতীয় "নিস্তার রত্নাকর" নামে একখানি খ্রীস্টানী পুঁথি সম্প্রতি বীরভূম অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সে যা হোক, ১৮৪০ সাল অবধি গদ্যরীতি সাহিত্যিক-রীতি হিসেবে দাঁড়াতে পেরেছে বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। ১৮২৩ সালের লেখা প্রমথনাথ শর্মার "নব বাবুবিলাস" গদ্যপদ্যে রচিত একটি চম্পূকাব্য। ১৮৩০ সালের লেখা "নব বিবিবিলাস"ও এ-ধরনের আর একখানি বই। ১৮৪৫ সালের দিকে এসে গদ্য রীতি দাঁড়িয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে। এ-সময়ে কোচবিহার দরবারের মুন্সী জয়নাথ বাংলায় এ-প্রত্যন্ত ভাগে ব'সেও "রাজোপাখ্যান" নামে কোচবিহার রাজবংশের একটি ইতিহাস লিখেছিলেন। "সমাচার চন্দ্রিকা" নামক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতি-

ষ্ঠাতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) এবং বিশেষ ক'রে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার চিরখ্যাত সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) এ দুজনের হাতে প্রাচীন পদ্যরীতির অবসান সূচিত এবং নতুন গদ্যরীতির পত্তন হ'ল। এঁরা গদ্য-পদ্য উভয় রীতিতে লিখেছেন।

বাংলা-ভাষার পুরোনো পদ্যরীতিতে নতুন আঙ্গিকের অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য আদর্শের ছোঁয়াচ লেগেছে এমন গদ্যরীতির এইরূপ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় স্বদেশ প্রেম, ১৮৫৯ সালের লেখা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৬-১৮৮৭) "পদ্মিনী উপাখ্যান" ছাড়াও "কর্মদেবী", "শূরসুন্দরী" ও "কাঞ্চী-কাবেরী" নামক পরবর্তী কাব্যত্রয়ে যে-গীতিপ্রবণতা ও পরাধীনতার বেদনা রূপ নিয়েছে, তা পরিণামে Romantic বা কল্পনাপ্রবণ আদর্শেরই ফল। এঁরা যেন দেশী ঘটে বিদেশী প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন। তার পরেই এলেন মধুসূদন—১৮৬০ সালে তাঁর "তিলোত্তমা-সম্ভব" ও "মেঘনাদ বধ" কাব্য নিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়ে একেবারেই বিদেশী ঘটে বিদেশী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর কল্যাণেই পদ্য সাহিত্য থেকে প্রাচীন আদর্শ একেবারেই বিদায় নিলে এবং নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

বাংলা গদ্যকে প্রকৃত সাহিত্যিক মর্যাদা দিলেন বাংলার দুইজন মনীষী: এঁদের একজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), আর এক জন অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৭)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী গদ্যকে এবং রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির ধর্মীয় কোন্দলমূলক নীরস গদ্যরচনাকে এঁরা ভেঙে সরল ও সরস করে তুল্লেন। বিদ্যাসাগরের ১৮৪৭ সালের লেখা "বেতাল-পঞ্চবিংশতি", ১৮৫৪ সালের লেখা "শকুন্তলা" এবং ১৮৬০ সালের লেখা "সীতার বনবাস" সাহিত্যিক প্রাণ নিয়েই লেখা। অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর "চারুপাঠ", "ধর্ম্মতত্ত্ব", "পদার্থ বিদ্যা" প্রভৃতি বার ক'রে দেখিয়ে দিলেন বাংলা-গদ্য পদ্যের চেয়ে অধিক জোরালো, এবং স্বাভাবিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সাহিত্যপ্রবণ, আর অক্ষয় বাবু ছিলেন বিচার ও বুদ্ধিপ্রবণ। এঁদের ভাষায় বিশষ কোন তফাৎ ছিলো না; তবে দুইজনের রচনা বিষয়ের দিক থেকে একেবারেই আলাদা।

এঁরা বাংলা গদ্য রচনাকে সরস ও সরল ক'রে তুল্লেন বটে, কিন্তু এঁদের কাউকে মৌলিক রচনার সম্মান দেওয়া যায় না ; কারণ এরা মূলতঃ অনুবাদক। এদিক থেকে প্যারীচাদ মিত্র ওরফে ঠেকচাঁদ ঠাকুর সকলের ওপর টেক্কা মেরেছেন---১৮৫৮ সালে "আলালের ঘরের দুলাল" লেখে। বইখানি যেমন মৌলিক তেমনি সামাজিক। সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার থেকে অনুবাদ করার কথা ছেড়ে দিয়ে, মৌলিক কিছু যে গদ্যে লেখা চলে, তা আবার সাহিত্য বলেও গণ্য হয়, ঠেকচাঁদ ঠাকুরই তা প্রথম দেখালেন। এর পরেই ,১৮৬২ সালে কালী প্রসন্ন সিংহের (১৮৪১-১৮৭০) "হুতুম প্যাঁচারনক্সা." বেরুলো। এটিও বাংলা গদ্য রচনার গোড়ার দিককার মৌলিক বই এবং কথা-সাহিত্যের অগ্রদূত।

"আলালের ঘরের দুলাল" বেরুবার কিছু আগে থেকেই বাংলা ভাষায় নতুন আদর্শের নাট্য-সাহিত্য রচনার আয়োজন চল্‌ছিলো। এদিক থেকে, রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২৩-১৮৮৫) "কুলীনকুল সর্বস্ব"ই বাংলা-সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক। ১৮৫৪ সালেই ইহা প্রকাশিত হয়। তারপরই ১৮৫৮ সালে "শর্মিষ্ঠা" নাটকে নতুনভাবে নতুন আদর্শ নিয়ে এলেন, মধুসূদন। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৪) যুগান্ত-কারী নাটক "নীলদর্পণ" বেরুলো। এরপর পরই বাংলা নাট্য- সাহিত্যের আগাগোড়া চেহারা পালটে গেলো নতুন ধরনের নাটক ও প্রহসনে বাংলা সাহিত্য ভরে উঠলো এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চ জাঁকিয়ে উঠ্‌লো।

সাময়িক সাহিত্যের মধ্যে পত্র ও পত্রিকাই ছিল আসল। এদিক থেকে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮১৬ সালে প্রকাশিত "বেঙ্গল গেজেট" বাংলা-ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র। এর পর থেকে দ্বারকা বিদ্যা-ভূষণ সম্পাদনায় ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত "সোমপ্রকাশ" অবধি প্রায় ৯০ খানি সংবাদ পত্র নানা স্থান থেকে বাংলা-ইংরেজী, ইংরেজী-বাংলা, ফারসী-বাংলা কিংবা শুধু বাংলা-ভাষায় বেরিয়েছে। তার মধ্যে "সমাচার দর্পণ", "সংবাদ কৌমুদী", "সমাচার-চন্দ্রিকা, "সংবাদ প্রভাকর", পূর্ণচন্দ্রের "রসরাজ", "সুধাবর্ষণ" ও "এডুকেশন গেজেট" প্রভৃতিই প্রধান। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩০) এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' কাগজে পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের অনেক

লেখকের হাতে খড়ি হয়েছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও "সংবাদ-প্রভাকরের" শিক্ষানবীশী করেছেন, অনেক দিন।

এভাবেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের আয়োজন যখন ক্রমেই পূর্ণ হ'য়ে আস্‌ছিলো, তখন ভূদেববাবু (১৮২৫-১৮৯৪) তাঁর "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বা'র করলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" কিংবা "হুতুম প্যাঁচার নক্সার" সাথে এ-বইয়ের তুলনা হয় না। প্রকৃত আধুনিক ধরনের উপন্যাস বলতে যা বুঝায়, এটি সে জাতীয় বই। এ-বই দুই ভাগে বিভক্ত—"সফল স্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়"। Romance of History নামক ইংরেজী গ্রন্থই এর আদর্শ এবং "অঙ্গুরীয় বিনিময়ের" কিছু অংশ এই ইংরজী বই থেকেই নেওয়া। বাকিটা ভূদেব বাবুর স্বাধীন রচনা। ভূদেব বাবু যখন এ-বই লেখেন, তখন কি "পদ্মিনী উপাখ্যান" কি "কর্ম্মদেবী", কি "দুর্গেশনন্দিনী"—কোনটাই লেখা হয় নি। সুতরাং ভূদেব বাবুকে বাংলা আধুনিক ধরনের উপন্যাসের পথপ্রদর্শক বল্‌তেই হবে।

ভূদেব বাবুর পরেই ১৮৬৪ সালে "দুর্গেশনন্দিনী" নিয়ে বঙ্কিমের আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যুগ পালটে গেল, কথা-সাহিত্যে এক অচিন্ত্যপূর্ব নতুন আদর্শ ও কলা-কৌশল দেখা দিলে। বিস্ময়বিমুগ্ধ-চিত্তে বাঙালী এত দিন পরে দেখতে পেলে, তার ভাষা, তার সাহিত্য তার মনীষা এক অপূর্ব মূর্তি গ্রহণ করেছে। এই বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করতে হ'লে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল্‌তে হয়,—

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে সূর্যোদয় বিকাশ করলেন।----কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি। কোথায় গেল সেই 'বিজয়-বসন্ত" সেই "গোলে বকাওলী"—সেই বালকভুলানো কথা—কোথা হ'তে এলে এত আলোক এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য !"

এমনি করেই বঙ্কিমের সময় থেকে বাংলা-সাহিত্য নতুন প্রেরণা ও শক্তি নিয়ে নতুন পথে তার আনন্দময় জয়যাত্রা শুরু করল। বিশ্বের দরবারে প্রাপ্য আসন নেওয়াই ছিল তার প্রধান চেষ্টা ও মূল লক্ষ্য। আজ তার সে চেষ্টা সার্থক হ'য়েছে, তার সুদূর লক্ষ্য মিলেছে। আমরা কামনা করি, তার প্রাপ্তি আরও সুন্দর, আরও মঙ্গলময় হ'য়ে উঠুক।

নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা

আজকাল আমাদের অনেকেই সখ করিয়া পুরানো বাংলার আলোচনা করি এবং এই আলোচনা শুনি। আমার মনে হয়, ইহা যেন ভূরি-ভোজননিরত ব্যক্তির সখ করিয়া চাট্‌নি খাইয়া রুচি পাল্‌টাইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। কেননা, আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা এই বিষয়ে সত্যিকারের রুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, অথবা এই বিষয়ে সত্যিকারের উদ্যোগী। দেশের মাটির রস-ধারায় সিক্ত নয় এমন হাল্ ফ্যাশনের বাংলা-সাহিত্য আলোচনা করিতে করিতে অরুচি ধরিয়া গেলেই, সাধারণতঃ, আমরা পুরানো বাংলার দিকে সাময়িকভাবে নজর দিয়া থাকি। সেই কারণেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যালোচনায় আজও পুরানো বাংলা কৌতূহল-উদ্রেকাত্মক প্রাচীন বস্তুর পণ্যশালায় (Old curiosities shop) পরিণত হইয়া রহিয়াছে; ইহা এখনও জাতির অস্থিমজ্জায় গৌরবের সামগ্রীরূপে রূপায়িত হইয়া উঠে নাই।

আবার, যাঁহারা এই পণ্যশালায় কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিও সকল দিকে সমভাবে সঞ্চারিত হয় নাই,—এক একটি বিষয় যেন তাঁহাদিগকে অধিকমাত্রায় অভিভূত করিয়াছে। মনের স্বাভাবিক কৌতূহলবশে আমরাও এই পণ্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইহা যে-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যে-দিকে অপর ব্যক্তির নজর পড়ে নাই বা খুব কমই পড়িয়াছে, আমাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ সেইদিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হয়ত স্বভাবের দোষ; কিন্তু তথাপি দৃষ্টির সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে পুরানো বাংলাকে অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে পুরানো বাংলাকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য হই। এই দৃষ্টিকে “মুসলিম-দৃষ্টি’ বলিয়া অভিহিত করিতে দোষ কি? বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের সমবেত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার ফলে যখন বাংলা-সাহিত্যের উদ্ভব, বর্ধন ও বর্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে, তখন এই সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ধারাকে পরীক্ষা করিয়া দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

বাংলা-ভাষার বয়স মোটামুটি হাজার বছর বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে। বাংলার সহিত মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও প্রায় হাজার বছরের। বাংলা-ভাষার জন্ম হইতেই এদেশের সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, এদেশের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস ও ভাষার ক্রম-বিকাশের স্তরে স্তরে মুসলমানদের সাধনাও জড়াইয়া রহিয়াছে। এ-ইতিহাস নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহার প্রধান প্রধান বৈচিত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

অনেকের ধারণা, খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলার সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল না। এ-ধারণা একান্ত ভ্রমাত্মক। খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে এদেশের সহিত মুসলমানদের ধর্মীয় ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়। পাহাড়পুরে পাল-যুগের ভূপ্রোথিত বৌদ্ধ-বিহার হইতে খলীফা হারুন্-র রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) একটি মুদ্রার (৭৮৮ খ্রীঃ) আবিষ্কার; প্রাচীন আরবী ভৌগোলিকগণ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব বণিকগণের উপনিবেশ সংস্থাপনের সাক্ষ্য; চট্টগ্রামে-সুলতান বায়িজীদ বিস্তামীর (মৃঃ ৮৭৪ খ্রীঃ) পদার্পণ, বগুড়ার মহাস্থানে মীর সৈয়দ সুলতান মাহীসওয়ারের (১০৪৭ খ্রীঃ) আগমন, ময়মনসিংহের মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমীর (১০৫৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা, ঢাকার বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদের আত্মোৎসর্গ এবং ঐ জেলার মাণিকগঞ্জের পারিল গ্রামে গাজী মুল্‌ক্ ইক্‌বাল খানের (১২১৪ খ্রীঃ) আগমন, গৌড়ের পাণ্ডুয়ায় মখ্‌দুম্ শয়খ্ জলালু দ্-দীন্ তব্‌রিজীর (মৃঃ ১২২৫ খ্রীঃ) ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ঘটনার পর ঘটনার পটপরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মুসলিম-রাষ্ট্র স্থাপিত হইবার বহুপূর্বে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেই বাংলার সহিত ইসলাম ও মুসলিম-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধ ছিল মূলতঃ স্থানীয় ভাবাপন্ন। শুধু ধর্ম ও বাণিজ্যের সূত্রে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানের লোক ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হইল বটে, কিন্তু এই নব-পরিচিত প্রসার ও নিবিড়তা স্থান, কাল ও পাত্র এই তিনটিকে ছাড়াইয়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এই কারণেই বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বাংলার এই সময়কার ইসলামের কোন বিশেষ যোগাযোগ ছিল না,---থাকা সম্ভবপরও নহে।

আরও একটি বিশেষ কারণে বাংলা-ভাষার সহিত এই সময়কার ইসলামের যোগ সাধিত হয় নাই। যে-ভাষাকে আজ আমরা বাংলা-ভাষা বলি, তাহা খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বলা হয় যে, এই সময়ের মধ্যে কাহ্নুপাদ, ভূসুকপাদ, লুইপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত “চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়” নামে খ্যাত কতিপয় পদ বাংলা-ভাষার আদিম নিদর্শনরূপে লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই ‘চর্যাপদ”-গুলির ভাষা যে বাংলা-ভাষার জনক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে, তখনও আমাদের ভাষার এই জনকটি যে একান্তই অসহায় শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই,—এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, “চর্যাপদ”-রচয়িতাদের মধ্যে কেহই বাংলার অধিবাসী ছিলেন কি না, সে-বিষয়ে অনুমান ব্যতীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে-ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা “প্রাকৃত-ভাষা”র একধাপ নীচের এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা-ভাষার বেশ একধাপ উপরের পূর্বভারতীয় অপভ্রংশ ভাষাগুলির মধ্য হইতে একটি মাত্র। আবার বাংলাদেশের সর্বত্রই এই অপভ্রংশ ভাষাটির প্রচলন ছিল কি না, সে কথাই বা আজ কে বলিবে?

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই খাঁটি বাংলা বলিতে পারা যায়, এমন ভাষা এই দেশে আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া রূপ গ্রহণ করিল। ঠিক এই সময়েই বাংলার হিন্দু-রাজত্বের অবসান ও তুর্কী-জাতির অধীনে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত হয়। হিন্দু শাসনকালে “সংস্কৃত’ ছিল এদেশের ধর্মীয় দেবভাষা এবং সেই কারণে সাংস্কৃতিক ও দরবারী ভাষা। পবিত্রতার অজুহাতে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ এই ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং আবশ্যক মত পুঁথিপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকার্য পর্যন্ত সর্ববিষয়ে এদেশের শিক্ষিত সমাজ এই ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ করিতেন। সেই কারণে দেশের জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল স্তরের লোক তাঁহাদের প্রাত্যহিক কাজে অপভ্রংশ (বাংলা) ব্যবহার করিলেও, সংস্কৃত-ভাষার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার নিকট দেশের অপভ্রংশ-ভাষা কখনও দাঁড়াইতে পারে নাই। সুতরাং বঙ্গে হিন্দু-রাজত্বকালে খাঁটি বাংলা-ভাষা সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া ছিল কি না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া হইতে বাংলার তুর্কীজাতির অধীনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দেশের ধর্ম, শাসন ও সংস্কৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া

ভাষা পর্যন্ত সকল বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিল। অবশ্য, এই পরিবর্তন এক নিমিষে সাধিত হয় নাই। তুর্কী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবী, আর সাংস্কৃতিক ও দরবারী ভাষা ছিল ফারসী এবং ঘরে ব্যবহারের ভাষা ছিল বেশ ফারসী-মিশ্রিত তুর্কী। এই স্বাভাবিক কারণে, মুসলিম রাজত্বের গোড়া হইতে দেবভাষা "সংস্কৃত" ইহার দেবত্ব খোয়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও দরবারী প্রতিষ্ঠাও হারাইয়া ফেলিল। হিন্দুর ধর্ম-জগতে তাহার প্রভাব আজ পর্যন্ত বিশেষ খর্ব হয় নাই বটে, তবে দেশের শাসন-ক্ষমতা হারাইয়া, ইহা একেবারেই পঙ্গু হইয়া পড়িতে থাকে। ক্রমেই এই ভাষা আভিজাত্যবর্জিত হইয়া "দেশীভাষা"-র সমপর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সংস্কৃত-ভাষার পক্ষে এই বাধ্যতামূলক দুর্বলতা কাল-ধর্ম-দোষে স্বাভাবিক দৌর্বল্যে পরিণত হইয়া খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহাকে জীবন্মৃত করিয়া তুলিল। ইহার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা-ভাষার লক্ষণাক্রান্ত অপভ্রংশ-ভাষা তাড়াতাড়ি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমেই দেশে এইভাবেই খাঁটি বাংলা-ভাষার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও প্রসারের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলা-ভাষার এই নবীন অধ্যায় লিখিত হয়,---ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দেড়শত বৎসরের মুসলিম-রাজত্বের স্থায়িত্বের দ্বারা সৃষ্ট নূতন সুযোগ প্রাপ্তি ও নয়া-আবহাওয়ার পত্তনে। এই সময়কার বাংলা-ভাষার নমুনা বাঙালীর কোন সাহিত্যে আজ পর্যন্ত মিলে নাই বটে, কিন্তু ইহার কিয়ৎকালপরবর্তী বাংলাভাষার নমুনা বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে" পাওয়া যাইতেছে। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে"-র ভাষা দেখিয়া ইহার এক শতাব্দী পূর্ববর্তী বাংলা-ভাষার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই যুগকে বঙ্গে ইসলাম-বিস্তৃতির ইতিহাসে "বোধনীয় প্রবর্তনার যুগ" বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই সময়ে বহু ধর্মপরায়ণ দরবেশ, অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ গাজী এবং অসংখ্য ইসলাম-বিশারদ আলিম বাংলায় আগমন করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিলেন। বেশির ভাগ সময়ে হিন্দু সভ্যতা ও শাসন-কেন্দ্রগুলিতেই তাঁহাদের আস্তানা পড়িল। স্বধর্মানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল তুর্কী শাসক-সম্প্রদায়ের ক্ষাত্রশক্তির পরোক্ষ ও

প্রত্যক্ষ সমর্থনে দেশে ইঁহাদের ধর্মপ্রচার কার্য জোরে চলিত লাগিল। এই-ভাবে দেশে ইসলাম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল বটে, তথাপি তাহা মুসলমানদের মধ্যে বাংলা-ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ছিল না। কেননা, তখন পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিদেশাগত ও নও-মুসলিম হিসাবে যে-দুই শ্রেণীর মুসলমান ছিল, তাহাদের কোন শ্রেণীই তখনও সাহিত্যসৃষ্টির কথা ভাবিতে পারেন নাই।

তখন বাংলার বাহির হইতে যে-সকল মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় খুব অল্প ছিলেন। দেশের শাসন-কার্যেই তাঁহারা ব্যস্ত। বিশেষতঃ ফারসী ছিল তাঁহাদের সাহিত্যের ভাষা; এই ভাষাতেই তাঁহারা সাহিত্যালোচনা করিতেন। বাংলার সাহিত্য-রচনা বা আলোচনা করিবার মত ভাষাগত অধিকার তখনও তাহারা লাভ করেন নাই, অথবা তদ্রূপ অধিকার লাভের আবশ্যকতাও বোধ করেন নাই। বাঙালী নও-মুসলিমগণ সংখ্যায় বেশ পুষ্ট থাকিলেও, তখন তাঁহারা সবেমাত্র ইসলামের ন্যায় এক নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিতেছেন। এমন অবস্থায় প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতিগত মানসিক সংঘাতের পীড়ন কাটাইয়া তাঁহারা সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার মত মনের অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, এই দেড়শত বৎসর কাল বাংলার মুসলমান সমাজে বাংলাভাষা-প্রবেশের সময় ছিল। রাজকার্য ও বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিদেশাগত মুসলমানগণ বহু পূর্ব হইতেই কিছু কিছু বাংলা-ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তখনও এই শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকার ভাবে বাংলা-ভাষা প্রবেশ করে নাই। তাহা হইতে আরও বহুদিন লাগিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে নও-মুসলিমদের জন্মগত ভাষার অধিকারকে অবলম্বন করিয়া বাংলা-ভাষা বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। তারপর বৈবাহিক সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়াও তাঁহাদের মধ্যে এই ভাষা সম্প্রসারিত হয়। নও-মুসলিমগণ ত বাংলা বলিতেনই, তদুপরি বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যে-সকল তুর্কী কর্মচারী ও সৈন্য রহিয়া গেলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এদেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া বাঙালী বনিতে লাগিলেন; কেননা তাঁহারা নিজ দেশ হইতে সপরিবারে বাংলায় আসেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। প্রধানতঃ এইরূপেই বাংলা-ভাষা ধীরে ধীরে বাংলার মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে

লাগিল। এইরূপ একটি সমাজে সম্যক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পক্ষে দেড়শত বৎসর ভাষার ইতিহাসে মোটেই দীর্ঘসময় নয়।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া বাংলা-ভাষার পূর্ব অবস্থার বেশ পরিবর্তন ঘটে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থাই এইজন্য প্রধানতঃ দায়ী। তখন বঙ্গদেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ফখ্রু-দ্-দীন্ মুবারিক শাহ্, ইখ্তিয়ারু-দ্-দীন্ গাজী শাহ্, আলাউ-দ্-দীন্ আলী শাহ্ এবং শামস্-দ্-দীন্ ইলিয়াস শাহ্ (১৩৩৯-১৩৫৮) নামক প্রতিদ্বন্দ্বী চতুষ্টয়ের মধ্যে বাংলার স্বাধীনতা লাভের প্রতিযোগিতা দস্তুরমত শুরু হইয়া গিয়াছে। তখন এই প্রতিদ্বন্দ্বীরা বুঝিতে পারিলেন যে, শাসক-শ্রেণীর মুসলমানগণ শাসিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে না পারিলে এবং ধনবল, জনবল ও জ্ঞানবলের সাহায্য না পাইলে, তাহাদের পক্ষে ক্ষমতা লাভ করা সহজ নহে। বাংলার হিন্দু-সম্প্রদায়ের এইরূপ সমর্থন লাভ করিবার জন্য, এই সম্প্রদায়কে দেশের শাসন, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতিতে মুসলমানদের সমান অধিকার দিয়া, ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার আবশ্যকতাও অনুভূত হইল। তাই দেখা যায়, ফখরু-দ্-দীন্ মুবারিক শাহ্ শ্রীহর্ষ সেন নামক কোন খ্যাতনামা কবিরাজকে তাঁহার অন্তঃপুরচারিণীর সফল চিকিৎসার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূমের জমিদারী ও তৎসঙ্গে “রাজা” উপাধি দান করিয়াছেন। এই শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র বিনায়ক সেনও গৌড়ের সুলতানদের কাছ হইতে কণক-ছত্র, গজ ও বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ যখন সমগ্র বঙ্গ অধিকার করিয়া বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহার সৈন্যদলে বেশির ভাগই বাঙালী “পাইক” বা পদাতিক স্থান পাইয়াছিল। তিনি এই বিশাল বাঙালী পাইক-বাহিনীকে আদর করিয়া “আবূ-বঙ্গাল” বা বাংলার রক্ষক নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বাঙালী বীরগণ তাঁহার নিকট হইতে বাংলা উপাধিও লাভ করিতেন: তিনি চট্টবংশীয় বীর দুর্যোধনকে “বঙ্গভূষণ” এবং পুতিতুণ্ডবংশীয় বীর চক্রপাণিকে “রাজজয়ী” উপাধি দান করেন। সহদেব নামক আর এক বাঙালী বীর তাঁহার পক্ষে দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এক লক্ষ আশী হাজার পাইকের সহিত সমর-ক্ষেত্রে জীবন দান করেন।

এই ইলিয়াস শাহেরই অঙ্কশায়িনী সোনারগাঁয়ের বজ্রযোগিনী গ্রামের ব্রাহ্মণ-কুমারী 'ফুলমতী' বেগমের কথা সর্বজনবিদিত।

এইরূপে দেশের হিন্দু-সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুসলমানদের অধীনে স্বাধীন হওয়ার ফলে, রাজদ্বারে হিন্দু-সম্প্রদায়ের শুধুই যে প্রতিষ্ঠা জন্মিল তাহা নহে, এই সুযোগে বাংলা-ভাষারও খানিকটা সুবিধা হইয়া গেল। 'ম্যাগ্‌নাকার্টা'র মত আইনের বলে বাংলার লোক গৌড়ের সুলতানদের কাছ হইতে জোর করিয়া বাংলা-ভাষার অধিকার কাড়িয়া লইলেন না বটে, কিন্তু হিন্দু কর্মচারী ও জনসাধারণের সহিত সুলতানদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠার ফলে, শাসক-সম্প্রদায়ে জ্ঞাতসারে ও মৌন-সম্মতিক্রমে বাংলা-ভাষা দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া ফেলিল। আমরা দেখিয়াছি, এতদিন ধরিয়া বাংলা-ভাষা দেশের হিন্দু-সমাজের গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া এদেশের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠার সীমা বাড়াইয়া লইয়াছে। এইবার মুসলিম রাজশক্তির মৌন-সমর্থনে রাজ-অন্তঃপুর ও দরবার হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সর্বত্র বাংলা-ভাষার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। রাজভাষা হিসাবে বাংলায় ফারসী-ভাষা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সব সময়ে বেশির ভাগ বাঙালী ও বিদেশাগত মুসলমানের ঘরে এবং প্রায়ই বাহিরে কর্মক্ষেত্রে বাংলা-ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মোটের উপর, এখন হইতে প্রায় সকল মুসলমান বাংলা-ভাষা বলিতেন ও বুঝিতেন। এইরূপে বাংলা-ভাষা দেশে যতই প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হইয়া পড়িতেছিল, সংস্কৃত-ভাষা ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার সীমা সঙ্কোচন করিতে করিতে কেবল হিন্দুর ধর্মীয় গণ্ডিতে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিল। ইহার পর হিন্দুর ধর্মজগতের বাহিরে আর তাহার স্থান হইল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই নানাদিক দিয়া বাংলার আপন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে থাকে। দেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতিতে একে একে বাঙালীর জাতীয় প্রতিভার স্ফুরণ দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। স্বাধীন অবস্থায় বাংলার দীর্ঘ শান্তিভোগই ইহার কারণ। দেশে এইরূপ শান্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সুলতানগণও সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। এই প্রসঙ্গে সুলতান ঘয়াসু-দ্‌-দীন্‌ আজম

শাহের (১৩৮৯-১৪০৯) নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। সুদূর পারস্যের খ্যাতনামা কবি হাফিয সুলতানকে কবিত্বশক্তিতে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, সুলতান কবিকে বাংলায় পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ দান করিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের অজুহাতে কবি এই রাজসম্মান গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই নিমন্ত্রণের পশ্চাতে সম্ভবতঃ সুলতানের স্বপ্ন ছিল,---তিনি যেন বাংলার তালতমালাবৃত কুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া পারস্যের গোলাপ-বুল্‌বুলের প্রেমালাপ শ্রবণ করেন এবং সাকী-পরিবেষ্টিত শরাব পানের মাদকতায় বিভোর হইয়া বাংলার এক নবজীবনের সূত্রপাত করেন। সত্যই যদি ইহা সুলতানের স্বপ্ন হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে, তৎপরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার এই স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে এই যে সাহিত্য-প্রীতি ও বিদ্যোৎসাহিতা জাগ্রত হইল, ইহা শুধু রাজ-দরবারে সীমাবদ্ধ থাকিল না। ইহা অনতিবিলম্বে দরবারের আওতা ছাড়াইয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যেও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল। তখনও রাজ-দরবারে সাহিত্যের আলোচনা হইত ফার্‌সী-ভাষায়, আর দেশের জনসাধারণ সাহিত্যের আলোচনা করিত প্রচলিত বাংলা-ভাষায়। আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গে মুসলিম রাজত্বের অনুকূল আব-হাওয়ায় ইতঃপূর্বেই বাংলা-ভাষার অসহায় শৈশব অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। এখন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে আসিয়া বাংলা-ভাষা বেশ সবল ও বলিষ্ঠ শিশুতে পরিণত,—আপন পায়ে দাঁড়াইয়া ছুটাছুটি করিতে সমর্থ। ঠিক এই সময়ের বাংলা-ভাষারই নমুনা "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।" বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত কোন গায়ক-কবি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যে-সকল গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎকাল পরবর্তী কোন লেখকের কল্যাণে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" যে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত এবং ইহার রচয়িতা যে বাংলার 'চণ্ডীদাস' নামে চিরপ্রসিদ্ধ ও পরিচিত কবিটি, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা অতিরিক্ত পাকামির পরিচায়ক। বঙ্গে ইসলামধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রাথমিক যুগে রচিত বাংলার এই কাব্যটিতে মুসলিম-প্রভাব নিতান্তই নগণ্য, এবং এইরূপ না হইলেই বরং অস্বাভাবিক হইত। মুসলিম-সংস্কৃতিবাহী শ্রম, যুদ্ধাস্ত্র, ফল ও ফুল-সংক্রান্ত গোটা আষ্টেক ফারসী শব্দ মাত্র ধারণ করিয়া এই

কাব্যটি জানাইয়া দিতেছে যে, তখনও ইসলাম পারিপার্শ্বিক হিন্দু-সমাজে বড় বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে দেশের, এই সময়ের সাহিত্য আরও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না কেন? এক চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কি কেহ তখনও বাংলায় কিছু লেখেন নাই? বাংলার মুসলমানই বা তখন কি করিতেছিলেন? যাঁহারাই এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, তুর্কীদের অধীনে মুস্লিম্-শাসনের প্রাথমিক যুগের রাষ্ট্র-বিপ্লবই এইজন্য একমাত্র দায়ী; এই রাষ্ট্র-বিপ্লবই বাংলার এই সময়কার সমস্ত সাহিত্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য অপ্রচুর, তাহা সহস্রবার স্বীকার্য। কিন্তু, বাংলা-সাহিত্যের এই অপ্রাচুর্যের জন্য, যাঁহারা মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগের রাষ্ট্র-বিপ্লবকেই শুধু দায়ী করেন, তাঁহারা দেশের তখনকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বালকোচিত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবে দেশের লিখিত সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর অংশ নষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে, তবে এইজন্য ইহাই একমাত্র দায়ী নহে। কেননা, তখনকার রাষ্ট্র-বিপ্লবের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্বন্ধ বর্তমানের ন্যায় এত নিবিড় ছিল না। দেশে রাজা হইত বা যাইত, যুদ্ধে হার-জিত হইত। তজ্জন্য জনসাধারণের বড় একটা আসিত বা যাইত না। তাহারা ইহার খবরও রাখিত না। এই কারণে রাষ্ট্র-বিপ্লবের আওতার বাহিরে থাকিয়াও সাহিত্য-সাধনা করা চলিত। বাস্তবিকই, বাংলা-ভাষায় তখন যে-সাহিত্য রচিত বা আলোচিত হইত, তাহা রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদি এই উক্তি সত্য হয়, তবে এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য কোথায়? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর---বাংলাভাষায় তখনও প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নাই; কারণ তখনও ভাবপ্রকাশের অক্ষমতা ভাষার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যমান। এই প্রকাশগত অক্ষমতার জন্যই এই ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিতেন এমন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব অধিক সংখ্যায় ঘটে নাই। ইহার দ্বিতীয় উত্তর অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই সময়ে দেশে যে দুই চারজন কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের লেখা বা লিখিত গানগুলি সর্বগ্রাসী কাল, বাংলার কীট, অগ্নি, বায়ু, জল, মহামারী প্রভৃতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ইহার তৃতীয় কারণ প্রথম কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও

পৃথগভাবে উল্লেখযোগ্য। কালজয়ী প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান কবির অভাবকে উপেক্ষা করিলে এই সময়ের অবস্থার প্রতি সুবিচার করা হয় না। ভাষার প্রথম উন্মেষের যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মানুষ আপন মনোভাব গানেই প্রকাশ করিয়াছে; বাংলা-ভাষার বেলায়ও তাহা ঘটিয়াছিল। তাই আজও চণ্ডীদাস প্রাচীন বাংলার প্রথম অমর কবি। তাঁহার গান কালজয়ী হইয়া লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিতে বাজিতে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" আবিষ্কৃত হওয়ার বহুপূর্বে আমাদের কাছে আসিয়া না পৌছিলে, শুধু "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" তাঁহাকে আজও বাঁচাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এই সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারও মধ্যে এইরূপ প্রতিভাশালী কবি বাংলায় আরও জন্মগ্রহণ করিলে, নিশ্চয় তাঁহাদের সহিত কোন-না-কোন সূত্রে আজ আমাদের পরিচয় ঘটিত। তবে এই সময়কার বাংলা-সাহিত্য যে আর আবিষ্কারের প্রতীক্ষা রাখে না, সেই কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

সে যাহা হউক, যে-কথা বলা হইতেছিল তাহা এই: খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা-ভাষার যে-উন্নতি ঘটিল, তাহা বঙ্গে মুসলিম-শাসন ও ইসলাম-বিস্তৃতির আশ্রয়েই সম্ভবপর হইয়া উঠিল। বাংলা-ভাষার অসহায় শৈশব অবস্থায় বাংলার প্রাচীন মুসলমানগণ ধাত্রীরূপে ইহাকে লালন-পালন করেন নাই সত্য, তথাপি দেশের যে-জনসাধারণের হাতে ইহার লালন-পালনের ভার ছিল, তাহাদের হাতে যাহাতে দেশে এই ভাষাটি আশু বর্ধিত হইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অথবা উভয় প্রকারে তাহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। একদিকে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে সংস্কৃত-ভাষার প্রাধান্য খর্ব করিয়া এবং অন্যদিকে দেশের বাংলাভাষী স্ত্রী-পুরুষকে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও বৈবাহিক-সূত্রের সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া, তাঁহারা বাংলা-ভাষার দ্রুত পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন, উত্তরকালে সেই ক্ষেত্রই বাংলা-ভাষাকে দেশের সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে উপযুক্ত করিয়া তুলিল। এই হিসাবে বাংলার প্রাচীন মুসলমানগণই এদেশের ভাষার মুখ্য সেবক। ভারতের বহু প্রাদেশিক ভাষা আজও যেরূপ অনুন্নত, তাহার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, বাংলার প্রাচীন মুসলমানদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অথবা উভয়বিধ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে, এই ভাষার অবস্থা আজও অনুন্নত ভারতীয় ভাষার উপরে উঠিতে পারিত না।

এইরূপে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী কাটিয়া গেল ; ধীরে ধীরে বাংলা-ভাষাও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল ; সাহিত্যের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস দেখা দিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক অথবা কিয়ৎকালপরবর্তী কবিগণ ক্রমে ক্রমে হয় কালের অন্ধ-যবনিকার অন্তরালে লুকাইতে লাগিলেন, নয় আজ পর্যন্ত কোন অখ্যাত ও অবজ্ঞাত বাঙালীর গৃহ-কোণে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছেন। আজ প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের ব্যবধানে দাঁড়াইয়া জ্ঞানের দূরবীণ-যোগে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেও বুঝিতে পারিতেছি, চণ্ডীদাসের সময় হইতে বাংলা-ভাষার মোড় ফিরিয়া গিয়াছে। ইহা ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভেই সম্ভবপর হইয়াছিল। বাংলা-সাহিত্য তখনও সবে অঙ্কুরিত হইতেছে।

ঠিক এই সময়েই খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী প্রবেশ করিল, আর বাংলার সুলতানগণ ও মুস্‌লিম্ জনসাধারণ দেশের এই সাহিত্য-শিশুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই ব্যাপারের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন সুলতান জলালু-দ্-দীন্ মুহম্মদ্ শাহ্ ওরফে “যদু” (১৪১৪-১৪৩১)। ভাতুরিয়ার জমিদার বিদ্রোহী রাজা গণেশের এই “যদু” নামধেয় ছেলেটিই স্বাধীন বাংলার সর্বপ্রথম বাঙালী মুস্‌লিম্ সুলতান। নানা কারণে বাংলার ইতিহাসে তাঁহার রাজত্ব চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্য-সেবা অন্যতম। ‘স্মৃতিরত্নহার” নামক স্মৃতি-গ্রন্থ এবং “অমরকোষ”, “শিশুপাল-বধ”, “রঘুবংশ” ও “কুমারসম্ভব” নামক বহুখ্যাতনামা সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার সুপণ্ডিত বৃহস্পতিকে তাঁহার সাহিত্য-সেবা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য এই বাঙালী সুলতানটি “আচার্য”, “কবিচক্রবর্তী”, “রাজপণ্ডিত”, “রায়মুকুটমণি” প্রভৃতি সাত-সাতটি উপাধিদান করিয়াছিলেন। সুলতান সর্বশেষে তাঁহাকে “রায়মুকুটমণি” উপাধিদানকালে মহা জাঁকজমকের অনুষ্ঠান করেন: তিনি এইবার হীরা মাণিক-লাগানো একগাছি হার, কাণে ব্যবহারের উপযোগী উজ্জ্বল কুণ্ডল, দুই হাতের জন্য রতনচূড় এবং দশ আঙুলের দশটি হীরা-বসানো আংটি, দুইটি ছাতা ও অনেকগুলি ঘোড়া উপহার দিয়া এই পণ্ডিতটিকে সংবর্ধনা দান করিয়াছিলেন। জনৈক পণ্ডিতের প্রতি এইরূপ সদয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যবহার সুলতানের পক্ষে যে শুধু বিদ্যোৎসাহিতার পরিচায়ক ছিল এমন নহে, ইহা তাঁহার সাহিত্য-প্রীতিরও উজ্জ্বল নিদর্শন।

তিনি ত দূরের কথা, তাঁহার বহুপূর্ব হইতেই গৌড়ীয় সুলতানদের রাজকার্য প্রধানতঃ হিন্দু কর্মচারিগণের হাতেই ছিল। গৌড়-দরবারে হিন্দু কর্মচারীদের উঠন্ত প্রভাবের মন্দ-ফলরূপে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় বড়জোর বছর পাঁচেকের জন্য (১৪০৯-১৪১৪) রাজা গণেশ গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় গৌড়ে অক্লান্তকর্মী, স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বজাতিপরায়ণ দরবেশ শয়খ্ নূরু-দ্-দীন্ কুৎব্-ই-আলম্ (মৃঃ ১৪১৬ খ্রীঃ) জীবিত। গৌড়ের মুসলমানগণ এই জাতীয়-দুর্দিনে তাঁহার ছত্র-ছায়াতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মতৎপরতায় উত্যক্ত হইয়া রাজা গণেশ যে-কয়েক বছর রাজত্ব করেন, সেই কয়েক বছরই সুখে ও শান্তিতে রাজকার্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই। রাজার কোপানলে দরবেশ স্বীয় অর্থ, বিত্ত, পরিচারক, অনুচর, এমন কি প্রাণাধিক পুত্র শয়খ্ আনোয়ারকে পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দরবেশ-কর্তৃক আহূত জৌনপুর-রাজ ইব্রাহীম্ শাহ্ শর্কীর (১৪০১-১৪৪১) বঙ্গ অবরোধের আশঙ্কায় এবং শেষে প্রচণ্ড আক্রমণের কঠোর চাপে রাজা গণেশ বাধ্য হইয়া স্বীয় যুবক-পুত্র যদুকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হইতে দিয়া, মুসলমানদের সহিত সন্ধি করিয়া, কোন প্রকারে একটিবারের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বে কোন প্রকারে রাজ্য-রক্ষা করা ব্যতীত জাতি-গঠনমূলক অন্য কোন কাজ করিবার মত সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন কিনা বলা সুকঠিন। বাস্তবিকই, দেশের শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতিবিধানকল্পে তিনি যে একেবারেই মনোযোগ দিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী মহা দুর্যোগপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া তাকাইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এমন অবস্থায়, প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিগ্ধ (apochryphal) একখানি আত্মবিবরণীর অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা বাংলা রামায়ণ প্রণেতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে রাজা গণেশেরই আশ্রয়-প্রার্থী হইয়াছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক বুদ্ধির ও অনুমানের পক্ষিরাজ-ঘোড়ার প্রশংসা করা ব্যতীত অগত্যা আর উপায় কি ?

পক্ষান্তরে, রাজা গণেশের পুত্র জলালু-দ্-দীনের (১৪১৪—১৪৩১) বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্যপ্রীতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজ দরবারও যে একান্ত

হিন্দু-প্রভাবমুক্ত ছিল, এমন নহে। তাঁহার পিতার আমলের বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দুকর্মচারীকে স্বকার্যে বাহাল না রাখিয়া, বিশেষতঃ পূর্ববর্তী সুলতানদের নিয়োজিত রাজভক্ত হিন্দু-রাজকর্মচারীকে বাদ দিয়া, তাঁহার পক্ষে রাজদণ্ড পরিচালনা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় নাই। বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি নিশ্চয়ই ইঁহাদের একটি স্বাভাবিক অব্যক্ত প্রাণের টান বরাবরই ছিল। রাজদরবারেও ইঁহাদের প্রভাব কম ছিল, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তদুপরি, খাস বাঙালীর ছেলে সুলতান জলালুদ্-দীন্ ছিলেন ঘটনাক্রমে মুসলমান। তিনি হইলেন জন্মসূত্রে বাঙালী, ভাষায় বাঙালী, সংস্কৃতি ও জন্মগত আচার-ব্যবহারে অনেকখানি বাঙালী, বিশেষ করিয়া জীবনের প্রথম অংশ পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষাতেও বাঙালী। সুতরাং বাংলা-সাহিত্য ও বাংলা-ভাষার কবির প্রতি সুলতানের প্রাণের একটা প্রবল আকর্ষণ থাকা যেমন স্বাভাবিক, তেমনিই তাঁহার রাজদরবারে বাঙালিয়ানা ও মুসলিমত্বের ছাপ ষোলআনায় বজায় থাকাও কিছু বিচিত্র নহে। তিনি পণ্ডিত বৃহস্পতিকে যেভাবে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাঙালিয়ানাই বেশির ভাগ প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীকে প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াও, কবিকে সহজেই সুলতান জলালু-দ্-দীনের আশ্রয়প্রার্থী বলিয়া উল্লেখ করা যায়। "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাসে" যদি কবি কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ বলিয়া ধরা যায় এবং এই তারিখ যদি ১৩২০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তবে কবিকে মিছামিছি মহাদুর্যোগপূর্ণ স্বল্পস্থায়ী রাজা গণেশের রাজত্বে ঠেলিয়া না দিয়া সুলতান জলালু-দ্-দীনের রাজদরবারে উপস্থিত করিলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার উত্তর আমাদের বৈজ্ঞানিক-রীতিভক্ত পণ্ডিতগণই ভালভাবে দিতে পারিবেন। আমাদের অনুমান, সুলতান জলালু-দ্-দীনই (১৪১৪-১৪৩১) কবি কৃত্তিবাসের আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক। তখন কবির বয়স ৩০ কি ৩২ বৎসর হইয়া থাকিবে। কবি যখনকার লোক, তখন সাধারণতঃ ৩০ কি ৩২ বৎসরের পূর্বে কাহারও পাঠ সমাপ্ত হইত না; কবিও পাঠ সমাপ্ত করিয়াই রাজদরবারে পঞ্চশ্লোক পাঠাইয়া রাজানুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

কবি কৃত্তিবাস এত প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইলেও, তাঁহার কাব্যে বাংলার পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ভাষা নাই। তিনি সময়ে প্রাচীন বটে, কিন্তু ভাষায় খুবই আধুনিক। খুব সম্ভব এই সময়েই বাংলায় একজন মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়; তাঁহার নাম শাহ্ মুহম্মদ সগীর। তাঁহার যে-কাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম “ইউসুফ-জোলেখা”। কখন অথবা কাহার অনুগ্রহে তাঁহার এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি (১৩৫৯ সাল) জানা যায় নাই বটে, তবে ইহার প্রাচীনত্ব সন্দেহের অতীত। শুধু ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরে এই কাব্য রচিত হয় নাই। ইহার ভাষা চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে”র পরবর্তী এবং মালাধর বসুর “শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে”র (১৪৭৩-১৪৮১) বেশ পূর্ববর্তী। “ইউসুফ-জোলেখা”র ভাষা প্রাচীন বলিয়া ইহার কবিও যে প্রাচীন, সে বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহও পোষণ করি না। প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ উপাদানের উপরে নির্ভর করিয়াও পাণ্ডিত্যের ভঙ্গিতে কৃত্তিবাসকে প্রাচীন বলিতে যাহাদের গলায় বাধে না, শুধু তাঁহারাই কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। আমরা কিন্তু তাঁহার “ইউসুফ-জোলেখা” স্বচক্ষে দেখিয়া এবং ইহার আলোচনা করিয়া কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালেও ঠেলিতে পারিব না। তাঁহার কাব্যখানি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পৎ এবং নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাব্য।

এতদ্ব্যতীত খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট পাদত্রয়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। তাহাও আবার গৌড়ের মুসলিম সুলতানদের অনুগ্রহ ও উৎসাহে পরিপুষ্ট এবং বাংলার মুসলিম জনসাধারণের সেবায় শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। গৌড়ে সুলতান বারবক শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪) যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়া থাকিবেন। ইঁহারই রাজত্বের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দে মালাধর বসু তাঁহার “শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” রচনা আরম্ভ করেন। তখন কবি গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত “গুণরাজ খান” উপাধি তাঁহার কাব্যে গৌরবের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং সুলতান বারবক শাহ্ই কবিকে এই উপাধি দিয়া সম্মানিত এবং কাব্য-রচনায় সমুৎসাহিত করিয়া থাকিবেন।

মুসলমান সুলতানদের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতি ও পরিপোষকতা এইখানে আসিয়া থামিল না। পরবর্তী সুলতানগণ, এমন কি তাঁহাদের আমীর-ওমরাহরাও যেন উত্তরাধিকার-সূত্রে এই সুগুণের অধিকারী হইলেন। বারবক শাহের পরবর্তী সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৪-১৪৮২) মালাধর বসু দীর্ঘ আট বৎসরের সাধনায় ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচনা সমাপ্ত করেন। এই একটানা আট বৎসরের কাব্য-সাধনার পশ্চাতে গৌড়েশ্বর ইউসুফ শাহের অনুগ্রহ-ধারা বর্ষিত না হইলে সম্ভবতঃ মালাধর বসুর কাব্যখানির পরিসমাপ্তি ঘটিত না।

এই ইউসুফ শাহ্ আরও একজন বাঙালী কবিকে করুণা-ধারায় সিক্ত করিয়াছিলেন; তিনি "রসূল-বিজয়" নামক একখানা সুন্দর কাব্য-প্রণেতা শয়খ জৈনু-দ্-দীন্। জানিতে পারা যায়, ইনি সুলতানের আদেশে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া "রসূল-বিজয়" রচনা করিয়াছিলেন। সুলতানের নাম 'রাজ্যেশ্বর" উপাধি ও অবারিত করুণার কথা কাব্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, যখন কোন কোন গ্রন্থকাব শয়খ জৈনু-দ্-দীন্‌কে ঐ নামীয় কোন স্থানীয় ভূস্বামীর আশ্রিত অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া গম্ভীরভবে মত প্রকাশ করেন, তখন বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাব স্বীয় ধারণাবিরুদ্ধ কোন সত্য আবিষ্কৃত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। এহেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিব লোকের সহিত তর্ক করিয়া কোন ফয়দা নাই।

ইউসুফ শাহের প্রায় এক যুগ পরে আসিয়া আমরা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই, আলাউ-দ্-দীন হুসয়্ন্ শাহকে (১৪৯৩-১৫১৯)। এই সময়েব মধ্যে গৌড়েব আর কোন সুলতান বাংলা-সাহিত্য-রচনায় কাহাকেও উৎসাহিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে সুলতান হুসৈন্ শাহ্ যেমন ইতিহাসে অমর, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনই তাঁহার নাম চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্য-প্রীতির কথা আজ নূতন করিয়া জানাইবার প্রতীক্ষা রাখে না। তাঁহারই রাজত্বকালে যখন ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে আধুনিক বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামের বিজয়গুপ্ত তাঁহার "মনসা-মঙ্গল' এবং ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার বাদুড়িয়া গ্রামের বিপ্রদাস পিপিলাই ঐ একই নামীয় গ্রন্থ রচনা করিতে

গিয়া শ্রদ্ধাভরে বারংবার সুলতান হুসৈন্ শাহের নাম উল্লেখ করিতে দেখি, তখন সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া ইনি বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি-বিধানকল্পে যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে আর কষ্ট হয় না। যশোরাজ খান নামক শ্রীখণ্ড-নিবাসী এক পদকর্তা তাঁহার একটি পদের শেষে হুসৈন্ শাহের যে-খ্যাতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে এ-বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি সোলতানকে সাহিত্যরসে রসিক ব্যক্তি হিসাবে যে-ভাবে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :---

> "শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ, সো ইহ-রস জান।
> পঞ্চগৌড়েশ্বর, ভোগপুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান॥"

বাংলা-সাহিত্যের শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া এই শতাব্দীর (পঞ্চদশ) শেষভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ দেড়শত বৎসরের মধ্যে বাংলার মুস্‌লিম সুলতান এবং মুসলমান কবিগণ এদেশের সাহিত্য-সাধনার জন্য কি করিয়াছেন, তাহা এখন স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাধনা ব্যতীত এই সময়ে বাংলা-সাহিত্য কি অবস্থা প্রাপ্ত হইত, সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে গেলে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, এ-কথা সর্বত্র স্বীকৃত হইবে যে, এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য এদেশের মুসলমানদের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। সম্প্রতি এই ঋণের পরিমাণ লাঘব করিবার জন্য যে-সকল অপপ্রচেষ্টা চলিয়াছে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া ইহাদিগকে উল্লেখ করা যায় না। যতই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দোহাই পাড়ুক না কেন, এই প্রচেষ্টাগুলির সততা সম্বন্ধে স্বতঃই মনে সন্দেহের উদয় হয়।

এই সময়ে বাংলার মুসলমান জনসাধারণের সাহিত্য-সাধনার কথা শুনিয়া কেহ কেহ চমৎকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত অজ্ঞতাই এইরূপ মানসিক চাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। নতুবা কবি শাহ্ মহম্মদ্ সগীর ও শেখ জৈনু-দ্-দীন্‌কে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। বাংলার মুসলমানদের প্রাচীন সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে সমগ্র বাংলা হইতে সংগৃহীত হইলে, এই সময়ের আরও দুই-চারজন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বাংলা-সাহিত্যে ইঁহাদের দান নানা কারণে

উল্লেখযোগ্য। বাংলার সংস্কৃতিগত পটভূমিতে এই শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনাকে চিত্রিত করিলে, এই উক্তির সারবত্তা আরও পরিস্ফুট হইবে।

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মূলতঃ অনার্য ও আর্যজাতির মিলনে এই দুই জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগ লইয়া, "বাঙালী জাতি" বলিতে আধুনা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা গড়িয়া উঠিতে থাকে। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সার্ধ এক শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গে তুর্কী আক্রমণ ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সংঘাতে এই দুই জাতির মিলন আরও গভীর এবং এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আরও ঘনিষ্ঠ ও গাঢ় হইয়া ইতোমধ্যে এই দুই জাতির ভাষায়ও এক হইয়া পড়ে। বাঙালী জাতির পক্ষে এই সময়টি অপরাপর বিষয়ের সহিত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লইয়া একজাতিরূপে গড়িয়া উঠার সময়। এই সময়ে তুর্কীর ন্যায় আর একটি নূতন জাতি এবং ইসলামের ন্যায় আর একটি নবীন সংস্কৃতি বাংলাদেশে ঢুকিয়া পড়ায়, তাহাও গঠনোন্মুখ বাঙালী জাতির সহিত মিশিয়া গেল। সুতরাং প্রকৃত বাঙালী জাতি হইল অনার্য, আর্য ও মুস্‌লিম সংস্কৃতির ত্রিধারার ত্রিবেণী-সংগম। তাই আজ দুই-চারিটি বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ব্যতীত—তাহার বেশির ভাগের মধ্যে যে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ নাই তেমন নহে—অন্য কোন প্রকারে উক্ত জাতিত্রয়-মিশ্রিত বাঙালীকে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই ত্রিধারার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুরা ছিল দেবতার পূজারী; এই দেবতাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতি দেবতা বা দেবত্বারোপিত মানব ছিল প্রাচীন আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্যোতক, আর মনসা প্রভৃতি স্থানীয় দেবদেবী ছিল প্রাচীন অনার্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। তাই স্বাভাবিক কারণে হিন্দুদের মধ্যে এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া হয় গান, না হয় গাথা বাংলা-ভাষায় রচিত হইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি হইল।

মুসলমানেরা কিন্তু ইহা করিলেন না; ইহা তাঁহাদের সংস্কারে বাধিল। তাঁহারা লিখিলেন, "ইউসুফ-জোলেখা" অথবা "রসূল-বিজয়" জাতীয় গ্রন্থ। কোরআন-শরীফে বিবৃত সংক্ষিপ্ত গল্পের আধারে ঢালিয়া যে-ভাবে রক্ত-মাংসের সংযোগে "ইউসুফ-জোলেখা" লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে

ইহা উঁচু-দরের একখানি উপাখ্যান-কাব্যে পরিণত হইয়াছে। যদিও কাব্যখানিতে কবির নৈতিক ভিত্তির আসন টলে নাই, তথাপি রস-সৃষ্টিই কবির মুখ্য লক্ষ্য ছিল। ধর্মের সহিত সংস্রব রাখার ফলেই এইরূপ ঘটা অস্বাভাবিক নহে। আর, নিছক ধর্ম-প্রেরণাই "রসূল-বিজয়" সৃষ্টির কারণ। হজরৎ মুহম্মদের প্রতি আরোপিত কতকগুলি ধর্ম প্রচারের উপখ্যান বর্ণনাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। হজরৎ মুহম্মদের মাহাত্ম্য-কীর্তনই কবির প্রধান লক্ষ্য।

মোটকথা, এই যুগের হিন্দু-মুসলমানের বাংলা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইল ধর্ম। মূলতঃ ধর্ম লইয়া ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই যুগে সাহিত্য সৃষ্টি হইলেও, পৌত্তলিক মানসিকতার বশে অতিরিক্ত দেবভক্তি ফুটাইতে গিয়া, কি কৃত্তিবাস, কি মালাধর বসু, কি বিজয়গুপ্ত কি বিপ্রদাস কেহই যে-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যে পাঠকের জন্য রস পরিবেশন করিতে পারেন নাই, সেই ক্ষেত্রে সংস্কার-মুক্ত মুসলমান কবি তাঁহাদের পাঠকের জন্য প্রচুর সাহিত্য-রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই রসের দিক হইতে বিচার করিলে এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য যতই দরিদ্র বলিয়া মনে হউক, প্রকৃতপক্ষে "ইউসুফ-জোলেখা" ও "রসূল-বিজয়" লইয়া তাহার দারিদ্র্যের মাত্রা অনেকখানি কমিয়া যায়। বাংলার মুসলমানেরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে বাংলা-সাহিত্যের এই দারিদ্র্য সত্বর ঘুচিত না।

এই রস-পরিবেশনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইসলাম ধর্ম, মুসলমান শাসন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতেও এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য যে ইসলামী-প্রভাবে প্রভাবিত, তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের "মনসা-মঙ্গল"ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কাব্য-দুইখানি স্থানে স্থানে ইসলাম ধর্ম, মুসলিম শাসন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বহু ফারসী ও আরবী শব্দ ধারণ করিয়া ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতের সহিত এদেশীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের প্রমাণ দিতেছে।

অতঃপর খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বাংলা-সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। এই শতাব্দী নানা কারণে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তবে, তন্মধ্যে দুইটিই প্রধান: গৌড়ের সুলতান ও

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি ও সেবার প্রসার এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের উদ্ভব। এই দুইটি ঘটনাই এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনাবহুল করিয়া তুলিয়াছে।

সুলতান আলাউ-দ্-দীন্ হুসৈন্ শাহ্‌কে লইয়াই এই শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছিল। সুলতানের প্রায় পঁচিশ বৎসর (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বের মধ্যে শেষের আঠার বৎসর এই শতাব্দীতেই অতিবাহিত হয়। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা সুলতানের রাজত্বে চৈতন্যদেবের (১৪৮৫—১৫৩৩) আবির্ভাব ও বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ও প্রসার না ঘটিলে, এই সময়ের বাংলা-সাহিত্য কোন্ রূপ গ্রহণ করিত তাহা, কে বলিবে? বাংলা-সাহিত্যের প্রতি হুসৈন্ শাহ্ যে-প্রীতি পোষণ করিতেন, তাহা উত্তরকালে গৌড়ীয় সুলতান ও তাঁহাদের কর্মচারিগণের আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছিল। তৎপুত্র নাসিরু-দ্-দীন্ নসরৎ শাহ্ (১৫১৯---১৫৫২) সর্ববিষয়ে যেরূপ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বাংলার খ্যাতনামা হিন্দু ও মুসলমান কবিগণও তাঁহার উৎসাহ ও সমাদর লাভ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি নামক এক পদকর্তা তাঁহার একটি ব্রজবুলি পদে সুলতান নসরৎ শাহের প্রশংসা করিয়াছেন:

“বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ্ নাসির মধুপ ভুলে কমলা বাণী।।”

এই সময়ে শেখ কবীর নামে আর একজন মুসলমান পদকর্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনিও সেই সময়ে বাংলার একজন বিশিষ্ট পদকর্তা হিসাবে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার এক পদে তিনি সম্ভ্রমসহকারে সুলতান নাসিরু-দ্-দীন নসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; যথা:

“সেক কবিরে ভণে,
অহি গুণ পামরে জানে,
সুলতান নাসির সাহা ভুলল কমল-বনে।।”

সুলতান হুসৈন শাহ্ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সত্য বটে, রাজশক্তির

অনুকরণ ও অনুসরণ বড়ই সংক্রামক; তথাপি যাঁহারা রাজশক্তি পরিচালিত করেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক প্রবণতা এই সকল ব্যাপারে উপেক্ষার বস্তু নহে। এই হিসাবে এই দুই গৌড়ীয় সুলতানের দান বাংলা-সাহিত্য চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

পিতার দেখাদেখি নসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফীরূজ শাহ্‌ ও বঙ্গ-সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজত্বের পূর্বে, দ্বিজ শ্রীধর নামক এক কবিকে তিনি "বিদ্যাসুন্দর" নামক এক কাব্য রচনা করিতে উৎসাহ দেন। কবি শ্রীধর তাঁহার কাব্যে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক ফীরূজ শাহের নাম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন---

নৃপতি নাসির সাহা তনয় সুন্দর।
সর্বকলা-নলিনীভোগীত মধুকর।।
রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ।।
শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ।।

যৌবরাজ্য হইতেই তিনি যে-ভাবে বাংলা-সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, তিনি দীর্ঘদিন রাজ্য-শাসন করিলে বাংলা-সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হইত। তাঁহার পূর্ণ সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও, বাংলা-সাহিত্যের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি খর্ব হইয়া যায় নাই। প্রায় এক শতাব্দীর অধিককাল হইতে ধারাবাহিকভাবে গৌড়ীয় সুলতানগণ ও মুসলিম জনসাধারণের বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতিতে, বিশেষ করিয়া সুলতান হুসেন্‌ শাহ্‌ ও নসরৎশাহের বিদ্যোৎসাহিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায়, গৌড় বাংলা দেশের সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় এবং বাংলা-সাহিত্যের মূল উৎসে পর্যবসিত হয়। এই উৎস হইতে অতঃপর বাংলা-সাহিত্য-চর্চার ধারা বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

এই ধারার এক অংশ গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলিতে স্থায়ী হয়। এই রামকেলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এক বিশাল আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল।

বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত রূপ ও সনাতন এই রামকেলিরই সৃষ্টি। রামকেলির কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক আলোচনা এদেশের সাহিত্য ও শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

এই ধারার আর এক শাখা পশ্চিমবঙ্গের শ্রীখণ্ডে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই সময় শ্রীখণ্ড বাংলা-সাহিত্যের একটি উপকেন্দ্রে পরিণত হয়। এইস্থানে এইরূপ বাংলা সাহিত্য-চর্চার ফলে, যশোরাজ খান ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির ন্যায় পদকর্তার আবির্ভাব ঘটে।

নদীয়া প্রাচীনকাল হইতে সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্রস্থান ছিল বলিয়া, ইহার কথা এই প্রসঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার অস্তোন্মুখ গৌরব গৌড়ের কৃপায় এই সময়ে নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। নদীয়ার এই সাহিত্যিক পুনরুত্থানে গৌড়ের দান অপ্রতুল নহে।

বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত চাটগাঁয়েও গৌড়ের সাহিত্যিক উৎস ধারার এক শাখা গিয়া পৌঁছিল। হুসৈন্ শাহের সেনাপতি পরাগল খান তখন এই অঞ্চলের শাসনকর্তা। প্রভুর অনুসরণে লস্কর পরাগল বাংলা-ভাষায় মহাভারত রচনা করিবার জন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে নিযুক্ত করিলেন। অচিরকাল মধ্যে মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব রচিত হইল। এই পরাগলের পুত্র ছুটি খানও শ্রীকর নন্দীর সাহায্যে অশ্বমেধ-পর্বের বিস্তৃততর অনুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন। এইরূপে বাংলা-ভাষায় মহাভারত-চর্চা সর্বপ্রথমে চাটগাঁ হইতেই আরম্ভ হইল।

গৌড়ের মুসলমান সুলতান ও বাংলার মুস্‌লিম জনসাধারণের কাছ হইতে বাংলা-সাহিত্য এই সময়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করে, তাহার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে এই আলোচনা কেবল একদিক মাত্র। ইহার অন্যদিকের চিত্র আরও উজ্জ্বল এবং আরও সুন্দর। এই চিত্র বঙ্গে মুস্‌লিম সংস্কৃতি, সভ্যতা ও রাষ্ট্র-শাসন প্রভৃতির পটভূমিকায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চিত্রিত বলিয়া সহজে সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা দিতে চাহে না। তথাপি এই প্রসঙ্গে এই আলোচনার আবশ্যক।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া হইতেই তখনকার বাংলা-সাহিত্যে এক ঘোর পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের স্রোতে বাংলার প্রাচীন কাব্য-ধারা একরূপ জীবন্মৃত হইয়া পড়ে এবং বাংলায় এক নূতন সাহিত্য

অভিনব মূর্তিতে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সাহিত্য বাংলার খ্যাতনামা “বৈষ্ণব-সাহিত্য”। বঙ্গে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবের ফলে এই নূতন সাহিত্যের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল। যে-সংস্কৃতিগত পটভূমিকায় বাংলায় বৈষ্ণব মতের উদ্ভব সম্ভবপর হয়, তাহার সর্বাঙ্গে ইসলামী প্রভাব ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

এই শতাব্দী মুস্‌লিম্‌ শাসনাধীনে বাংলার স্বাধীনতার উন্নতির চরম যুগ। এই সময়ে বাংলায় ইস্‌লাম-বিস্তৃতিও একরূপ স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হয় এবং ইস্‌লামী রাষ্ট্র, শাসন, সমাজ, শিল্প ও সাহিত্য এতই সম্প্রসারিত হয় যে, এই সমুদয়কে আশ্রয় করিয়া পারিপার্শ্বিক হিন্দু-সমাজে ইস্‌লামধর্ম দারুণ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। বাংলার হিন্দু-সমাজের মেল ও পটিবন্ধনের ইতিহাসে, তাহার শিল্প ও স্থাপত্যে, তাহার আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিতে তাহার সাহিত্য ও কলায়, বিশেষ করিয়া ধর্ম ও সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শনৈঃ শনৈঃ ইস্‌লামী প্রভাব শারদ-সন্ধ্যার নীলাকাশস্থিত নক্ষত্রমালার ন্যায় একটির পর একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থায় এদেশের হিন্দু মনীষিগণের নিকট তাঁহাদের পৈতৃক ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি ইস্‌লামী (‘যাবনিক’) প্রভাবে বিপন্ন বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু জাতিকে ইস্‌লামের সর্বগ্রাসী হাত হইতে বাচাইবার উপায় স্থির করিতে গিয়া তাঁহারা বিব্রত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। যখন হিন্দুধর্মের এইরূপ গ্লানি যুগে যুগে দেখা দেয়, তখন ধর্মকে পুনরায় সংস্থাপিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে বলিয়া গীতায় একটি প্রতিশ্রুতি আছে। বাংলায় হিন্দু-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি নদীয়ার হিন্দু-মনীষিগণ এই সময়ে এই প্রতিশ্রুত ফলটির প্রতীক্ষায় উৎসুকভাবে দিন কাটাইতেছিলেন।

এমন সময়েই নদীয়ায় চৈতন্যদেবের (১৪৮৫-১৫৩৩) আবির্ভাব ঘটে। বাংলার বহু হিন্দু তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ অনুভব করিলেন। কতিপয় মুসলমানও তাঁহার চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করিলেন। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুস্‌লিম্‌ দরবেশ-জাতীয় হিন্দু-সাধক। তাঁহার দরবেশী বৈশিষ্ট্য মুসলমানকে এবং সাধক বৈশিষ্ট্য হিন্দুকে যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতে ইসলামের সার্বভৌমিক বহু মত এবং দরবেশদের নানা বিষয়ের স্পষ্ট ছাপ পরিস্ফুট।

এইরূপে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ে যে বৈষ্ণব-মত উদ্ভূত হইল, তাহাই তখন বাংলাদেশে প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুমতরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুও বাংলায় নেহাত কম ছিলেন না। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ রঘুনন্দনকে আঁকড়িয়া ধরিলেন। কিন্তু স্মার্ত রঘুনন্দন শাস্ত্রের বাঁধনে বাঁধিয়া হিন্দু-সমাজকে বাঁচাইতে পারিলেন না। প্রগতিপন্থী বৈষ্ণবদের জয় হইল। এইরূপে চৈতন্য-দেবের দ্বারাই বাংলায় ইস্‌লামের অপ্রতিহত গতি প্রতিরুদ্ধ হইল; তিনিই বাংলার হিন্দুকে মরণের হাত হইতে বাঁচাইলেন। এই বিষয়টি আমি "বঙ্গে ইসলাম বিস্তার" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এবং "বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব" নামক পুস্তকে কতকটা বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

বৈষ্ণব-মত বাংলার প্রাণে যে গভীর ছাপ আঁকিয়া দিল, তখনকার বাংলা-সাহিত্যে তাহার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমধর্মী বৈষ্ণব-"পদাবলী"-সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা চৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অনুচর ও তদ্য অনুচরদের জীবনের সম্ভব-অসম্ভব সকল ঘটনা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত যেমন সাধারণ বৈষ্ণবমত হইতে বহু বিষয়ে নূতন মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই দুই জাতীয় সাহিত্যেও বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতনরূপে দেখা দিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতে যেমন ইসলামী প্রভাব সুস্পষ্ট, তেমনি বাংলার "পদাবলী' সাহিত্যও স্বূফী "গজলিয়াৎ" (অর্থ—পদাবলী) সাহিত্যের প্রভাবে ভরপুর। বৈষ্ণব মহাজনদের চরিতাখ্যানগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, বাংলার এই জাতীয় সাহিত্যটিও শয়খ্‌ ফরীদু-দ্‌-দীন্‌ অত্তারের (১২৩০ খৃঃ মৃঃ) "তয্‌কিরতু-ল্‌-ঔলিয়া" বা "সাধক-চরিতাখ্যান" নামক পুস্তক বা ঐ জাতীয় ফার্‌সী পুস্তকের অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্র।

বাংলা-সাহিত্যের যে-সকল ঐতিহাসিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই দুই জাতীয় সাহিত্যে কোন "বৈদেশিক প্রভাব" (প্রকারান্তরে ইসলামী প্রভাব) নাই বলিয়া চোখ বুজিয়া মত প্রকাশ করেন এবং ইহাকে মুসলমান লেখকদের "আপ্ত-বাক্য" বলিয়া সম্ভব-অসম্ভব অনুমান বলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দোহাই পাড়েন, হয় তাঁহাদের দৃষ্টি অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নয় উগ্র জাতীয়তা-বাদের মিথ্যা অহমিকায় আবৃত। বাংলার বৈষ্ণবদের পদাবলীজাতীয় কবিতা

প্রাচীন বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ভাবসম্পদে পৃথক এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণার দিক দিয়া স্বতন্ত্র। প্রাচীন বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যে সাধক-জীবনীরও একান্তই অভাব। প্রাচীন "হর্ষচরিত", অর্বাচীন বলিয়া কুখ্যাত "রামচরিত" অথবা "শংকর-বিজয়" সংস্কৃত সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু তাহার আদর্শে বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানগুলি লিখিত হইয়াছিল, এমন উক্তি বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে অবৈজ্ঞানিকের ভাঁওতা মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের এই গ্রন্থগুলির সহিত ভাব বা বক্তব্য কোন বিষয়ে বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানগুলির মিল নাই। এইগুলি অন্য ঢঙে লেখা এবং অন্য ছাঁচে ঢালা। যদিও "চৈতন্যভাগবত" পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রীচৈতন্যে আরোপ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থ ভাগবত নহে, সাধকের জীবনী মাত্র। বিশেষতঃ যে যুগের বৈষ্ণব স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছে :---

"মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে।।
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে।।
মসনবী আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।।"---জয়ানন্দ

সেই যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্যে মুসলমানদের ফারসী-সাহিত্যের প্রভাবের কথা না ভাবিয়া, যিনি শত শত বৎসর পূর্বেকার বিস্মৃত হিন্দুগ্রন্থের প্রভাবের কথা চিন্তা করেন, তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম বা ভাঁওতা এই দুইয়ের যেটিই হউক, তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

এই সময়ের রক্ষণশীল হিন্দুদের সাহিত্যও নিতান্ত অল্প নহে। শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবির "ভারত-পাঁচালিতে", ভাগবতাচার্য, মাধবাচার্য, কৃষ্ণদাস, কবিশেখর প্রভৃতির "কৃষ্ণায়ন" কাব্যে, মাধবাচার্য, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির "চণ্ডীমঙ্গলে" এবং বংশীদাস প্রভৃতির "মনসা-মঙ্গলে" রক্ষণশীল হিন্দুর সংস্কৃতি দেশের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তখনকার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ইসলামী প্রভাব যেমন নগণ্য ছিল, এই দলের সাহিত্যেও ইসলামী প্রভাব তেমনই কম। তবে, মুস্‌লিম্‌-সংস্কৃতি ও ধর্মের সাধারণ প্রভাব এই সাহিত্যেও দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইস্‌লাম-

ধর্মকে আশ্রয় করি। অলক্ষিতে কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। এই সাহিত্যে যে-সকল ফারসী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে একটু নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিলেই, এই উক্তির সারবত্তা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার মুসলমানেবাও এই সময়ে নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। কবি দৌলৎ উজীর বহরাম খান (১৫৪৫-১৫৭৬) "লায়লী-মজনু" রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যের জন্য ফারসী-সাহিত্যের দ্বার পূর্বযুগ হইতে আরও একটু উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। নিছক কাব্যরস, লিপিচাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় "লায়লী-মজনু"র সমকক্ষ কাব্য খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা-সাহিত্যে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামেব "চণ্ডী-মঙ্গল"কেই সাধারণতঃ এই যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া ধরা হয়। উপর্যুক্ত গুণেব দিক হইতে বিচাব করিতে বসিলে, "চণ্ডীর" সহিত "লায়লী-মজনুর" তুলনাই চলে না।

১৫৮৮ হইতে ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে (১) পাঁচ বৎসর ধরিয়া কবি মুহম্মদ কবীর "মনোহর-মধুমালতী" নামক এক কাব্য হিন্দী হইতে বাংলায় অনুবাদ (সম্ভবতঃ ভাবানুবাদ বা গল্পাংশের অনুবাদ) করিয়া বাংলা-সাহিত্যের সহিত সর্বপ্রথমে ভারতীয় হিন্দী-সাহিত্যের যোগ সাধন করিলেন। সম্পূর্ণ উপাখ্যানমূলক এই কাব্যখানি কবিত্বপূর্ণত বটেই, এতদ্ব্যতীত হিন্দী-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানেব অধিকারী।

---

(১) মনোহর মালতীর অকুল পিরিত।
গাহিব সকল লোক মন হরষিত॥
এহি সে সোন্দর কেচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
দেশী ভাসাএ মুঞি পঞ্চালী ভণিল॥
অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু তার পাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরার পাঁচ॥
পণ্ডিত জনার খিন্না মুরুক্কের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি॥
মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব সেসে এইকুল অইকুল॥

(সন ১১০১ মঘীর বৈশাখ মাসে মোঃ আব্দুল আলী সাং পরাগলপুর, অনুলিখিত পুঁথির পাণ্ডুলিপি হইতে)

সাবিরিদ খান নামক আর এক পণ্ডিত কবি তাঁহার “রসুল-বিজয়ে’, সৈয়দ সুলতান (১৫৮০) নামক সাধক-কবি তাঁহার “নবী-বংশ”, “শবে মেরাজ” ও “ওফাৎ-রসুলে” পূর্বযুগের ‘রসুলায়ন’-কাব্যধারা যে শুধু বজায় রাখিলেন তাহা নহে, ইহাকে এই শ্রেণীর কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে উন্নীত করিলেন। এই সাবিরিদ খানের ‘হানিফা ও কয়রা পরী” এবং বররুচির বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূলসংস্কৃতসহ বাংলা অনুবাদ বাংলা-ভাষায় উপকথ ও অনুবাদ সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পৎ। সংস্কৃতমূলক ভাষার পাণ্ডিত্যে সাবিরিদ খানের সমকক্ষ কবি পরবর্তী যুগের আলাওল ও ভারতচন্দ্র ব্যতীত প্রাচীন বাংলায় আর একজনও জন্মেন নাই।

এই সময়ে মুহম্মদ অকীল “মুসানামা” এবং কমর আলী “সবসালের নীতি” (১৫৭৯) রচনা করিয়া শাস্ত্রীয় ইসলামের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগ আরও একটু ঘনিষ্ঠ, আরও একটু নিবিড় করিয়া দিলেন। সাহিত্যে যদি ধর্মের স্থান থাকে, তবে ইঁহাদের সাহিত্যসাধনাও ব্যর্থ হয় নাই।

শেখ ফয়জুল্লা বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার “গোরক্ষ-বিজয়” রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত তিনি “গাজী-বিজয়” ও “সত্যপীর” নামে আরও দুইখানি পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। “গাজী-বিজয়” উত্তর বঙ্গের কাঁটা-দুয়ারের পীর ইস্মাইল গাজীর কথা লিখিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব তিনি উত্তর বঙ্গের লোক। তিনি ১৪৬৭ শাকে অর্থাৎ ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে “সত্যপীর” রচনা করেন (২)। তাঁহার পুস্তক লৌকিক প্রবাদ ও বিশ্বাসের সহিত এদেশের মুসলমান ও হিন্দুর ঘনিষ্ঠ যোগ রচনা করিয়াছিলেন।

---

(২) “গোখবিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা সুনিলাম যত ॥
খোঁটাদূরের পীর ইছমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হৈল রাজি ॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব্ব কথন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন ॥
ধন বাড়ে ষুনিলে পাতক খণ্ডন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন ॥”
(পূর্ব পুঁথির সহিত সংশ্লিষ্ট পুঁথিতে লিখিত)

বাংলা-সাহিত্যের এই যুগ প্রধানতঃ গীতিকাব্য রচনার যুগ। বৈষ্ণব কবিদের "পদাবলী" সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। বাংলার মুসলমান এই যুগ-ধর্মকে অস্বীকার করেন নাই। সম্ভবতঃ শেখ কবীরই (১৫১৯—১৫৩২) মুসলিম পদাবলী সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি। তাঁহার বহু পদ আবিষ্কৃত না হইলেও, যে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বহু মুসলমান পদকর্তা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শ'-খানিক পদকর্তার সন্ধান আমরা লাভ করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে কোন্ শতাব্দীর লোক, তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই শ'-খানিক পদকর্তা হইতে প্রায় দশ-বারজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। ইঁহাদের কয়েকজন পদকর্তার পদ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ পুস্তকেও স্থান পাইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই মুসলমান পদকর্তৃগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক ধারণার ফল। কেননা ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রীয় ইসলাম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি রচনা করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, তাঁহারা চিন্তায় মুসলমানই ছিলেন,—বৈষ্ণব নহে। বাংলার বৈষ্ণবদের হাতে সূফীদের প্রেমময় ভগবান প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণে জমাট বাঁধিয়াছিলেন; রাধিকা ছিলেন, ভগবানের প্রতি মানব-প্রেমের প্রতীক,—যেমন "সাকী" ছিল সূফীদের প্রেমের প্রতীক। মুসলিম-সাহিত্যের সহিত বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই মূলগত ভাব-সামঞ্জস্য থাকায়, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ নামের পার্থক্যকে বড় করিয়া না দেখিয়া ভাবের সামঞ্জস্যকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণে বাংলা-সাহিত্যের এক নূতন প্রকাশ-ভঙ্গীরূপে যুগধর্ম হিসাবে বৈষ্ণবীয় ভঙ্গীতে পদাবলী রচনা করিতে মুসলমানদের সংস্কারে বাধে নাই।

পদাবলী রচকরূপে কবি সৈয়দ সুলতান সাধারণ পদাবলী-রচক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার বহু গীতিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গীতিকাগুলি বাউলজাতীয় সংগীত। ভাবের প্রাধান্যে ও মর্মবাদিতার স্পষ্ট ছোঁয়াছে এই সংগীতগুলি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবসমন্বয় ঘটে। এই সময়ে ভারতের সর্বত্রই এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কারণেই কবীর, নানক, দাদু ও চৈতন্যের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল। এতদিন হিন্দু-মুসলমান শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে পরস্পর সম্মুখীন হইতেছিল। এখন তাহার মিলন ঘটিল। বাংলাদেশেও যে তাহাই হইয়াছিল, বাংলা-সাহিত্যই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। বৈষ্ণবদের “পদাবলী”-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া একদল মুসলমান বাংলার প্রগতিপন্থী হিন্দুদের সহিত ভাব-বিনিময়ের পূর্ণতাসাধন করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিতও বাংলার মুসলমানদের ভাবসমন্বয় ঘটিল। বাংলার কোন-কোন মুসলমান হিন্দুর প্রাচীন যোগ-শাস্ত্রের “ষট্‌চক্র” “প্রাণায়াম”, “ধ্যান-ধারণা” ও “আসন” প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় সুফীদের “লতীফা”, “হাস্‌ব-ই-দম্”, “জিক্‌র” ও “মুরাকিবা” প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার মিল খুঁজিয়া পাইলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, মুসলমানদের মধ্যে “যোগ-কালন্দর” নামক একপ্রকারের সুফী-সাধনভাবাপন্ন যৌগিক সাহিত্যের উদ্ভব হইল। হাজী মুহম্মদের “নূর-জমাল”, শেখ চাঁদের “শাহদোলা”, এবং সৈয়দ সুলতানের “জ্ঞান-চৌতিশাই” এই জাতীয় মুসলিম সাহিত্য। শেখ চাঁদের “রসুল-বিজয়”ও একখানি সুন্দর কাব্য। বাঙালী মুসলমানদের এই “যোগ-কালন্দর” সাহিত্য বাংলার সংস্কৃতির এক নূতন দিক উদঘাটিত করিয়া দিতেছে।

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া হিন্দু-সমাজের বাংলা-সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বড় দেখা যায় না। হিন্দুর সৃজনীশক্তি যেন এই শতাব্দী হইতেই ফুরাইয়া গেল। এই সময়ে “ভারত-পাচালি”র লেখক কাশীরাম দাস (১৬০৫) ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ খ্যাতনামা কবির উল্লেখ করা যায় না। এই কাশীরামের “মহাভারত” খানিও হিন্দুর ধর্ম-জীবনের জন্য যতটুকু সমাদর লাভ করিয়াছে, কাব্য হিসাবে রস-সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহাকে তাহার সিকি মূল্যও দেওয়া যায় না, তবে, বাংলা-সাহিত্য এই সময়ে শাখা-পল্লবে বহুবিস্তৃত হয়।---বহু বৈষ্ণব সাধুর জীবন-চরিত লিখিত হয়; বৈষ্ণব গ্রন্থাদির অনুবাদও নিতান্ত কম হয় নাই; পদাবলীর রচনা এবং প্রসারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বৈষ্ণব আওতার বাহিরের হিন্দুদের মধ্যে কৃষ্ণায়ন, রামায়ণ, ভারত-পাঁচালি, মনসা-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতির

বহুল প্রচার ও লেখা চলিতে লাগিল; শিব, কালী, দুর্গা বা চণ্ডী প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুঁথিও রচিত এবং পঠিত হইতে শুরু করিল। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ উঁচুদরের নহে।

এই যুগে উল্লেখযোগ্য বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, বাংলার মুসলমানগণ। দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ও আলাওল প্রভৃতি মুসলমান কবি আরাকান-রাজসভার আশ্রয়ে এই সময়ে যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহা বাংলা-সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। দৌলৎ কাজীর "সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী" এবং আলাওলের "পদ্মাবতী" হিন্দী হইতে অনূদিত বাংলা-কাব্য হইলেও, কাব্য দুইখানির সমকক্ষ পুঁথি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বিরল। ইঁহারা দুইজনেই বাংলার বাহিরে বসিয়া বাংলা-সাহিত্যের সেবায় মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বাঙালীকে হিন্দী-সাহিত্যের রস পরিবেশনে মাতোয়ারা করিয়াও তুলিয়াছিলেন। আলাওলের অপর গ্রন্থগুলি ফারসী সাহিত্যেরই অনুবাদ। তথাপি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিমেয় রসবোধ তাঁহার বাংলা-কাব্যগুলিকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, সুললিত ও সুমধুর ফারসী সাহিত্যের ভাব-সম্পৎ ও ঝঙ্কার যেন বাঙালীর আপন সম্পদরূপে তাহার হাতে আসিয়া নূতন করিয়া ধরা দিয়াছে। কোরেশী মাগন ঠাকুরের "চন্দ্রাবতী" সম্পূর্ণই উপকথাজাতীয় সাহিত্য। দেশের রূপকথাকে কাব্যের আসরে উন্নীত করিবার জন্য বোধহয় এই-ই প্রথম প্রয়াস। এই প্রয়াস মাগনের প্রতিভায় ব্যর্থ হয় নাই। সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের "জেবুল্-মুলক্-শামারোখ" (১৬৭৩) নামক কাব্যখানিও একটি সুন্দর উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ। সৈয়দ মুহম্মদ আকবর এই যুগের মামুলী পর্যায়ভুক্ত কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন।

এই সময়ে বাংলায় মুঘল শাসন চলিতেছিল। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে শাহ্‌জাহান ও ঔরঙ্গজীব ব্যতীত প্রায় অপর সকলই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মুঘল পর্যন্ত বেশির ভাগ মুঘল-মুসলমান শিয়া-সম্প্রদয়ভুক্ত ছিলেন। বাংলার মুঘল-শাসনকর্তাদের মধ্যও অধিকাংশই ছিলেন শিয়া। এই কারণে আজও মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া এই জেলার বহু মুসলমান

শিয়া। শিয়া-মতাবলম্বী মুঘল রাজপুরুষ ও জনসাধারণের আমদানীতে বাংলার সুন্নী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের মধ্যেও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিয়া-প্রভাব বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। "মহরম"ই শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ পর্ব। মহরমের হৃদয়-বিদারক কারবালার ঘটনা কাহারও অবিদিত নাই। এই সময়ে বাংলায় মহাসমারোহে "মহরম" পর্বের অনুষ্ঠান হইতে থাকে এবং সুন্নীদের মধ্যেও নূতন করিয়া কারবালার কাহিনী আলোচিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যে মুসলমান সমাজের এই অনুষ্ঠানের ছাপ পড়িল। বাংলার কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন সাহিত্যের উদ্ভব ঘটিল; এই সাহিত্যকে "মহরমী-সাহিত্য" বা "মর্‌সিয়া-সাহিত্য" বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। ইংরেজীর Elegy নামক গাথাগুলি যে করুণ-রসের উৎসধারা হইতে উৎসারিত, ফারসী "মর্‌সিয়া" বা শোকগীতিকাগুলিও সেই একই উৎস হইতে ক্ষরিত হইয়াছে। আর বাংলার "জারী"-গান এবং "মহরমী-সাহিত্য"ও সেই একই উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে। "মর্‌সিয়া" বা "শোক-সাহিত্য" বাংলা-সাহিত্যে এই প্রথম। মুসলমান কবিদের পূর্বে কেহই বাংলা-সাহিত্যে জাতীয় শোকগীতি রচনা করিয়া কাব্য লেখেন নাই। কেহ কেহ বৈষ্ণবদের "মাথুর" শ্রেণীর পদকে বাংলার প্রাচীনতম শোক-সংগীত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। এই মত প্রকাশের পূর্বে মনে রাখিতে হইবে, "মাথুর" শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরাগমনে বৃন্দাবনবাসীর বিরহ-সংগীত, আর "মর্‌সিয়া" স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম-প্রেমে উদ্বুদ্ধ শহীদের জন্য জাতীয় শোকগাথা।

এই "মহরমী" বা "মর্‌সিয়া" সাহিত্যে সর্বপ্রথমে নাম করিতে হয় মুহম্মদ খানের "মকতুল হুসেন" বা "হুসেন-বধ" কাব্যের। এই কাব্যখানি ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়। শুধু এই শ্রেণীর কাব্যে নহে, এই যুগের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে এই কাব্যখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। কবি আবদুল আলিমের "হানিফার লড়াই", নসরুল্লা খানের "জঙ্গনামা" (১৬০৭ এর কাছাকাছি) এবং মুহম্মদ এয়াকুবের "জঙ্গনামা" (১৬৯৪) বাংলার "মর্‌সিয়া-সাহিত্যে"র নিদর্শন। বিষয়বস্তুর কারুণ্যে, বর্ণনার চাতুর্যে এবং ভাষার মাধুর্যে ও অবিকৃতিতে এই "মহরমী কাব্য"গুলির মধ্যে মুহম্মদ খানের "মকতুল-হুসেন" একান্তই অতুলনীয় এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপভোগ্য।

এই সময়ের আর একজন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি আবদুল নবী। তাঁহার "আমীর-হাম্জা" কাব্য ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহা ফারসী "দাস্তান-ই-আমীর হামজা" নামক কাব্যের গল্প লইয়া রচিত। ইহাকে অনায়াসে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সহিত তুলনা করা যায়। কবি হিসাবেও আবদুল নবী কাশীরাম দাস হইতে নিকৃষ্ট ত নহেনই, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও এই শতাব্দীতে মুসলমান কবির দান নিতান্তই নগণ্য নহে। তাঁহারা পদাবলী, বাউল বা বৈরাগ্য সংগীত, ইসলামী সংগীত ইত্যাদি বহু গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুসলমান গীতিকবিদের মধ্যে "ব্রজবুলি"--ভাষারও বহুল প্রচলন হয়। সম্ভবতঃ সৈয়দ মর্তুজাই (১৫৯০-১৬৭০?) এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুস্লিম্ পদকর্তা। পদকর্তা হিসাবে মহাকবি আলাওলের স্থানও খুব উচ্চে।

এই শতাব্দীর পূর্ব-শতাব্দীতেই পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বোধ হয় শেখ ফয়জুল্লাই এই বিষয়ের পথ-প্রদর্শক। এই শতাব্দীতে "সত্যপীর" বেশ লোক-প্রিয় হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই পীরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বহু হিন্দু-মুসলমান কবি "সত্যপীর" নামক কাব্য রচনা করিতে থাকেন। এই সময়ে 'সত্যপীর" ব্যতীত আরও বহু পীর তাঁহাদের ভক্তদের কাছ হইতে প্রশস্তি লাভ করেন। প্রধানত পীরভক্তি বৃদ্ধির ফলে, এই সময়ের প্রায় কবিই তাঁহাদের কাব্যের প্রারম্ভে কোন-না-কোন পীর-প্রশস্তি সংযোজিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় ইসলামের বিধান-সম্বলিত গ্রন্থরচনার বাহুল্যও এই শতাব্দীর মুস্লিম্ সাহিত্য-সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল গ্রন্থ বাংলার লোককে ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধানের সহিত যে বহু পরিচিত করিয়া দিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আলাওলের "তোহফা", শেরবাজের "ফক্কর-নামা", মুহম্মদ খানের "কেয়ামৎ-নামা" (১৬৪৬), শেখ সাদীর (বাঙালী) "গদামল্লিকার পুঁথি", শেরবাজের গুরু শাহ বদীউ-দ্-দীনের "সিফৎ-ই-ঈমান", "ফাতিমার সুরৎ-নামা" ও "নমাজের কিতাব", মুহম্মদ আশরফের "কিফায়িতু-ল্-মুস্লিমীন্" ও "মহরমের মাহাত্ম্য", মুহম্মদ ফসীহ-এর "ত্রিশ হরফের মুনাজাৎ" (১৬৯৫) প্রভৃতি এই সময়ের উপাদেয় মুসলিম শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

পূর্ব শতাব্দীর "যোগ-কালন্দর"-জাতীয় সাহিত্য এই শতাব্দীতে আসিয়া আরও বাড়িয়া যায়। খ্যাতনামা পদকর্তা সৈয়দ মরতুজার (১৫৯০-১৬৭০?) "যোগ-কালন্দর", মুহম্মদ শফীর "নূর-কন্দিল" ও "নূর-নামা" এবং শেখ পরাণের "নূর-নামা" এই সময়ের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাব-সমন্বয় জ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ পুঁথি। এই গ্রন্থগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই বটে, কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি-ধারা বুঝিবার পক্ষে ইহাদের চেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ আর লিখিত হয় নাই।

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অবনতির যুগ। তবে এই অবনতি এই শতাব্দীর শেষ ভাগেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময়ে নূতন সৃষ্টি কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ধারার বহুল প্রচার ও প্রসার হয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) এবং রামপ্রসাদ সেনই (১৭২৩-১৭৭৫) এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি।

বাংলা-সাহিত্যের এই সাধারণ অবনতির হাত হইতে বাংলার মুস্‌লিম্ সাহিত্যও অব্যাহতি পায় নাই সত্য, তাই বলিয়া পলাশী-যুদ্ধের (১৭৫৭) পরবর্তী আরও প্রায় পনের-বিশ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যেই সবল বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। ইহার কোন কোন কবির কাব্য সাহিত্য-হিসাবে ভারত-চন্দ্রের কাব্য, অথবা গান হিসাবে রামপ্রসাদের গান হইতে নিকৃষ্ট নহে, সে কথা জোর করিয়া বলা যায়। এই সময়কার মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত বাংলা-সাহিত্যের কোন অংশ না দেখিয়া, অথবা বটতলা হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি তথাকথিত "মুসলমানী পুথি" দেখিয়া যাঁহারা বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করেন যে, "মুসলমান কবিরা ধর্মমূলক বা আরবী-ফারসী-হিন্দী উপাখ্যানমূলক অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে সেগুলি একান্ত মূল্যহীন," তাহারা বাংলার মুস্‌লিম্ সাহিত্য সম্বন্ধে হয় একান্তই অজ্ঞ, নয় একেবারে উদাসীন, নয় সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে নিতান্তই অক্ষম। এই কারণে তাঁহারা সত্যই ক্ষমার পাত্র।

এই সময়ের মুস্‌লিম্ বাংলা-সাহিত্যের শুধু কাব্য-শাখাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই উপর্যুক্ত মন্তব্যের কোন কাণা-কড়ির মূল্যও নাই। এই সময়ে বাংলার মুসলমান যে-সকল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে

মুহম্মদ রাজার (১৬৯১-১৭৬৭) "তমিম-গোলাল" এবং "মিসরী-জমাল"; মুহম্মদ চুহরের "আজর শাহ সমন-রোখ"; মুহম্মদ নকীর "তূতী-নামা"; সৈয়দ নসীরের "বেনজীর বদ্‌র-ই-মুনীর"; মুহম্মদ জীবনের "বাহরাম গোর" (১৭৬০); সলীমু-দ্‌দীনের "তূতী-ময়না"; করীমুল্লার "যামিনীভান" মুকীমের "গুল্‌-ই-বকাওলী", "ফয়দু-ল্‌-মুক্‌তদী" (১৭৯১), "কালাকাম" এবং "মৃগবতী"; মুহম্মদ রফীউ-দ্‌-দীনের "জেবল-মুল্‌ক-শামারোখ"; হায়াৎ মাহমুদের "জঙ্গনামা" (১৭২৩) এবং "আম্বিয়-বাণী" (১৭৫৭); সৈয়দ হামজার "আমীর-হামজা" (১৭৯৩), "হাতিম-তাই" (১৮০৩), "জৈগুনের পুঁথি" (১৮৯৭) এবং "মনোহর-মধুমালতী" (১৮০৬); গরীবুল্লার "আমীর-হামজা" (১৭৯৪) এবং "মধুমালতী" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই কাব্যগুলির প্রায় সব কয়টিই হয় ঐ নামের খ্যাতনামা ফারসী বা উর্দু কাব্য নতুবা ঐ নামের শ্রেষ্ঠ হিন্দী কাব্যের গল্পাংশ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলা কাব্যগুলি বাংলা-ভাষার বৈশিষ্ট্যবর্জিত ত নহেই, বরং রস ও সৌন্দর্য স্বষ্টির প্রেরণা ও ক্ষমতায় এই সময়ের যে-কোন বাংলা মৌলিক কাব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট নহে বরং উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ "যামিনীভান" "কালাকাম" ও "মৃগবতী" মৌলিক কাব্য। মুসলমানদের এই সকল কাব্যে যাঁহারা রসের সন্ধান না পাইয়া "কাব্যহিসাবে এইগুলি একান্ত মূল্যহীন" বলিয়া নির্বিচারে রায় দেন তাঁহারা সত্যই বেরসিক।

এই শতাব্দীর গীতিসাহিত্যে বহু মুসলমান কবি পদাবলী, ইসলামী সংগীত, বৈরাগ্য ও বাউল সংগীত, মারফতী ও মুর্সিদা সংগীত ইত্যাদি দান করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। এই সমস্ত সংগীত রচনা-গৌরব ও ভাব-সম্পদে এতই পুষ্ট যে, সাহিত্যের যে-কোন সমালোচক ইহাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে বাধ্য। প্রধানত এই কারণেই কোন সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে "এই শতাব্দীতে দুই একটি উৎকৃষ্ট মুসলমান পদকর্তা পাইতেছি।"

মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্যে ইতিহাস রচনাই এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের একটি বিশিষ্ট দান। সাধক-জীবনের আখ্যায়িকা ব্যতীত বাংলা-সাহিত্যে ইতঃপূর্বে আর ইতিহাস রচিত হয় নাই। বাংলার এই ঐতিহাসিক মুসলিম কবিদের মধ্যে "তওয়ারীখ্-ই-

উসমানী'' (১৭১৮) প্রণেতা উজীর আলী ''সিফৎ নামা'' প্রণেতা নূরুল্লা, ''সিফৎ নামা'' (১৭৯৭) প্রণেতা আজমতুল্লাহ ''শমশের গাজী'' প্রণেতা শয়খ মুনব্বর ''ইসাপুরের ইতিহাস'' প্রণেতা এতীম কাসিম, ''কুকীকাটার পুঁথি'' প্রণেতা গোলবখ্শ প্রভৃতির নাম করা যায়।

বাংলা-ভাষায় সংগীত শাস্ত্রের রচনাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানদের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি ও তালমানের বিবরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট গীত চয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সর্বপ্রথমে দানিশ কাজী ও ফাজিল নাসিরের ''রাগমালা''-র (১৭৩২) নাম করিতে হয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরেই চম্পা গাজী ও মুহম্মদ পরাণ ''রাগমালা'' রচনা করিয়াছিলেন। আলী রাজার (১৭২০-১৮০০) ''ধ্যানমালা''-ও নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এই সময়ে কয়েকজন মুসলমান কবি জ্যোতিষ সম্বন্ধেও পুঁথি লেখেন। এই পুথিগুলি কুসংস্কারপূর্ণ লৌকিক বিশ্বাসের অভিব্যক্তিরূপে বাংলা-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। হুসৈন ফকীরের ''রাশি-গণনার পুঁথি'', মুজাম্মিলের ''সাযাৎ-নামা'' (১৭৫৮) ও 'খঞ্জন-বচন'' এবং আবদুল গনীর 'ফালনামা'' এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিতে শুভাশুভ নির্ণয়, রাশিচক্র ও তাহার ফলাফল, মৃত্যুর লক্ষণ, প্রাকৃতিক ঘটনার সংঘটনে উন্নতি-অবনতির ইঙ্গিত প্রভৃতি বহু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায়।

''যোগ-কালন্দর''-জাতীয় সাহিত্যের পূর্ণ পরিণতি ঘটে এই শতাব্দীর মুসলমান কবিদের হাতে। নয়ানচাঁদ ফকীরের ''বালকা-নামা'', বালক ফকীরের ''বুরহানু-লু-আরিফীন'' মুহম্মদ নসিক্যার ''দরবেশী পুথি'' এবং আলী রাজার 'সিরাজ-কুলুপ'' ''জ্ঞান-সাগর'' ও ''আগম,'' প্রভৃতির পর আর এই জাতীয় সাহিত্য বাংলায় রচিত হয় নাই। এই পুঁথিগুলির রচনায় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত না হউক, অন্ততঃ বাংলার সংস্কৃতিতে খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানদের দান কতটুকু তাহার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

অসংখ্য পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্যও এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান কবি এই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে বেশ বড় অংশ গ্রহণ

করেন। তবে, বাংলার মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই এই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে অধিক অংশ গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। "সত্যনারায়ণ" বা "সত্যপীর" জাতীয় পুঁথির বাহুল্যই তাহার প্রমাণ। "বড়খাঁ গাজী" "কালুগাজী". "ত্রৈলক্ষ্য-পীর", "মোচড়া-পীর" প্রভৃতিও এই শতাব্দীতে বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়।

বলা বাহুল্য, এই শতাব্দীর ঠিক মাঝখানেই (১৭৫৭) পলাশীর ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির, বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। এই সময়ে রাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য অবধি সমাজের সর্বস্তরে যে অবসাদ ও গ্লানির ছায়া পড়িয়া যায়, তাহা এই শতাব্দীর সাহিত্যেও সুপরিস্ফুট। এই শতাব্দীর হিন্দু ও মুসলমান কাহারও সাহিত্য এই জাতীয় অবসাদের হাত হইতে মুক্তি পায় নাই বটে, তথাপি মেরুদণ্ড-ভাঙা বাংলার মুসলমান সমাজ এই সময়ে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা জাতীয় প্রবঞ্চনা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই সময়ের মুসলিম সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকখানি পৃথক হইয়া গিয়াছে। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবঙ্গে সাহিত্যের ভাষা এক ছিল। এই ভাষা হিন্দুবঙ্গের ভাষা হইতে কোন অংশে তফাৎ ছিল না। ইহাকে অনায়াসে "সাধু-ভাষা" বা "অবিকৃত বাংলা-ভাষা" বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই ভাষা তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশী শব্দের সংমিশ্রণে লিখিত হইত। অল্প-স্বল্প বিদেশী শব্দও (প্রধানতঃ ফারসী ও তৎসূত্রে আরবী) ভাষার প্রকৃতির সহিত তাল রাখিয়া ধীরে ধীরে বাংলার সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। এই বিদেশী শব্দগুলি ছিল নূতন ভাব, বস্তু ও বিষয়ের প্রকাশের পক্ষে আবশ্যক শব্দ। ইহারা বাংলা-ভাষার বন্ধু ও সহায়রূপে ভাষায় স্থানলাভ করিয়া এই ভাষার সহিত মিশিয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান কবি আবশ্যকমত এইসমস্ত শব্দ সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জন্যই, এই শব্দগুলির আমদানীতে বাংলা-ভাষার সচল ও স্বচ্ছন্দ গতি এবং স্বাভাবিক স্ফুরণ-প্রকৃতি ব্যাহত না হইয়া, ধীরে ধীরে সবল, সচল ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

বাংলা-ভাষার এই ব্যবস্থা খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে আসিয়া, হঠাৎ মুসলমানদের হাতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ কবি মুহম্মদ এয়াকুবই তাঁহার "জঙ্গনামা (১৬৯৪) রচনা করিয়া বাংলা-ভাষায় সর্বপ্রথম এই পরিবর্তন আনয়ন করিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক।

দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক প্রকারের বাংলা-ভাষা সাহিত্যে চালু করিয়াছেন। "মুসলমানী বাংলা" নামে পরিচিত এবং বটতলা হইতে প্রকাশিত বাংলা-পুথির ভাষায় এই নূতন বাংলা-ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলে। পশ্চিম-বঙ্গের এই মিশ্রিত বাংলাকে "হিন্দুস্থানী বাংলা" বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। ইহার একটু নমুনা এইরূপ:

"মদনী জাহের যার আছে জাহানেতে।
তাঞ্জার নাগাত কেচ্ছা আছে কেতাবেতে॥

আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥

আছিল রওশন দেল শায়েরী জবান।
যাহারে মদদ গাজী শাহা বড়ে খান॥

শায়েরী করিলেন পুঁথি আমীর হামজার।
না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার॥

যতদূর আছে তার কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক হয় জার জার॥

কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরি কেচ্ছার তরে করে বড়া গম॥"

(হামজার "আমীর-হামজা")

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা তখন, কি এখন, কোন সময়েই ঘরে কি বাহিরে এমন বাংলা-ভাষার ব্যবহার করিতেন বা করেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তথাপি তাঁহারা সাহিত্যে এই ভাষা চালাইয়াছেন। ইহার কারণ কি?

পশ্চিম-বঙ্গীয় কবিদের পক্ষে সাহিত্যে এই ভাষার প্রয়োগ একটি linguistic via media বা "ভাষাগত মধ্যপথ" গ্রহণের প্রয়াস বলিয়া মনে

হইতেছে। মুঘল শাসন-কালে বাংলা-সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতার কথা জানা যায় না। মুঘলেরা বাংলা-সাহিত্যকে আমল দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা ছিলেন ফারসী বা উর্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানীর ভক্ত; মুসলমান হিসাবে আরবীতেও তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। ফারসী বা উর্দু ব্যতীত তাঁহারা আর কোন ভাষাকে পছন্দ করেন নাই বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক, সাধু বাংলা-ভাষা তাঁহারা হয়ত বুঝিতেন না বা বুঝিলেও পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের এই মানসিক ভাব পশ্চিম-বঙ্গের লোকেদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই অধিকভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলা-ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া এই সময়ের পশ্চিম বঙ্গীয় কবিগণ বাংলায় আরবী, ফারসী, উর্দু বা হিন্দী শব্দের অধিক ব্যবহার করিয়া একটি মধ্যপথ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) একটি উক্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,---

"মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি কথা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য-রস লয়ে ॥"

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা যখন 'হিন্দুস্থানী-বাংলা'য় গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবিগণ তখনও "সাধু-ভাষা"-য় পুঁথি লিখিতেছিলেন। এই কবিদের কাব্যই এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম্ কাব্য। মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বের পূর্ববঙ্গীয় শ্রীওয়ারিস কাজী নামক কোন পুথি-নকলকারকের ভাষার সামান্য অংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"পুস্তক লিখিনু মুই প্রভু প্রণামিয়া।
গুরুর পদের রেণু শিরেতে লইয়া ॥
গুণী সকলের পদে মাগি পরিহার।
বিভঙ্গ হইলে পদ বান্ধিয়া দিবার ॥"

শুধু এইরূপ নহে, ইহার চেয়েও বহু অংশে শ্রেষ্ঠ বাংলা-ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ মুসলিম কাব্য রচিত। এই কাব্যের খুব কম অংশই বটতলার ছায়া মাড়াইয়াছে। বটতলায়-ছাপা কতকগুলি সে-দিনের পুঁথি দেখিয়া যাঁহারা মুসলমানদের বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে নিতান্তই নীচ ধারণা পোষণ করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মুস্‌লিম সাহিত্যের কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই বলিয়া প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া পূর্ববঙ্গীয় হাতের লেখা পুথিগুলির আলোচনা করেন। তাঁহাদের যদি সে-আলোচনার অবসর অথবা প্রবৃত্তি না থাকে, তবে তাঁহারা এই বিষয়ে নীরব থাকিলেই ভাল হয়।

আমাদের মধ্যে এমন একদল সাম্প্রদায়িক সমালোচক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের "হিন্দুস্থানী-বাংলা"ই বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় ভাষা। বটতলার সাহিত্যই যে তাঁহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, পলাশীতে বাংলার মুসলমানদেব ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিলে, বাংলা-ভাষা এতদিনে এইরূপ হইয়া যাইত *। ইংরেজীতে যাহাকে wishful thinking বা "আত্মবাসনা চরিতার্থক-চিন্তা" বলে, তাহা ছাড়া, এই অভিমতকে আর কিছুই বলা যায় না। যাহা হইয়া যায় নাই, তাহা কি হইত বা না হইত, তৎসম্বন্ধে নিজের সুবিধামত অনুমান করিয়া লইয়া মত প্রকাশ করাব পশ্চাতে ব্যর্থ-মানসিকতারই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

---

* লেখক 'হিন্দুস্থানী বাঙ্গলা' নামে অভিহিত করিয়া যে-বাঙ্গলা-ভাষার নিন্দা করিয়াছেন, আমরা তাকে নিন্দাযোগ্য মনে করি না। উহাই বাঙ্গলার—অন্ততঃ মোছলেম বাঙ্গলার স্বাভাবিক ভাষা। তথাকথিত 'সাধুভাষা' হিন্দু-বাঙ্গলার ভাষা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মোছলেম বাঙ্গলার ভাষা নিশ্চই নয়। বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত সাধুভাষা' বাঙ্গলাভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন বাধাগ্রস্ত করিয়া ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে। মোছলেম বাঙ্গলার সাহিত্যিক ভাষা তথাকথিত 'হিন্দুস্থানী বাঙ্গলা'র অবিকল অনুসরণ না করিতে পারে, কিন্তু তারই বিবর্তিত ধারা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে। নতুবা মোছলেম বাঙ্গালার মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইবে না।

—সম্পাদক, মাসিক মোহাম্মদী।"

মোটের উপর এই "হিন্দুস্থানী-বাংলা" তখনও যেমন অচল ছিল, আজও তেমন অচল। ইহার উৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগের সহিত বাংলা-ভাষায় "ব্রজবুলি"র উৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগের তুলনা করা চলে। "ব্রজবুলি" যেমন ব্রজধাম অথবা বাংলাদেশের ভাষা নহে, বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত কতকগুলি বিশিষ্ট কবির কাব্যের ভাষা, পশ্চিম বঙ্গের "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-ও তেমন সমগ্র মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের বাংলা-ভাষা নহে, কতিপয় পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলিম কবির কাব্যের ভাষা। "কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই" অথবা "ন ঘর্‌কা ন ঘাট্‌কা" ইত্যাকার প্রবাদের সাহায্যে যাঁহারা এই ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত কথাগুলি সমভাবে "ব্রজবুলি" ও "হিন্দুস্থানী-বাংলা"র প্রতিও প্রযোজ্য। বাংলা-ভাষার ক্রমবিকাশের হাজার বছরের ইতিহাসে এই দুই প্রকারের বাংলা-ভাষাকে linguistic episode বা "ভাষাগত উপ-ঘটনা" নামে অভিহিত করিতে হয়। "ব্রজবুলি"-র ব্যবহারে যেমন বাংলা-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-র ব্যবহারেও তেমনই বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার মুসলিম-সাহিত্য ও সমাজে বটতলার "হিন্দুস্থানী-বাংলা"র প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যাঁহারা শুধু এই ভাষা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে অভ্যস্ত এবং এই ভাষায় লিখিত কোন কাব্যের "সাহিত্যিক মূল্য" নাই বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা "সাহিত্যিক মূল্য" বলিতে কি বুঝেন জানি না। যদি রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া ধরিতে হয়, তবে এই হিন্দুস্থানী-বাংলায় লিখিত পুঁথিতেও যে রস আছে, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। "হিন্দুস্থানী-বাংলা"-র প্রধান প্রধান কবিদের মধ্যে, মুহম্মদ এয়াকুব (১৬৯৪), সৈয়দ হামজা (১৭৯৩), গরীবুল্লা (১৭৯৪) প্রভৃতি কবির নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল ভাষা-বিভ্রাটের ফলে ইঁহাদের কাব্যে কোন "সাহিত্যিক মূল্য" যাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহাদের রসগ্রহণ-ক্ষমতার প্রশংসা করা যায় না। কেননা, "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য-রস লয়ে" বলিয়া স্বয়ং ভারতচন্দ্রও মত প্রকাশ করিয়াছেন।

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা-ভাষা লিখিতে বাংলা-বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী-হরফের ব্যবহার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাঁহারা মনে করেন যে, বাংলার মুসলমানেরা সাহিত্য-সাধনার গোড়া হইতেই বাংলা-বর্ণমালার পরিবর্তে আরবী-হরফের ব্যবহার করিতেছিলেন, এই

ঘটনার প্রকৃত ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। বস্তুতঃ ঘটনাটি এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হয়। এ-পর্যন্ত আরবী-হরফে বাংলা-লেখা-পুঁথির যতগুলি আমরা দেখিয়াছি, তাহার কোনটিই দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে বা প্রাচীন বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। আবার কাছাকাছি সময়ে লিখিত একই পুঁথির দুই পাণ্ডুলিপির একটি বাংলা ও অপরটি আরবী হরফে লিখিত আছে। ইহা হইতে মনে হয়, মুসলমানদের মধ্যেও সকলে এইরূপে বাংলা-বর্ণমালার আরবী-প্রতিবর্ণায়ন-রীতি গ্রহণ করেন নাই। "হিন্দুস্থানী-বাংলা"র ভক্ত যে কয়জন পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান কবির নাম করিয়াছি, তাঁহাদের কাব্যগুলির কোন কোন কাব্য আরবী-হরফেও দেখা যায়। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান কবিদের পুঁথির মধ্যে প্রায় কবির ইসলাম-শাস্ত্রীয় পুঁথিগুলির আরবী হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমান। এতদ্ব্যতীত পূর্ববঙ্গীয় সাধুভাষায় রচিত কাব্যজাতীয় পুঁথির দু'চারটি পাণ্ডুলিপিও আরবীহরফে আছে। ইহা হইতেই বাংলা-ভাষায় বাংলা-বর্ণমালা ব্যবহারের পরিবর্তে আরবী-হরফ ব্যবহারের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। "হিন্দুস্থানী-বাংলা" আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দে পরিপূর্ণ এবং ইসলাম-শাস্ত্রীয় পুঁথিগুলিও মুখ্যতঃ আরবী এবং গৌণতঃ ফারসী শব্দের বাহুল্য লইয়া রচিত। এই দুই জাতীয় পুঁথি বাংলা-বর্ণমালায় লেখার চেয়ে আরবী-হরফে লেখা সুবিধাজনক বলিয়া নিশ্চয়ই বিবেচিত হইয়া থাকিবে। খুবসম্ভব, এই কারণেই বাংলায় আরবী-হরফ ব্যবহারের প্রবর্তন ঘটে। নিম্নের নমুনা দেখিলেই এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধ হইবে :---

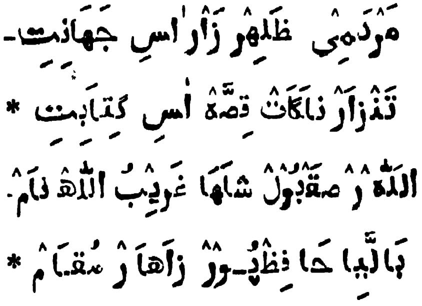

مردمی ظاهر زار اس جهانت -
تنزار ناکات قصه اس کتابت *
الله ر مقبول شاها غریب الله نام
بالیا حافظپور زاهار مقام *

মর্দগী জাহের যার আছে জাহানেতে।
তাঞ্জার নাগাত কেচ্ছা আছে কেতাবেতে॥
আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥

]

এই দুই জাতীয় পুঁথি ব্যতীত "সাধু-ভাষায়" রচিত কাব্যজাতীয় পূর্ববঙ্গীয় পুঁথির যে দুই-চারিটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত লিখন-রীতির অক্ষম নকল বা অনুকরণ মাত্র। এইরূপ রীতি "সাধু-ভাষায়" রচিত বাংলা-ভাষা ও তাহার বর্ণমালার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই কারণে ইহা বাংলা-লেখায় চলে নাই। যদি এই রীতি জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিত, কিংবা বাংলাকে এইরূপে লেখার রেওয়াজে দাঁড়াইয়া যাইত, তবে শেষযুগের অনুলিখিত যাবতীয় পুঁথি আরবী হরফে পাওয়া যাইত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই, কিংবা ঘটিবার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, তেমনও বুঝা যায় না।

বলা বাহুল্য, কেহ কেহ এই রীতিকে দক্ষিণী উর্দুর "রেখ্‌তা-"রীতির সহিত তুলনা করিয়া ইহাতে ব্যবহৃত বর্ণমালাকে ফারসী-হরফ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আদবেই ভুল করেন। ইহাতে ফারসী "পে", "চে", "গাফ্‌" প্রভৃতি অক্ষর বাংলা-স্বর-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার লিখন-রীতির বা লিখন-ভঙ্গির কোনটিই ফার্‌সী-ঢঙে নহে। ভারতের বা বাংলার ফার্‌সী-লেখার ভঙ্গি "নস্‌তালীক্‌"-ঢং নামে পরিচিত। এই "নস্‌তালীক্‌" ঢঙে লেখার বৈশিষ্ট্য হেলান অক্ষর এবং স্বর-বিভেদক মাত্রাবিহীন শব্দ। ইহার কোনটিই আমাদের আলোচ্য পুঁথিগুলিতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে আরবী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গি ফার্‌সী-ভাষা হইতে পৃথক; ইহার অক্ষরগুলি খাড়াভাবে লেখা হয় এবং শব্দগুলিও স্বরবিভেদক মাত্রাযুক্ত হইয়া থাকে। বাংলা-ভাষার জন্য ব্যবহৃত আরবী-হরফে যদি দুই-চারিটি ফার্‌সী-হরফ দেখিয়া ইহাকে ফারসী হরফে লিখিত বলা হইয়া থাকে, তবে এই অক্ষরগুলির মধ্যে "টে", "ডে", "ডাল" (অর্থাৎ "ট", "ড়", "ড") প্রভৃতি হিন্দী অক্ষর দেখিয়া ইহাকে হিন্দী-হরফ যে কেন বলা হইল না, তাহা ভাবিয়া পাই না। অথবা, উর্দু হরফ বলিলেই বা ক্ষতির কি কারণ ছিল? মোট কথা, বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত আরবী-হরফে, ফারসী, হিন্দী, উর্দু যে-হরফই থাকুক, ইহাতে আরবী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গিই গৃহীত হইয়াছিল। বলিতে কি আরবী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গি ব্যতীত ফারসী লিখন-রীতি ও লিখন-ভঙ্গিতে বাংলা-ভাষা লিখিত হইলে, ইহা পাঠ করা দুঃসাধ্য হইত। যাঁহারা এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া

ইহাকে আরবী রীতিতে খাড়া হরফে স্বর-বিভেদক মাত্রাযুক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাই, আজও আমরা ইহা পাঠ করিতে পারিতেছি।

সে যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া ইংরেজ-শাসনে নূতন রাষ্ট্র, নবীন ভাষা ও অভিনব পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও সংঘাতে প্রাচীন বাংলা-ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য আমাদের নিকট এক নব-মূর্ত্তিতে দেখা দিল। এই সময়ে বটতলার সাময়িক সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকারের উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বটতলার এই সাহিত্য মুমূর্ষু প্রাচীন-বাংলার শেষ-নিঃশ্বাস মাত্র। ইহাতে প্রাচীন বাংলার জীর্ণ খোলসটি যে-ভাবে রহিয়াছে, তাহাকে দেখিলে শুধু করুণার উদ্রেক হয়,—ইহার প্রাচীন রূপের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সাহিত্যের পাঠক ও লেখকের সংখ্যা যে বহু ছিল, সে-কথা একশ' বার স্বীকার্য। কিন্তু, তাহা দিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করিতে যাওয়া মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা বটতলার সাহিত্যের নামে উৎসাহে মাতিয়া উঠেন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মাত্রাহীনতার পরিচয় দেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া মনে রাখেন যে, বটতলার সাহিত্য প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের শবদেহ মাত্র। ইহার স্রষ্টারা এই শবদেহ জোগাইয়াছেন বাংলার অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অনুন্নতমনা পাঠক-শকুনির উদরপূর্ত্তির জন্য। রুচির কথা, রসের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শকুনি-জাতীয় জীবকে বাঁচাইয়াবার জন্য শবদেহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, তবে অবনত মস্তকে স্বীকার করিব, বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বটতলার সাহিত্যেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু, এ-কথা সকলেই জানেন যে, শবদেহের একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্যই বিশ্বস্রষ্টা শকুনির সৃষ্টি করিয়াছেন, শকুনির জন্য শবদেহের সৃষ্টি করেন নাই।

মোটের উপর, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই বলিলেই চলে। এই সময়ে বটতলা হইতে কোন কোন সত্যিকার প্রাচীন সাহিত্য বিকৃত অবস্থায় মুদ্রিত হইয়া বাংলার জনসাধারণের সহিত এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের একটি যোগসূত্র রক্ষায় সচেষ্ট হয়। বটতলার এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন সাহিত্য-প্রীতি নাই। যে-কোন প্রকারেই হউক, লোকের মন ভুলাইয়া রোজগারের পথ প্রশস্ত করাই ছিল এই প্রচেষ্টার

মূল উদ্দেশ্য। এইজন্যই বটতলা হইতে প্রকাশিত প্রাচীন সাহিত্যে সাহিত্যিক সততা পরিলক্ষিত হয় না। ইহাকে ঠিক জাল-জুয়াচুরিও বলা চলে না; কেননা পরবর্তী পণ্ডিত-সমাজকে ঠকাইবার উদ্দেশ্য ইহাতে ছিল না; যাহাতে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মন উঠে সেইদিকে নজর রাখিয়াই প্রাচীন-সাহিত্য বটতলায় পরিবর্তিত হয়। যে-ভাবেই হউক, এই সময়ে বঙ্গের প্রাচীন-সাহিত্য-রক্ষায় বটতলার একটি বড় রকমের দান স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য বটতলাকে যাঁহারা তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য দিতে অস্বীকৃত তাঁহারা নিশ্চয়ই মনের দিক হইতে কৃপণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বলিতে কি ইতঃপূর্বেই প্রাচীন বাংলা প্রায় মরিয়া গিয়াছিল। এই শতাব্দীতে আসিয়াই সেই মরা-সাহিত্য সমাহিত হইয়াছে। এই সমাধির উর্বর ভূমি হইতেই নবযুগের নূতন বাংলা-ভাষা ও নবীন সাহিত্য জন্মলাভ করে এবং পুরানো বাংলা-সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হইয়া যায়; বাঙালীর দৃষ্টি আবার নূতন করিয়া অতীত গৌরবের আলোচনায় নিবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময়েই নূতন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালীর জীবনে নূতন-প্রেরণা জাগিয়া উঠিতে থাকে এবং নবীন-জীবনে নূতন-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহাই বাংলার আধুনিক-সাহিত্য। বাংলা-সাহিত্যের এই ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইবে। ইহা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে।

এইবারকার মত এই আলোচনা এখানেই শেষ হউক। হয়ত এই প্রবন্ধে অনেকের প্রীতি ও অপ্রীতিকর অনেক কথাই বলিয়াছি। যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহাকে কাহারও প্রীতি বা অপ্রীতির জন্য পাশ কাটাইয়া গিয়া দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিতে অসমর্থ। ইহার জন্য নূতন করিয়া ক্ষমা না চাহিয়া আমি প্রাচীন কবি মুহম্মদ কবীরের (১৫৮৮) ভাষায় বিদায় গ্রহণ করিব:---

> "পণ্ডিত জনের ঘৃণা মূর্খের গোহারি।
> শিরে ধরি কাব্য কথা দিলাম সঞ্চারি॥"